প্রতিবেদন

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি
১৯৯৭

সাভার, ঢাকা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

25 JAN 1998

BPATC LIBRARY
Accession No. 82287
Class No. ৩৭১·2922/জাত
Source | Cost

কপিরাইট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কর্তৃক সংরক্ষিত, ১৯৯৭ইং।

(সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বা কোন অংশ মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ, প্রকাশ, পুনঃপ্রকাশ বা অন্য কোন উপায়ে রিপ্রোডাকশন বাংলাদেশের বিদ্যমান কপিরাইট আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ।)

ISBN 984-31-0060-3

প্রতিবেদন
জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকাশক
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

প্রচ্ছদ
হাশেম খান

মুদ্রণ
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

মূল্য
দুই শত টাকা

প্রসঙ্গ-কথা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সতের নম্বর অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের শিক্ষানীতির মর্মকথা বিধৃত রয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংবিধানে সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে একটি গুণমুখী ও সর্বজনীন যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে তাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হবে এটাই প্রত্যাশিত। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ও জনগণের প্রত্যাশার সঙ্গে সমকালীন বিশ্বের চাহিদার দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। পৃথিবীতে জ্ঞানের যে বিস্ফোরণ ঘটছে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে ইদানীং শিক্ষার যে অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে সেদিকেও আমাদের তাকাতে হবে। তাই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকে সমকালীন বিশ্বের জ্ঞানপ্রবাহের তুল্যমানে উন্নীত করতে হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক ও গুণগত পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। সেদিকে লক্ষ রেখেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বগ্রহণের অল্পকাল পরেই তাঁদের প্রতিশ্রুত শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক, চিন্তাবিদ, পেশাজীবী ও শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে ৫৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি গঠিত হওয়ার পর সদস্যগণ চব্বিশটি সভায় মিলিত হয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেন, মতবিনিময় করেন এবং উনিশটি উপকমিটির প্রতিবেদন বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনার পর চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেন। এছাড়া কমিটি জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত জনগণের মতামত ও মনোভাব পর্যালোচনা করে, কমিটির চেয়ারম্যান দেশের পাঁচটি বিভাগীয় শহরে বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী ও সংগঠনের প্রতিনিধির সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এতদ্ব্যতীত কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ ও জাতীয় দৈনিকসমূহের সম্পাদকবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে সভায় মিলিত হয়ে মতবিনিময় করেন ও মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

কমিটি দেশের জন্য উপযোগী ও কল্যাণকর একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের চাহিদার নিরিখে ১৯৭৪ সালে প্রণীত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ এ শিক্ষানীতি প্রণয়নকালে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৭৯ সালের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি ও ১৯৮৮ সালের মফিজুদ্দিন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশও কমিটি পর্যালোচনা করেছে। এসব বিবেচনা ও পর্যালোচনার সময়ে যে-বিষয়টির সর্বাধিক গুরুত্ব অনুভব করেছি তা হল, আমাদের প্রয়োজন নিরক্ষরতামুক্ত একটি শিক্ষিত, প্রগতিশীল, বিজ্ঞান-মনস্ক, দেশপ্রেমিক, নৈতিক, মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা—যারা এদেশ গঠনে যথার্থ অবদান রাখতে পারবে।

শিক্ষানীতি হল একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকদর্শন। এ দিকদর্শনের কিছু দিকনির্দেশনা যদি এই কমিটির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়েছে বলে বিবেচিত হয় তাহলে আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করব।

পরিশেষে, এই প্রতিবেদন সম্বন্ধে আমাদের কথা হল কুদরাত–এ–খুদা কমিশনের আলোকে ও বর্তমানে প্রচলিত বাস্তবতার নিরিখে আমরা একটা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। এ প্রতিবেদন যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়েছে তা দাবি করতে পারি না। তবে এ শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ২/৩ জন অভিজ্ঞ পরিকল্পনাবিদ ও অর্থনীতিবিদ নিয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করার সুপারিশ রাখছি। জ্ঞানের রাজ্যে প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার জন্য প্রতি চার/পাঁচ বছর পর পর এ সুপারিশসমূহ পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করারও প্রস্তাব রাখছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কাজ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সুষ্ঠুভাবে সমাধাকল্পে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সদস্য–সচিব ও কমিটির কাজে সহায়তাদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

প্রফেসর এম শামসুল হক
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি

সূচিপত্র

অধ্যায় – ১	:	সার-সংক্ষেপ	৯
অধ্যায় – ২	:	জাতীয় শিক্ষানীতি : পরিপ্রেক্ষিত, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩৯
অধ্যায় – ৩	:	প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা	৪১
অধ্যায় – ৪	:	গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা	৫১
অধ্যায় – ৫	:	মাধ্যমিক শিক্ষা	৫৮
অধ্যায় – ৬	:	বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) ও কারিগরি শিক্ষা	৭২
অধ্যায় – ৭	:	মাদ্রাসা শিক্ষা	৭৮
অধ্যায় – ৮	:	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	৮১
অধ্যায় – ৯	:	উচ্চ শিক্ষা	৮৬
অধ্যায় – ১০	:	প্রকৌশল শিক্ষা	৯১
অধ্যায় – ১১	:	চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা	৯৬
অধ্যায় – ১২	:	বিজ্ঞান শিক্ষা	১০৫
অধ্যায় – ১৩	:	কারবার (বিজনেস) শিক্ষা	১১১
অধ্যায় – ১৪	:	কৃষি শিক্ষা	১১৯
অধ্যায় – ১৫	:	ললিতকলা শিক্ষা	১২৪
অধ্যায় – ১৬	:	আইন শিক্ষা	১২৯
অধ্যায় – ১৭	:	নারী শিক্ষা	১৩২
অধ্যায় – ১৮	:	বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড শিক্ষা	১৩৬
অধ্যায় – ১৯	:	গ্রন্থাগার বিজ্ঞান	১৪৩
অধ্যায় – ২০	:	পরীক্ষা ও মূল্যায়ন	১৪৭
অধ্যায় – ২১	:	ছাত্রকল্যাণ ও নির্দেশনা	১৫১
অধ্যায় – ২২	:	শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব	১৫৩
অধ্যায় – ২৩	:	শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক	১৫৭
অধ্যায় – ২৪	:	শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	১৬৪
অধ্যায় – ২৫	:	অর্থায়ন	১৭৩
পরিশিষ্ট	:	ক. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির গঠন ও কর্মপদ্ধতি	১৭৯
		খ. অফিস আদেশ	১৮০
		গ. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি	১৮১
		ঘ. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি : উপকমিটিসমূহ	১৮৫
		ঙ. সম্পাদনা পরিষদ	১৯১
		চ. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সচিবালয়	১৯১

প্রথম অংশ : সার–সংক্ষেপ

অধ্যায়—১

সার-সংক্ষেপ

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।

৪. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদনক্ষম, সৃজনশীল করে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

৫. কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্ম সংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

৬. বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৭. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা।

৮. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা।

৯. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা।

১০. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

১১. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা।

১২. শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী পুরুষ বৈষম্য (Gender bias) দূর করা।

১৩ শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো।

১৪. পরিবেশ-সচেতনতা সৃষ্টি করা।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার অনন্য ধাপ প্রাথমিক শিক্ষা। দেশের উন্নতির লক্ষ্যে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অপরিহার্য। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। এ অবস্থার অবসান বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক শিক্ষার পর

অনেকে কর্মজীবন আরম্ভ করে, অনেকে পরবর্তী শিক্ষাস্তরে প্রবেশ করে। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ এবং শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ, কৌতূহল, সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি বাঞ্ছিত গুণাবলি অর্জন করতে সহায়তা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা দূর করে একে জাতির শিক্ষার স্বার্থে নিয়োজিত করতে হবে।

সুপারিশ

১. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ২০১০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আট বছর করা হবে। এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ–সুবিধা বাড়াতে হবে।

২. সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন। শিক্ষার বিষয় হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি–সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সংগীত ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি ভাষা এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম শ্রেণী থেকে সহপাঠ্যক্রমিক বিষয় থাকবে।

৩. প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারার মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই ধারার শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক।

৪. প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

৫. প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক–শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ : ৩৫।

৬. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু করা যেতে পারে। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা হবে।

৭. প্রথম শ্রেণীর প্রথম ছয় মাসের শিক্ষাকে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে প্রাক–প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা যায়।

৮. শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হবে নিম্ন প্রাথমিকের জন্য একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি পাশ মহিলা এবং উচ্চ প্রাথমিকের জন্য একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা বা পুরুষ। প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক এবং তিন বছরের মধ্যে সি ইন এড বা বি এড (প্রাইমারি) অর্জন করতে হবে।

৯. শিক্ষক নির্বাচনের জন্য সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০. শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ এবং প্রশিক্ষণের সঙ্গে পদোন্নতির যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক। উচ্চতর ডিগ্রিধারী যোগ্যতাসম্পন্নদের সরাসরি নিয়োগ এবং পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর পদ পূরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১১. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকতে হবে।

১২ ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ)–কে অভীষ্ট মানের শীর্ষ পর্যায়ের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

১৩. বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় করা প্রয়োজন।

১৪. প্রাথমিক স্তরের সব ধরনের শিক্ষক ও কর্মচারীর চাকরি জাতীয়করণ করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার ও ম্যানেজিং কমিটির ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

১৫. তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের কাজ যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

১৬. প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করে বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা বাড়াতে হবে।

১৭. শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়াতে হবে। দুই হাজার সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অন্তত তিন শতাংশ এবং সমগ্র শিক্ষার জন্য অন্তত পাঁচ শতাংশ উন্নীত করা উচিত।

১৮. সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

বিশ্বের সর্বাধিক নিরক্ষর জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বর্তমানে সাত বছরের বেশি বয়সীদের সাক্ষরতার হার শতকরা ৪৪। দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অপ্রতুলতা, অনমনীয়তা ও অব্যবস্থার কারণে নিরক্ষর নারী–পুরুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। নিরক্ষরতা সমস্যা দূর করার জন্য গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। ২০০৫ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার অন্তত ৯০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।

সুপারিশ

১. আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশ নিতে পারছে না বা ভর্তি হয়েও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে এমন সব বঞ্চিত শিশু কিশোরের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারী শিশুকিশোরেরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। এ শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার বয়স আট বছর এবং ভর্তির বয়সসীমা ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

২. বয়স্ক শিক্ষার আওতায় তিনটি ধারা থাকবে — সাক্ষরতা শিক্ষা, সচেতনতা শিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের শিক্ষা। বয়স্ক সাক্ষরতার কোর্স চাহিদা অনুসারে প্রণীত হবে। গণশিক্ষার জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩ সাক্ষরতায় অর্জিত দক্ষতাকে অটুট রাখার জন্য অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ রাখা বাঞ্ছনীয়। গ্রামে পাঠ–অনুশীলন–চক্র ও গ্রামশিক্ষা–মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গণশিক্ষার জন্য লোককেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. সমন্বিত সাক্ষরতা অভিযানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজ বিভিন্ন পদ্ধতি, উপকরণ, প্রক্রিয়া ও অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সমন্বয় ঘটিয়ে কম সময়ে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে পারে।

৫. বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দূরশিক্ষণের পদ্ধতিতে সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনা করা যেতে পারে।

৬. গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারের জন্য যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা পূরণ করার জন্য আইনগত কাঠামো প্রবর্তন প্রয়োজন।

৭. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে বাংলাদেশ গণশিক্ষা ফাউন্ডেশন নামে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হবে। এই ফাউন্ডেশন গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মূল দায়িত্বে থাকবে এবং অর্থায়নের ব্যবস্থা করবে।

৮. গণশিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং জাতীয় গণমাধ্যমের ভূমিকা সমন্বয় করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর অংশটি মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এ স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে, না হয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে। এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন, কর্মজগতের জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরি করা, উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা ইত্যাদি। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে তিনটি ধারা থাকবে–সাধারণ, মাদ্‌রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারা। সব ধারাতেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা

থাকবে। প্রত্যেক ধারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত থাকবে এবং কয়েকটি সাধারণ আবশ্যিক বিষয় থাকবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর এক ধারা থেকে অন্য ধারায় গমনের পথ খোলা থাকবে।

সুপারিশ

১. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হবে চার বছরের — নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। সাধারণ শিক্ষা, মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় নির্ধারিত অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে এবং এই স্তরের শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা বলে অভিহিত করা হবে।

২. মাধ্যমিক স্তরে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

মাদ্‌রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব থাকবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের।

৩. বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করতে হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম–দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. সকল বিষয়ের শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শূন্য পদ পূরণের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

৫. সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিকতাবোধের অভাবে দেশে ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা এবং কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। অনতিবিলম্বে তা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৮. দশম শ্রেণীর পর একটি বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর নাম হবে মাধ্যমিক প্রথম পর্ব। এ পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফল সমন্বিত করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে অনুরূপ একটি বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং নাম হবে মাধ্যমিক দ্বিতীয় পর্ব। এতে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয় করতে হবে। পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে।

প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের নম্বর যোগ করে মাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্ত ফল নির্ধারিত হবে।

৯. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্য অনুপাত হবে ১ : ৪০।

১০. শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বিদেশীদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম চালু থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে সহজ বাংলা আবশ্যিক হিসেবে পাঠ্য থাকবে।

১১. সরকারের নির্ধারিত হারের চেয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান বেশি হারে বেতন আদায় করে, যারা চাঁদা আদায় করে, যাদের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে এবং মিশনারি, ট্রাস্ট ও দেশী বিদেশী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের শিক্ষাখাত থেকে বরাদ্দ দেওয়া চলবে না। তবে অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও অন্যান্য নীতিমালা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে। সরকারের অনুমতিক্রমে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও–লেবেল এ–লেবেল চালু রাখতে পারবে।

১২. বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে যে, অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষকদের প্রাপ্য সরকারি অনুদান ভোগ করছে। এ ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের মাধ্যমে এসব চিহ্নিত করে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. ক্যাডেট কলেজগুলোতে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে এবং ক্যাডেট কলেজের ব্যয় নির্বাহ হবে সামরিক বাজেট বরাদ্দ থেকে।

সুপারিশ

ইসলাম শিক্ষা

১. শিক্ষার্থীদের মনে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের প্রতি অটল ঈমান ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে।
২. ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।
৩. সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জের তাৎপর্য বর্ণনাসহ যথার্থভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে। ইসলাম শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি ও বিষয়বস্তু কেন্দ্র করে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করতে হবে।

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

১. সকল ধর্মের শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক ও কোর্সের ব্যবস্থাসহ সমান ব্যবস্থা ও সুযোগ থাকবে। প্রাক–প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে পরিচয়মূলক জ্ঞান দিতে হবে। প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় তত্ত্ব ও উপাখ্যান জানবে এবং ধর্মের অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানবে।
২. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ধর্ম দর্শন, ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মীয় উপাখ্যান, মহাপুরুষদের জীবনী, নিজ নিজ ধর্মীয় ভাষা ও সকল ধর্মের নৈতিক উপাখ্যান সংবলিত নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

সকল শ্রেণীর বৌদ্ধ শিক্ষার্থীর জন্য বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। বিভিন্ন শ্রেণীতে পালি ভাষা শেখার ব্যবস্থা থাকবে। সনাতন পদ্ধতির সনদপত্রের সমতা বিধান করতে হবে। সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসিত বোর্ডে রূপান্তর করতে হবে।

খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা

প্রাক–প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে থাকবে নৈতিক শিক্ষা। মাধ্যমিক স্তরে খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

উচ্চ শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য হবে জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলোর জন্য স্বাধীনতা ও স্ব–শাসনের অধিকার অপরিহার্য। বর্তমানে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানসাধনায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের সাধনার ক্ষেত্রকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করছেন আপন বিষয়ে গভীরতা অর্জনের প্রয়োজনে। ফলে বিভাজন ঘটছে জ্ঞানের জগতে। অন্যদিকে একটি বিপরীত প্রক্রিয়াও চলছে এবং তা হল জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধি এবং এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিজ্ঞান পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও বিশ্বজগত সম্পর্কে অভিনব উপলব্ধি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই জ্ঞানের জগতে সকল বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি অতিক্রম করে একটি সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমানে প্রচলিত উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটাতে সমর্থ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস আবশ্যক।

সুপারিশ

১. মাধ্যমিক শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করার পর ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করবে। এক্ষেত্রে মেধাগত সমতা নিশ্চিত করার জন্য মাদ্‌রাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সাধারণ শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সমমানের হতে হবে।

২. শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে পারে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন — বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ও কলেজে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হবে। শিক্ষার্থীর মেধা, আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ ঘটবে। কোটা পদ্ধতি বা অন্য কারণে যোগ্যতার শর্ত শিথিল করা হবে না।

৩. উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্ব প্রকার যত্ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছরের সমন্বিত ডিগ্রি কোর্স ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ানো হবে। অন্যদিকে সাধারণ কলেজগুলোতে তিন বছরের সমন্বিত ডিগ্রি কোর্স পড়ানোর প্রস্তাব করা হচ্ছে। যে সকল কলেজে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স এবং এক ও দুই বছরের মাস্টার্স পড়ানো হবে সেই সকল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বলা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো জেলা সদরে অবস্থিত হবে। সাধারণ কলেজ পর্যায়ে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু থাকবে। মেধার ভিত্তিতে বাছাইয়ের পর তাদের জন্য দুই বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ার সুযোগ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পাঠ্যসূচি হবে এক ও অভিন্ন।

৫. যে সকল কলেজ উন্নত সে সকল কলেজে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। চার ও তিন বছর কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের ইংরেজি ভাষা বিষয় সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

৬. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ এমফিল কোর্স দু বছরের হবে। সর্বমোট তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পিএইচডি কোর্স শেষ করতে হবে।

৭. গবেষণার কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে একযোগে অংশগ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রদের গবেষণার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চমূল্যের গবেষণা ও ফেলোশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ডিগ্রি কলেজগুলোতে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. উচ্চ শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে আধুনিক ও আন্তর্জাতিকমানের। শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রচলনের কোন বিকল্প নেই এবং সেই কারণেই ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞানের ব্যবহারযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা বাংলা ভাষায় ভাষান্তরণ হওয়া প্রয়োজন। এই কাজকে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। তবে বাংলা ভাষায় বই, সাময়িকী অনুবাদ করা এখনও পর্যাপ্তভাবে হচ্ছে না। তাই সাময়িকভাবে হলেও প্রয়োজনবোধে ইংরেজি মাধ্যম চালু রাখা যেতে পারে।

৯. উচ্চ শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে হবে। সরকারি অনুদান ছাড়াও শিক্ষার্থীর বেতন, ব্যাংক ঋণ বা ব্যক্তিগত অনুদানের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। তাছাড়া মেধা ও অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার নিরিখে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তি প্রদান করা হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ভর্তি ফি ও বেতন খুবই সামান্য। অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার প্রত্যয়ন পত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বেতন নির্ধারণ করা হবে। এতে অসচ্ছল অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকদেরকেও সন্তোষজনক বেতন ভাতাদি প্রদান করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. বাংলাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি অনুমোদনকারী ও পাঠদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। প্রয়োজনবোধে এর একাধিক শাখা থাকতে পারে।

১১. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও শিক্ষার মান সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমমানের হতে হবে। টেলিভিশনে সুবিধাজনক কোন চ্যানেল — যেমন দ্বিতীয় চ্যানেলে অধিকতর সময়, রেডিও ট্রান্সমিশন, মাল্টি ইনফরমেশন সিস্টেম, ইন্টারনেট সিস্টেম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চালু করা একান্ত প্রয়োজন।

১২. বাংলাদেশের বিকাশমান অর্থনীতিতে বস্ত্র ও চামড়া খাতের বিপুল গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে টেক্সটাইল কলেজ ও কলেজ অব লেদার টেকনোলজিকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৩. প্রত্যেক কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে।

১৪. দেশের উচ্চ শিক্ষার স্বার্থে অনুমোদিত ও প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের হতে হবে। এইসব

বিশ্ববিদ্যালয় কোনভাবেই সাম্প্রদায়িক ও বাণিজ্যভিত্তিক হতে পারবে না, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী হতে পারবে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকাণ্ড, কর্মপরিধি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে দেখার জন্য একটি Accredition Council প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পরিমার্জন করতে হবে।

১৫. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন ও নেতৃত্ব প্রদান করবে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার মান যাতে একটি মর্যাদাপূর্ণ আসনে স্থিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন এই কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবে। সকল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্প, নতুন বিভাগ খোলা, বর্তমান বিভাগের সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নেবে।

প্রকৌশল শিক্ষা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতো বটেই, আমাদের সমাজেও সাধারণ মানুষের জীবনে সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞান এবং তার প্রয়োগ হয়ে পড়েছে একান্ত অপরিহার্য। এর ফলে সামাজিক জীবনযাত্রার পট পরিবর্তন হচ্ছে এবং সমাজ জীবনের কার্যধারাতেও আসছে গতিশীল পরিবর্তন। একবিংশ শতাব্দীতে প্রকৌশল বিষয়ের শিক্ষাক্রম অনেক বদলে যাবে। প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, বাস্তবধর্মী দক্ষ প্রকৌশল ও কারিগরি জনশক্তি গড়ে তোলা—যারা দেশের উন্নয়নে, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, দারিদ্র্য বিমোচনে এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখবে।

সুপারিশ

১. বর্তমানের প্রযুক্তি ও পরিবর্তিত আর্থসামাজিক পরিবেশ, উন্নয়ন, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে দেশ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ প্রকৌশলী সরবরাহ করার জন্য প্রকৌশল বিদ্যায়তন গুলোতে আসন সংখ্যা বর্ধিত করতে হবে।

২. প্রকৌশল শিক্ষাক্রমের অধিকাংশ বইপুস্তকই ইংরেজিতে। এজন্য প্রকৌশল শিক্ষায় আগ্রহী ছাত্রদের ইংরেজির ভিত মাধ্যমিক স্তর থেকেই মজবুত করতে হবে।

৩. দেশের সম্পদ উন্নয়ন ও বিভিন্ন কারিগরি সমস্যার সমাধান ও উচ্চ মানসম্পন্ন প্রকোশলী তৈরির জন্য বুয়েটে গবেষণা ও স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রতি অধিকতর নজর দেওয়া হবে। বিআইটিগুলোতে পর্যায়ক্রমে স্নাতকোত্তর কোর্স জোরদার করা হবে। গবেষণার মূল এলাকাগুলো হবে দেশীয় প্রকৌশল শিল্পের সমস্যা বিষয়ক। পেশায় নিযুক্ত স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রকৌশলীদের জন্য বাড়তি সুযোগ–সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন।

৪. দেশের বৃহৎ শিল্পগুলোতে প্রকৌশল, রসায়ন, বস্ত্র, পাট, চামড়া, সিরামিক ও গ্যাস শিল্পের জন্য উপযুক্ত প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরির জন্য অবিলম্বে বিকাশমান বিষয়ে কোর্স চালুসহ, বিআইটি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন ফ্যাকাল্টি চালু করা বাঞ্ছনীয়। এই লক্ষ্যে বিআইটিগুলোকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা দরকার।

৫. প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার কোর্সগুলোকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির নিয়মিত হালনাগাদসহ শিল্প কারখানা ও কারিগরি সংস্থাসমূহে শিক্ষার্থীদের সহায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৬. প্রকৌশল শিক্ষায়তনের সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিল্প সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে নবিশি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা চালুসহ দেশের সকল পর্যায়ের চেম্বার অব কমার্স এবং চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিগুলোর প্রকৌশল শিক্ষায়তনের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

৭. প্রকৌশল শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সময়ে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

৮. বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জীবনচক্র ছোট হয়ে যাওয়ায় এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হওয়ায় চাকরিতে নিয়োজিত পেশাজীবী প্রকৌশলীদের অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং অব্যাহত পেশাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা ব্যাপকহারে চালু করা উচিত।

৯. ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের প্রকৌশল·বিদ্যায়তন ইনস্টিটিউটগুলোতে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ–সুবিধা দিতে হবে।

১০. দেশের প্রচলিত বিভিন্ন স্তরে কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার মূল্যায়ন, মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত পেশাগত ও বিশেষজ্ঞ সংস্থার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করা দরকার।

১১. প্রকৌশল ক্ষেত্রে গবেষণা বিষয়ে সরকারের দিক নির্দেশনা প্রদানসহ সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও অর্থায়নের জন্য সংযুক্ত স্থান বা দফতর হিসেবে একটি ইনজিনিয়ারিং রিসার্চ কাউন্সিল গঠন করা আবশ্যক।

১২. বিআইটি, টেক্সটাইল ইনজিনিয়ারিং কলেজ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ব্যবস্থাপনা এবং এগুলোর শিক্ষার মান উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন। লেদার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। এই উদ্দেশ্যে তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিত বুয়েটে ও বিদেশে শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

দেশের সমস্ত অধিবাসীকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনদানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত মানের চিকিৎসক, সেবক সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মী ও সকল প্রকারের বিশেষজ্ঞ তৈরি করাই চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। তাই দেশের ব্যাধি ও চিকিৎসা সমস্যাবলির মোকাবেলায় উপযুক্ত চিকিৎসা–শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ তৈরি করা প্রয়োজন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুফল দেশের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার সম্প্রসারণ আবশ্যক।

সুপারিশ

১. মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য পরীক্ষা নিতে হবে।

২. কোন প্রার্থী দুই বছরের বেশি ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না।

৩. মেডিকেল কলেজে পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অব্যাহত থাকবে এবং এক বছরের ইন্টার্নশীপ থাকবে।

৪. মেডিকেল শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি থাকা দরকার।

৫. স্নাতকোত্তর চিকিৎসার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য অধিক সংখ্যক চিকিৎসা–শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ তৈরি করা প্রয়োজন।

৬. মেডিকেল কলেজগুলো স্বায়ত্তশাসিত হবে এবং সমস্ত কার্যক্রম একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

৭. মেডিকেল কলেজ শিক্ষকদের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়স ষাট বছর হওয়া উচিত।

৮. নার্সিং কলেজে এমএসসি নার্সিং কোর্স খোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

৯. নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে অবশ্যই কোন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

১০. প্যারামেডিকেল শিক্ষায় ভর্তি যোগ্যতা ন্যূনতম এসএসসি হওয়া উচিত।

১১. মেডিকেল কলেজগুলোর শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও প্রশাসনিক বিষয়ে মতবিনিময়ের জন্য একটি আন্তঃমেডিকেল কলেজ বোর্ড গঠিত হওয়া উচিত।

১২. আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি ঐতিহ্যগতভাবে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ব্যবস্থারও উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষা

বিজ্ঞানের মূল কাজ হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মগুলো ক্রমাগত শুদ্ধতর রূপে জানা ও তার প্রয়োগে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা। ক্রমাগত নতুন উদ্ভাবন, আবিষ্কার, সংযোজন, সংশোধন ও রূপান্তরের ভেতর দিয়ে বিশ্বজুড়ে

বিজ্ঞানের জ্ঞান বিকাশ লাভ করছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে কাজ করছে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, পরিমাপণ, তত্ত্বনির্মাণ, বিশ্লেষণ ও গাণিতিক যুক্তিপ্রয়োগ এবং সমগ্র তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয়সাধন। বিজ্ঞানের গতিশীলতা, পরিবর্তনীয়তা ও সৃজনশীলতা বিজ্ঞান শিক্ষার ধারায় সুনিশ্চিত করতে হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন তারা প্রতিভাবিকাশ, জ্ঞানের সাধনা ও সৃষ্টিশীলতায় আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারে। বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষা ও মানবিক শিক্ষার যে পারস্পরিকতা ও পরিপূরকতা তা উপলব্ধি করে একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার অংশরূপে বিজ্ঞান শিক্ষা কাজ করবে। বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা। শিক্ষার সব স্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষা উক্ত উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হবে।

সুপারিশ

১. বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হবে। শিশুদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে প্রকৃতির ঘটনামালা ও সহজ নিয়মগুলোর সঙ্গে পরিচিত করে।

২. শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও প্রশ্ন করার প্রবণতাকে শিক্ষক সঠিক তথ্য প্রদান করে উৎসাহিত করবেন।

৩. প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে বিজ্ঞান একটি সৃজনশীল, সক্রিয় ও আনন্দপূর্ণ কর্মধারা— এই সত্যটি যাতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. প্রাথমিক স্তরে প্রকৃতি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি সম্পর্কে শিশুরা যাতে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে সেজন্য নানা চিত্র প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও নানা সহজ পরীক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫. বিজ্ঞানের বইয়ে যথাসম্ভব আধুনিকতম আবিষ্কারের ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সহজভাবে উপস্থাপিত হবে।

৬. প্রাথমিক স্তরের দ্বিতীয় ভাগে (ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী) বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একটি সমন্বিত কোর্স থাকবে।

৭. মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৮. বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রতিটি স্তরে বেতার, টেলিভিশন, অডিও–ভিডিও রেকর্ড,কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করার যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে।

৯. মেধাবী ও সৃজনশীল স্নাতকদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে হবে।

১০. প্রতিটি শহরে একটি 'বিজ্ঞান কেন্দ্র' গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান পাঠাগার ও ওয়ার্কশপ থাকবে।

১১. চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি প্রান্তিক ডিগ্রিরূপে গণ্য করা হবে, ফলে উচ্চতর স্তরে শিক্ষাদান বা গবেষণার কাজে নিযুক্ত হওয়া ভিন্ন অন্য সকল ক্ষেত্রে এই স্নাতক ডিগ্রি পর্যাপ্ত বলে গণ্য করা হবে।

১২. স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য গবেষণায় মৌলিক অবদান রাখতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কোর্সওয়ার্ক করতে হবে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির শিক্ষা যাতে আন্তর্জাতিক মানের হয় সে লক্ষ্যে যোগ্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালিত হতে হবে।

১৩. গবেষণার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং গবেষকদের সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৪. পরীক্ষাগার ও গবেষণাগার উন্নয়নের জন্য ইকুইপমেন্ট বোর্ড পুনঃস্থাপন করতে হবে। গবেষণার জন্য উন্নত আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় গবেষণাগার গড়ে তুলতে হবে।

১৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রের পাঠাগারের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে হবে। আধুনিক ইলেকট্রনিক্স মেইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ গবেষণার কাজে ব্যবহারের অগ্রগণ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

১৬. গবেষণার ফল সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিষয়ভিত্তিক জাতীয় গবেষণা জার্নাল প্রকাশ করতে হবে। বিদেশী ঋণ ও সাহায্য গ্রহণের একটি নির্দিষ্ট অংশ বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জন্য নির্ধারিত থাকতে হবে।

১৭. শিক্ষক ও গবেষক নিয়োগের ক্ষেত্রে গবেষণায় অভিজ্ঞতা গবেষণানির্ভর উচ্চ ডিগ্রি যথা এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্তদের অধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৮. আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিক্ষাদানের কৌশল ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খণ্ডকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন অথবা বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব আয়োজনে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

১৯. বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণাকে দেশের উন্নয়ন ও শিল্পায়নের সঙ্গে সার্থকভাবে সম্পর্কিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। যৌথ গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ, মতামত ও তথ্য বিনিময় এবং বিশেষজ্ঞদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

কারবার (বিজনেস) শিক্ষা

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অবদান অসীম। শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামুলক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের শাখাসমূহের সমন্বিত ব্যবস্থাকে কারবার (বিজনেস) শিক্ষা বলা হয়। এছাড়া কারবার শিক্ষা যথার্থভাবে আয়ত্ত করতে পারলে চাকরির বিকল্প হিসেবে ব্যবসাকে আত্মকর্মসংস্থানের জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বর্তমান বিশ্বে বাজার অর্থনীতির প্রচলন, বিশ্ববিস্তৃত পণ্যের বাজার এবং তীব্র প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও তার সহায়ক কার্যাবলি প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে পরিগণিত। তাই পৃথিবীর সকল দেশেই কারবার শিক্ষার গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কারবার শিক্ষার মূল লক্ষ্য কারবার শিক্ষা ও জগত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া, আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করা, প্রতিষ্ঠানের আকারভেদে সাংগঠনিক স্তরের নিম্ন বা মাঝারি পর্যায়ের কর্মকর্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা। এমবিএ প্রোগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য হবে শিক্ষক, প্রশিক্ষক, পরামর্শক ও গবেষক তৈরিতে সহায়তা করা। পিএইচডি কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হবে এমবিএ স্তরে শিক্ষাদান ও গবেষণা তত্ত্বাবধানের জন্য শিক্ষকদের নৈপুণ্য বৃদ্ধি করা।

সুপারিশ

১. দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের জনবলের চাহিদার ভিত্তিতে কারবার শিক্ষার সম্প্রসারণ, পরিমার্জন ও সমন্বয় সাধন করতে হবে।

২. কারবার বিষয়ক শিক্ষার সকল স্তরে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত রীতি পদ্ধতি ও সম্ভাব্য উন্নয়ন চাহিদার আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করতে হবে।

৩. কারবার বিষয়ক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

৪. কারবার শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং এজন্য একাধিক কারবার শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।

৫. মাধ্যমিক স্তর থেকে কারবার শিক্ষা শুরু করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে কারবার পরিচিতি, হিসাবশাস্ত্র, বিপণন, কম্পিউটারের ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে।

৬. মাধ্যমিক দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ সম্বন্ধে জানার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বছরে অন্তত একবার তাদের নিকটস্থ কারখানা বা কারবার প্রতিষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের লক্ষ্যে শিক্ষক ছাত্রের বর্তমান অনুপাত কমিয়ে ১ : ১৫–তে আনতে হবে।

৮. বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক বিভাগে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন করা প্রয়োজন। এখানে প্রত্যেক ল্যাব–এ প্রয়োজনীয় সংখ্যক পিসি থাকতে হবে।

৯. বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষকদের শিল্প, ব্যাংক, বীমা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সমস্যা নিয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. শিক্ষকদের পিএইচডি সংক্রান্ত গবেষণার কাজ পরিচালনায় উৎসাহ প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রেষণামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবস্থাপক এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হতে হবে।

১২. জাতীয় পর্যায়ে কারবার বিষয়ক শিক্ষার গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পরিকল্পনায় ও সম্পদ বণ্টনে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করতে হবে।

কৃষি শিক্ষা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। তাই, আর্থসামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কৃষি উন্নয়ন ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কৃষি একটি ফলিত বিজ্ঞান। কৃষি বলতে বোঝায় দেশের শস্য, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও বনসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা। উচ্চতর কৃষি বলতে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, কৃষি, ভেটেরিনারি, পশুপালন, কৃষি প্রকৌশল, কৃষি অর্থনীতি, মৎস্য বিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টরাল পর্যায়ে অধ্যয়ন ও উচ্চতর গবেষণা বোঝায়।

কৃষি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল দেশের পরিবেশগত শক্তি ও সম্ভাবনার অধিক বিকাশ সাধন, জাতীয় উন্নয়নে কৃষি নির্ভর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা কৃষি সম্পদের যথাযথ বিকাশ, পেশা ও বিজ্ঞান হিসেবে কৃষির গুরুত্ব অনুধাবন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, অপুষ্টি দূরীকরণ ও দারিদ্র্যবিমোচন, গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ।

সুপারিশ

১. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজগুলোতে চার বছর মেয়াদি স্নাতক কোর্স পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।

২ স্নাতক পর্যায়ের সকল শিক্ষাক্রমে যুক্তিযুক্ত উপায়ে সংশ্লিষ্ট বাধ্যতামূলক বিষয়, ঐচ্ছিক বিষয়, মাঠ ও গ্রামীণ কর্ম-অভিজ্ঞতা, সমাজবিজ্ঞান, ভাষা ও মৌল বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখা হবে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার অনুপাত হবে ৫০:৫০।

৩. কোর্স পদ্ধতি নির্দিষ্ট সময়সীমায় আবদ্ধ বলে এর সার্বিক সাফল্য শিক্ষক বিশেষের জ্ঞান, দক্ষতা, আন্তরিকতা ও নিবেদিতপ্রাণতার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এ কারণে দক্ষ ও মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিসহ তাঁদের অনুকূলে উৎসাহ বিধানের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং তাঁদের জন্য উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ জ্ঞানের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে।

৪. কোর্স পদ্ধতিতে উচ্চতর কৃষি শিক্ষাক্রমে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত হবে ১ : ১০।

৫. শিক্ষকদের কর্ম-পরিকৃতির মূল্যায়ন প্রথা চালু করতে হবে।

৬. উচ্চতর কৃষি শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় প্রথম ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হবে বিজ্ঞান বিভাগে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীববিদ্যাসহ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। তবে কৃষিবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিদ্যা এবং গণিতসহ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা শুধু কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদে ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

৭ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বর্তমানে কৃষি বিজ্ঞানে যে পাঠ দেওয়া হয় তা একজন শিক্ষার্থীর স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য পর্যাপ্ত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট,

ভেটেরিনারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, পশুসম্পদ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ডিভিএম এর ক্ষেত্রে দুই সেমিস্টারের জন্য এবং অন্যান্য ডিগ্রির ক্ষেত্রে এক সেমিস্টারের জন্য ইন্টার্নশিপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. স্নাতক পর্যায়ে যথাসম্ভব মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করা হবে এবং এই লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় পাঠ্য-পুস্তক ও সহায়ক গ্রন্থাদি রচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে বাংলা একাডেমী ভূমিকা রাখতে পারে।

১০. দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সকল ছাত্রছাত্রীকে অন্তত দুই ক্রেডিট আওয়ার-এর জন্য ইংরেজি ভাষা শিখতে হবে।

১১. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন সেমিস্টারব্যাপী কোর্স পদ্ধতি এম এস কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং অন্যূন তিন বছর মেয়াদি ডক্টরাল কার্যক্রমে গবেষণা ছাড়াও কোর্স-প্রথা প্রবর্তন করা হবে।

১২ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বনবিজ্ঞান অনুষদ খুলে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স এবং গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষা স্নাতক পর্যায়ে সবার জন্য বাধ্যতামূলক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ঐচ্ছিক করতে হবে।

১৪. বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও জাতীয় উন্নয়ন চাহিদার সঙ্গে উচ্চতর কৃষিশিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার জন্য প্রচলিত সংশ্লিষ্ট কোর্সসমূহের পাশাপাশি নতুন নতুন কোর্স সংযোজনের ব্যবস্থা করতে হবে। (যেমন, পরিবেশ বিজ্ঞান, জৈবপ্রযুক্তি, জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং, সম্পদ অর্থনীতি, জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা, ভূমিস্বত্ব ও ব্যবস্থাপনা, পুষ্টিবিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতি)।

১৫. উচ্চতর কৃষিশিক্ষার মান ও সমরূপতা বজায় রাখার জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি সমন্বয়, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে।

ললিতকলা শিক্ষা

একটি সংস্কৃতিবান, সুরুচিসম্পন্ন, ঐতিহ্যসচেতন সুশৃঙ্খল জাতি ও নাগরিকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য ললিতকলা শিক্ষাদান অত্যন্ত জরুরি। ললিতকলার অন্তর্গত সংগীত, চিত্রকলা, কারুশিল্প ও নানাবিধ হাতের কাজ, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীর মন ও মননকে বিকশিত করে, চিত্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করে। ললিতকলা শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনের সুকুমার বৃত্তিকে জাগ্রত করে, মন ও কর্মে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করে, তাই পরিমিতিজ্ঞানসম্পন্ন, দক্ষ এবং সুনাগরিক জনগোষ্ঠী সৃষ্টিতে ললিতকলা শিক্ষা আবশ্যক। দেশের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নাটক, যাত্রা ও থিয়েটার ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন এর মাধ্যমে ধারণা লাভ করা যায়, তেমনি বিভিন্ন দেশের শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। ললিতকলার যে কোন একটি বা একাধিক শাখায় শিক্ষালাভ করে পেশাজীবী গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যায়। ললিতকলা শিক্ষার ফলে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ন্যায় বিদ্যালয়ত্যাগী শিক্ষার্থীদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

সুপারিশ

১. ললিতকলা বিষয়টি সাধারণ শিক্ষায় প্রাথমিক স্তরে আবশ্যিক ও মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করতে হবে।

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ললিতকলা শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, উপযুক্ত কক্ষ ও পরিবেশ সংস্থান করতে হবে।

৩. সরকারি উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে জাতীয় চিত্রশালা, সংগীত ও নৃত্য একাডেমি ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শহর ও গ্রাম পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ চিত্রকলা ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী, সংগীত, নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. ললিতকলা শিক্ষাদান বিষয়টিকে একটা পেশাভিত্তিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

আইন শিক্ষা

দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ও দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টির জন্য আইন শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। দেশে ন্যায়বিচার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের জন্যও আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আইন শিক্ষার দুটি দিক রয়েছে—পেশাগত ও ব্যবহারিক। দেশের প্রচলিত আইন শিক্ষায় এ দুটি দিকের কোনটারই সুষ্ঠু বিকাশ লক্ষ করা যাচ্ছে না। আইন শিক্ষার মান যেমন নানা কারণে নিম্নমুখী হচ্ছে তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এর কল্যাণকর ফলাফল সব সময় লক্ষ করা যাচ্ছে না। তাই আইন শিক্ষার সার্বিক পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা আইন সম্পর্কে যেন আরও আগ্রহী, সচেতন এবং কল্যাণকর দিক সম্পর্কে জ্ঞাত হয় সে বিষয়েও আইন শিক্ষাকে অধিকতর প্রয়োগমুখী করতে হবে। তাই দেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রচলিত আইন শিক্ষার আশু সংস্কার সাধন করতে হবে।

সুপারিশ

১. আইন শিক্ষার মানোন্নয়নকল্পে এলএলবি কোর্সের মেয়াদ দু বছরের পরিবর্তে তিন বছর হওয়া উচিত।

২. আইন শিক্ষায় ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ থাকা উচিত।

৩. আইন শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে যথাযথ পরিচয় বিধান ও এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কলেজগুলোতে এলএলবি কোর্সটিকে দুভাগে বিভক্ত করা উচিত। প্রথম অংশের প্রথম বর্ষ সমাপ্তির পর এলএলবি প্রথম বর্ষ পরীক্ষা হবে। এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় বর্ষে প্রমোশন পাবে। প্রথম দুবছর আইনের ইতিহাস, মৌলিক বিষয়সমূহ ও সূত্রপাঠে ব্যয়িত হবে। তৃতীয় বর্ষে দলিল প্রণয়ন, সওয়াল জওয়াব, আর্জি–মুসাবিদা, মামলা পরিচালনা বিধি ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে। এছাড়া মামলার ইতিহাস লেখা, মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত, পেশাগত নৈতিকতা ও দায়িত্ব এবং Legal writing and research এবং মুট কোর্ট এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্সের চতুর্থ বছরে ব্যবহারিক বিষয়সমূহে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৪. আইন শিক্ষার পাঠ্যসূচি ও পরীক্ষা পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করে তোলা প্রয়োজন। আইন শিক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য পাস মার্ক ৪৫ হওয়া উচিত এবং তৃতীয় শ্রেণীর ডিগ্রি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। আইন শিক্ষার জন্য ইংরেজি ভাষার বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা করে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এলএলবি কোর্সে ইংরেজি ভাষার ওপর একটি পূর্ণপত্র চালু করা প্রয়োজন।

৫. আইন শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এলএলবি অনার্স, এলএলএম/এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি করার সুযোগ নেই, সেখানে তা অবিলম্বে ব্যবস্থা করা উচিত।

৬. আইন শিক্ষায় মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ হবে দুবছরের। মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স দু ভাগে বিভক্ত হবে। যারা প্রথম অংশে কোর্স কার্যক্রম ও দ্বিতীয় অংশে থিসিস কার্যক্রমে যোগদান করে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবে তাদের এমফিল ডিগ্রি প্রদান করা হবে। পিএইচডি ডিগ্রির ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৭. উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ লিগ্যাল ইনস্টিটিউট নামে একটি স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের দেশে ও বিদেশে গবেষণার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. আইন শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য আইন কলেজগুলোর ভৌত সুবিধা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. আইন কলেজ অনুমোদনের ব্যাপারে কলেজ ভবন, পাঠাগার, শিক্ষক নিয়োগ, কলেজের প্রশাসন, পরিচালন ও গভর্নিং বডি গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে সাধারণ কলেজসমূহের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তাদি আইন কলেজের ক্ষেত্রেও কঠোরভাবে প্রয়োগ ও বলবৎ করতে হবে।

১০. বর্তমানে আইন কলেজসমূহে খণ্ডকালীন শিক্ষক ও খণ্ডকালীন ছাত্রছাত্রী এবং সান্ধ্যকালীন কোর্স ও ক্লাস সব মিলিয়ে যে খণ্ডকালীন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান দরকার। তাই, নিয়ম ও নীতি হিসেবে পর্যায়ক্রমে আইন কলেজগুলোতে এলএলবি কোর্সকে Full time day course-এ রূপান্তরিত করা দরকার। ব্যতিক্রম হিসেবে, প্রয়োজনীয় শর্ত সাপেক্ষে কিছু প্রতিষ্ঠিত কলেজে নৈশ বা সান্ধ্যকালীন ব্যবস্থা থাকতে পারে।

১১. আইন কলেজগুলোতে মোট শিক্ষকের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়মিত ও পূর্ণকালীন এবং অনধিক এক-তৃতীয়াংশ খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

১২. অন্যান্য পেশাগত শিক্ষার ন্যায় আইন শিক্ষার জন্যও দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত প্রতিটি বৃহত্তর জেলায় একটি করে সরকারি মডেল আইন কলেজ স্থাপন করতে হবে এবং আইন কলেজগুলোতেও অন্যান্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় অনুদান মঞ্জুর করা উচিত।

১৩. মাধ্যমিক ও প্রথম ডিগ্রি পর্যায়ে অন্যান্য ঐচ্ছিক বিষয়ের ন্যায় আইনকেও একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক ইত্যাদি শাখায় প্রবর্তন করা যায়।

নারী শিক্ষা

দেশ ও সমাজ উন্নয়নের মূল ভিত্তি শিক্ষা। সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক নানা কারণে এ দেশের দরিদ্র মানুষ যেমন বঞ্চিত হচ্ছে তেমনি সর্বস্তরে ব্যাপক সংখ্যক নারীও এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে সর্বদা নারীকে ঘিরে রাখা হয়েছে। নারী শিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশু যত্নের ও ঘরকন্নার কাজে সীমাবদ্ধ রেখে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক জাতীয় উন্নয়নে নিষ্ক্রিয় রাখার পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রবণতা দূর করতে হবে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীও অসামান্য অবদান রেখেছে। স্বাধীনতার পর থেকে নারী আত্মনির্ভরশীল, জাতীয় উৎপাদনে অংশগ্রহণ, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা সচেতন হয়ে ওঠে। তাই নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

নারী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, দারিদ্র্য বিমোচন, সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবার গঠন, যৌতুক ও নারী নির্যাতন নিরোধ করা।

সুপারিশ

১. অধিক সংখ্যক মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনতে হলে স্কুলে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে।

২. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যসূচিতে যথার্থ পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরতে হবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো পাঠ্যসূচিতে আনতে হবে, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তন হয়।

৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে আরও অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচিত লেখা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করার সরকারি সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়ন প্রয়োজন এবং সেই লক্ষ্যে যতদিন পর্যন্ত মহিলা শিক্ষকের সরকারি কোটা পূরণ না হবে ততদিন পর্যন্ত শুধু মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৫. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিষয় নির্বাচনে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকলের পুরো স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং সকল বিষয়ের ওপর সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

৬. দেশে মেয়েদের জন্য একটি মাত্র পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের ভর্তির সময় পছন্দ থাকবে যাতে পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী না হলে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাই মেয়েদের জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আরও বাড়াতে হবে।

৭. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম হওয়াতে ছাত্রীদের শিক্ষার সুবিধার্থে যাতায়াত সুবিধা ও হোস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। নারী শিক্ষার হার বাড়াতে হবে এবং মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

৯. স্নাতক পর্যায়ে ফেমিনিস্টতত্ত্ব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ওমেন্স স্টাডিজ নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা বিভাগ করা যেতে পারে।

১০. নারী শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করতে হবে এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১১. খণ্ডকালীন, বৃত্তিমূলক এবং নারী শিক্ষার বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি বেশি নজর দিতে হবে।

১২. শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সকল নীতি নির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে মন্ত্রণালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৩. ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং এসব ঝরে পড়া ছাত্রীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে।

১৪. উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণা করার জন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড শিক্ষা

যেসব শিশু শারীরিক ও মানসিক সমস্যার জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ করতে পারে না তাদের জন্য দরকার বিশেষ শিক্ষা, দক্ষ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যা। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্য দেশে বিশেষ বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দেশে স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা অবহেলিত। অথচ সুস্থ-জীবন যাপনের জন্য এর অপরিহার্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। শিক্ষার্থীর জীবনে সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব অনেক। দেশে এর কিছু সুযোগ সুবিধা রয়েছে। স্কাউটিং ও গাইডিং শিশু কিশোরদের মন মানসিকতা গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

সুপারিশ

বিশেষ শিক্ষা

১. দেশের প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য সনাক্তকরণ ও জরিপ চালাতে হবে।

২. প্রতিবন্ধীদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৩. প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে।

৪. প্রতিবন্ধীদের বিশেষ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনবোধে পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

৫. চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্য প্রতিবন্ধীদের সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে।

৬. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করতে হবে।

৭. প্রতিবন্ধীদের জন্য কার্যক্রম সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের আওতায় না রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনতে হবে।

স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা

৮. শরীরচর্চা ও খেলাধুলা পাঠ্যসূচিতে আবশ্যিক বলে বিবেচিত হবে।

৯. শরীরচর্চা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

১০. নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের সময় খেলার মাঠ থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১১. স্বল্পমূল্যে স্কুল কলেজে ক্রীড়া সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে।

১২. দেশীয় খেলাধুলার প্রচলন করতে হবে।

১৩ শারীরিক শিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষা

১৪. দেশের সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনসিসি–র শাখা খুলতে হবে।

১৫. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক বিজ্ঞান বিষয়কে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে খুলতে হবে।

১৬. পাবলিক পরীক্ষার পর অলস সময়ে শিক্ষার্থীদের জন্য স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ শিবিরে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

স্কাউট

১৭. দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং চালু করতে হবে।

১৮. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে স্কাউটিংকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

গার্ল গাইড

১৯. মেয়েদের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গার্ল গাইডিং চালু করতে হবে।

২০. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গার্ল গাইডকে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২১. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে গার্ল গাইড বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

গ্রন্থাগার হল সভ্যতার দর্পণ। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার যেমন একটি দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশগত মান নির্ধারণের অন্যতম সূচক, তেমনি গ্রন্থাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ ও এর গুণগত মান ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রাণ স্পন্দনের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা দেশের নাগরিকদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষা গ্রহণে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য সহজ লভ্য করার দায়িত্ব হল দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর, এই প্রত্যয়কে ভিত্তি করে দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

সুপারিশ

১. সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন বর্তমানে সাধ্যাতীত। তাই দেশের প্রত্যেকটি থানা সদরে গণগ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে, যার প্রধান দায়িত্ব হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই পরিবেশন করা।

প্রত্যেক ইউনিয়নে এক বা একাধিক নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ভ্রাম্যমাণ বইয়ের কেন্দ্র রূপে ব্যবহার করতে হবে।

২. পিটিআই, নেপ এবং অধিদপ্তরসমূহের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলোর আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন কাঠামো যুগোপযোগী করতে হবে।

৪. মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজে উন্নত ও আধুনিক মানের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক মঞ্জুরি দিতে হবে।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগারকে তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে।

৬. গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য গ্রন্থ ও সাময়িকী ক্রয়ের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. বিভাগীয় শহর, জেলা এবং প্রত্যেক থানা ও ইউনিয়নে পর্যায়ক্রমে গণগ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ শহরগুলোতে নগর গ্রন্থাগার ও পৌর গ্রন্থাগার স্থাপন করবে।

৮. জাতীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় আর্কাইভসের গুরুত্ব বিবেচনা করে এদের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে হবে এবং জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ শাখা থাকবে যা তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে।

৯. নীতি, পরিকল্পনা ও সমন্বয়গত সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নের জন্য একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (কাউন্সিল) স্থাপন করতে হবে।

১০. মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরকে নিজ নিজ প্রশাসনাধীন গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন ও নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনায় কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পেছনে এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। এই উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন করা হয়েছে, শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের কতটুকু বাঞ্ছিত পরিবর্তন হল তা যাচাই করাই পরীক্ষা ও মূল্যায়নের কাজ। মূল্যায়ন হল একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে কতটা সফল হয়েছে তা নিরূপণ করা।

সুপারিশ

১. স্কুলকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকতে পারে।

২. শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য প্রতি বছর সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষা ও অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা থাকবে।

৩. প্রাথমিক স্তরের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং স্কুলগুলোকে সেখান থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৪. যে সকল শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণীর শেষে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে না, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের একটি কোর্স সমাপ্তি সনদপত্র প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীর অন্তঃপরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল জন্ম তারিখসহ উক্ত সনদপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে। পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্তঃ ও বহিঃ মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। পরীক্ষার্থীকে অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষায় আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৫. দশম শ্রেণীর শেষে একটি পাবলিক পরীক্ষা থাকবে যার নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রথম পর্ব। মাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে। প্রথম পর্ব পরীক্ষার অকৃতকার্য বিষয়সমূহ দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে পরীক্ষা দিতে পারবে। দুই পরীক্ষার ফলাফল একত্র করে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

৬. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষায় এক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে সে বিষয়ে মাত্র একবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তিত হলে পুরাতন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী উক্ত প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে, তবে কোন অন্তর্বর্তীকালীন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাবে না।

৭. পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে। পরীক্ষায় কোন মেধা তালিকা থাকবে না।

৮. প্রত্যেক পাবলিক পরীক্ষায় অন্তঃপরীক্ষা ২০%, বহিঃপরীক্ষা ৮০% (রচনামূলক প্রশ্ন ৩০%, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ৩০%, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ২০%) হিসেবে নম্বর থাকবে। অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষায় আলাদাভাবে পাশ করতে হবে। অন্তঃপরীক্ষার নম্বর বহিঃপরীক্ষার নম্বরের আনুপাতিক গড় বা তার কাছাকাছি শতকরা হারে হতে হবে। অন্যথায় অন্তঃপরীক্ষায় কেবল পাশ নম্বর পাবে।

৯. প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও প্রশ্ন পরিমার্জনাকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. পরীক্ষকদের নিকট থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে, এবং যথাসময়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যর্থতার জন্য শাস্তির বিধান করতে হবে। উত্তরপত্রের সম্মানী যুগোপযোগী করতে হবে।

১১. মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পরীক্ষার কেন্দ্র থানা সদরের নিচের পর্যায়ে হবে না।

১২. কর্মদক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য এক বোর্ড থেকে অন্য বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় অন্তঃ ও বহিঃমূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৪. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে, তাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

১৫. প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত কোন স্তরেই শিক্ষার্থীদের জন্য কোন গাইড বই, নোট বই রাখা চলবে না। প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করতে হবে।

১৬. শিক্ষক ছাত্র অনুপাত হবে প্রাথমিক স্তরে ১:৩৫ এবং মাধ্যমিক স্তরে ১:৪০।

ছাত্রকল্যাণ ও নির্দেশনা

শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যয়ভার লাঘব করে ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়নে উৎসাহিত ও প্রয়োজনীয় ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা এবং পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

অনেক সময় বহু সমস্যার আবর্তে অনেক শিক্ষার্থী বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, ফলে অনেকের জীবন বিনষ্ট হয়। তাই ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি কার্যকরভাবে প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। তা করা হলে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সহজ হবে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

সুপারিশ

১. প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ চালু রাখা এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর বৃত্তিদানের ব্যবস্থা এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩. কর্তৃপক্ষের সাহায্য, নাগরিকদের দান, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের অনুদান নিয়ে প্রতি শিক্ষায়তনে ছাত্রকল্যাণ তহবিল গঠন করে অভাবগ্রস্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পুষ্টিকর টিফিন দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগসহ প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা কেন্দ্র থাকতে হবে।

৫. প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে ব্যায়ামাগার থাকবে।

৬. ছাত্রদের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে ছাত্র রাজনীতির একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দল, ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক ও অভিভাবক প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকতে পারেন।

৭. শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও যে কোন জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি চালু করতে হবে এবং একটি জাতীয় নির্দেশনা ও পরামর্শকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৮. যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি বিদ্যমান আছে সেগুলো আরও জোরদার করতে হবে।

ছাত্রছাত্রী ভর্তি

১. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ভর্তির যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

২. ছাত্রছাত্রীর ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাসের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কোড পদ্ধতি অবলম্বন করে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষা ও শিক্ষকের মান উন্নয়ন এবং শিক্ষকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষকের সংখ্যাবৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন প্রয়োজন। আমাদের দেশের প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যাপ্রধান, ব্যবহারিক শিক্ষা অপূর্ণ, মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি বিরাজমান, তাই আশানুরূপ ফললাভ হচ্ছে না। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ১০টি প্রশিক্ষণ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। ১০টি প্রশিক্ষণ কলেজেই বি এড ডিগ্রি দেওয়া হয়। ঢাকা, ময়মনসিংহ (পুরুষ) ও রাজশাহী প্রশিক্ষণ কলেজে এম এড ডিগ্রিও প্রদান করা হয়। দেশে ৫টি প্রাইভেট প্রশিক্ষণ কলেজ রয়েছে। এছাড়া ১৯৮৫ সাল থেকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দূর শিক্ষণের মাধ্যমে প্রতি বছর বি এড ডিগ্রি প্রদান করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ৫৩টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। এগুলোতে এক বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে তা অপ্রতুল, চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত এবং যুগোপযোগী নয়।

সুপারিশ

১. শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।

২. প্রশিক্ষকদের পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তনের আগেই নিজ নিজ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে।

82287

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক – প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

৩. প্রশিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষদের জন্যও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।

৪. প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের একটি সুনির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের কমপক্ষে তিন মাস ব্যবহারিক পাঠদানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৬. ব্যবহারিক পাঠদানের জন্য যে দুটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে সে দুটি বিষয় ছাত্রজীবনে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষালাভ করেছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৭. প্রশিক্ষণে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যবস্থা করা ও প্রশিক্ষণার্থীদের ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮. সকল শিক্ষকের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, কর্মরত শিক্ষকদের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সঞ্জীবনী কোর্সের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা, প্রতিবন্ধী, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক) ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের উপযোগী দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়বস্তুর তারতম্য থাকবে।

১০. প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক মঞ্জুরি বাড়ানো এবং অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

১১. প্রশিক্ষণ কলেজ আরও বাড়াতে হবে এবং সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব

প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই শিক্ষকদের করুণ অবস্থা। শিক্ষকতা পেশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা পেলেও উচ্চতর প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত সমযোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের তুলনায় তাঁদের মর্যাদা, বেতন ভাতা ও সুযোগ–সুবিধা কম। সরকারি শিক্ষকবৃন্দ বেসরকারি শিক্ষকদের তুলনায় উন্নততর অবস্থানে থাকলেও অন্যান্য সমযোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের চেয়ে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন মর্যাদার স্তরে রয়েছেন। বেসরকারি শিক্ষকদের অবস্থা আরও খারাপ। তাই তাঁরা জীবিকা নির্বাহের তাগিদে খণ্ডকালীন কাজ, টিউশনি, কোচিং সেন্টার ইত্যাদিতে অধিক সময় ও শ্রম শক্তি ব্যয় করেন। ফলে আদর্শ শিক্ষকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, তাঁদের মানও ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে।

সুপারিশ

১. সমযোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিভিন্ন স্তরের ও ধারার শিক্ষকদের বেতন ভাতার বৈষম্য দূর করতে হবে এবং সরকারি প্রশাসনসহ অন্যান্য পেশায় একই অথবা সমমানের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বেতন সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

২. আগামী দশ বছরের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের বৈষম্য দূর করে সমান বেতন ভাতা, পেনশনসহ সকল আর্থিক সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

৩. দায়িত্ব পালনকালে, পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করতে গিয়ে যে সকল শিক্ষক সন্ত্রাসী ও দুষ্কৃতকারীদের হামলায় নিহত, আহত ও লাঞ্ছিত হন তাঁদের নিরাপত্তা বিধান ও অপরাধীদের শাস্তি বিধানের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। নিহত শিক্ষকের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দান ও আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।

৪. সরকারি খরচে বিদেশে পড়াশোনা, গবেষণা, শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলনে অংশগ্রহণ, বিদেশী বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষক ও শিক্ষার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৫. মহিলা শিক্ষকদের চাকরিতে নিয়োগসহ কোন ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে বৈষম্য রাখা চলবে না। সমযোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদের বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬. পার্বত্য জেলার শিক্ষকদের পাহাড়ি ভাতা প্রদান করতে হবে।

৭. পেশাগত আচরণ বিধি লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত। অভিযুক্ত শিক্ষকের আত্মপক্ষ সমর্থনের ও ন্যায়বিচার লাভের সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৮. শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজে বিশেষ অবদান, মৌলিক রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য শিক্ষকদের সম্মানিত ও উৎসাহিত করতে হবে। উন্নতমানের প্রকাশনা ও গবেষণাকে তাঁদের পেশাগত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য করে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে।

৯. শিক্ষক সংগঠনগুলোর উচিত শিক্ষকদের নৈতিক বা আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং এ নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে সরকারও একটি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষার মূল প্রাণবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্ক্ষিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠে ; তাই, পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হয়। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্ক্ষিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাকে এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর সোপান হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুপারিশ

ক. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

১. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে এক ও অভিন্ন।

২. প্রাথমিক স্তরের এ শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক (Competency based) ও আবশ্যকীয় শিখনক্রমের (Essential Learning Contineum) ভিত্তিতে রচিত হবে।

৩. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয়, সামাজিক, মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে ও পাঠ্যসূচিসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মাতৃভাষা, আপন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটবে।

৫. আত্মকর্মসংস্থান ও শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থী যেন আগ্রহী হয় তার প্রতিফলন ঘটবে।

৬. জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন যেন হয় তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

খ. পাঠ্যপুস্তক

১. প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রীর মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যাপারে বর্তমানে অনুসৃত নীতিমালা অব্যাহত থাকতে পারে।

২. মাধ্যমিক স্তরের জন্য শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ, প্রকাশ ও বাজারজাতকরণের বর্তমান অনুসৃত নীতি অব্যাহত থাকতে পারে।

৩. আগ্রহী ও সমর্থ অভিভাবকরা যেন খোলাবাজারে ক্রয় করতে পারে সেজন্য সাদা কাগজে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৪. দেশের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিশেষত শহরাঞ্চলের সচ্ছল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ন্যূনতম মূল্যে বই প্রাপ্তির ব্যবস্থা বিবেচনা করা যায়।

৫. প্রাথমিক স্তরে একজন শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিবছর একটি করে বই একবার মাত্র ব্যবহার করা আমাদের মতো দরিদ্র দেশের জন্য বিরাট অপচয়। তাই এ স্তরের বই কিভাবে একাধিক শিক্ষাবর্ষে ব্যবহার করা যায় সে জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৬. মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তককে আকর্ষণীয়, নির্ভুল ও সুন্দরভাবে মুদ্রণের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৭. মাধ্যমিক স্তরের সীমিত সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক আগ্রহী ও সমর্থ ক্রেতাদের জন্য সাদা কাগজে মুদ্রণ করা যায়।

৮. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন ও মুদ্রণের গুণগতমান ও ধারাবাহিক ক্রমোন্নয়ন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য একটি 'পাঠ্যপুস্তক আর্কাইভ' প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৯. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের লেখকদের এককালীন সম্মানী ও নির্ধারিত হারে রয়েলটি প্রদান করতে হবে।

১০. সরকারি অর্থানুকূল্যে উচ্চ শিক্ষার জন্য নির্ধারিত পুস্তক এবং উন্নতমানের সৃষ্টিশীল ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

১১. পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, পরিমার্জন ও সংস্কার সাধনের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হবে।

১২. পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

গ. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নীতিমালা

১. বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের যে নির্দেশনা বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে রয়েছে তা অনুসরণ করা যায়।

২. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার যে নীতিমালা নির্দেশ করা হয়েছে, সে অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

ঘ. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থায়ী লোকবল দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে।

২. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণের মধ্য থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করা যেতে পারে।

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি–বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে অনিয়ম ও অসমনীতি চলছে তার নিরসনকল্পে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজ পর্যন্ত (মাদ্রাসাসহ) শিক্ষায় শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি পৃথক 'শিক্ষা কর্ম কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

প্রাথমিক শিক্ষা

সমন্বিত ও সুসংগঠিত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। অতীতে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনেও শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব

আরোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের আলোকে ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে বিশাল কাঠামো, তবুও অনস্বীকার্য যে এসব সুপারিশ অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয় নি। তাই প্রাথমিক-শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে পুনর্বিন্যাস করা আবশ্যক।

সুপারিশ

১. প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন।

২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে মহিলাদের আরও অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৩. শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে একটি পৃথক 'শিক্ষা কর্ম কমিশনে'র মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন।

৪. বর্তমানে শিক্ষকদের থানার বাইরে বদলির নিয়ম না থাকায় প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রয়োজনে শিক্ষকদের আন্তঃ থানা বদলির নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

৫. প্রধান শিক্ষক শিক্ষকদের বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

দেশের শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের ওপর। আমাদের বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান প্রশাসনিক পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস অত্যন্ত জরুরি। আমাদের দেশে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এ সমস্ত প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও গুণগত উৎকর্ষ সাধনের কাজ চলছে এবং এর সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করছে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ওপর।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রশাসনের লক্ষ্য হচ্ছে বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অসুবিধা ও ত্রুটিবিচ্যুতি চিহ্নিত করা এবং তা দূর করা। আধুনিক, যুগোপযোগী, বাস্তবমুখী শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থায় পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা।

সুপারিশ

১. শিক্ষা প্রশাসনে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে বিভাগীয়, জেলা ও থানা পর্যায় পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

২. জেলা শিক্ষা অফিসারের পদটি জেলার অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে উপ-পরিচালক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

   একাডেমিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যানুপাতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে যেন প্রতিটি বিদ্যালয় তিন মাসে অন্তত একবার পরিদর্শন করা সম্ভব হয়।

৩. বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনার জন্য থানা পর্যায়ে কোন প্রকার ব্যবস্থা নেই। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখাশোনার জন্য থানা পর্যায়ে একটি সহকারী পরিচালক ও একটি বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

৪. অধিদপ্তরে বর্তমান EMIS কম্পিউটার সেলকে সম্প্রসারণ করে আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন।

৫. স্কুল ও কলেজের শিক্ষার সঙ্গে জড়িত শিক্ষাবিদদের ব্যবস্থাপনায় অধিক হারে সম্পৃক্ত করতে হবে। মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষকদের শিক্ষা প্রশাসনে নিযুক্ত করা যেতে পারে এবং তাঁদের পদোন্নতির সুযোগ থাকতে হবে।

৬. স্কুল ম্যাপিং কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে অনুমোদন প্রদান করা যায়।

৭. শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমকে স্বচ্ছতায় এনে প্রয়োজনে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা যেতে পারে। বর্তমান বোর্ডসমূহ (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ) কেন্দ্রীয় বোর্ডের শাখা হিসেবে কাজ করবে এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরি বোর্ডসমূহের মধ্যে বদলিযোগ্য হবে।

৮. সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি অভিন্ন নিয়োগ বিধি ও সুষ্ঠু নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয় এবং এজন্য একটি পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।

৯. সরকারি /বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণ এবং তাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেতনের ১০০% সরকার থেকে প্রদান করা যেতে পারে এবং কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে চিকিৎসা ব্যয়, অকালমৃত্যুতে পরিবারকে এককালীন সাহায্য করা, পেনশন/ অবসরকালীন, এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১০. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই নীতিমালায় জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক /কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরি সংক্রান্ত বিধি বিধান থাকতে হবে যাতে কর্ম কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

১১. ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের সংখ্যানুপাতে সরকারি স্কুল, কলেজ, টিটি কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ জেলা শিক্ষা অফিস, আঞ্চলিক অফিস ও অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয়/তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণীর পদ সৃষ্টি করতে হবে।

১২ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের অভিন্ন বেতন প্রদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

১৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শিক্ষা ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদের একজন কর্মকর্তা এবং পদমর্যাদার দিক দিয়ে তিনি অতিরিক্ত সচিবের পর্যায়ের। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য এবং মেধা ও সময়ের অপচয় রোধ করার জন্য মহাপরিচালক কর্তৃক প্রেরিত সকল নথি সরাসরি সচিবের নিকট পেশ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কর্মসূচি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে প্রকল্পভুক্ত জনবলের চাকরিও শেষ হয়ে যায় এবং ডেপুটেশনে আগত কর্মকর্তাগণ তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে ফিরে যায়। ফলে প্রকল্প সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রয়োজন হলে পাওয়া যায় না এবং প্রকল্পের জন্য ক্রয় করা যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হয়ে ওঠে না। এসব অসুবিধা দূর করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রকল্প বাস্তবায়ন শাখা নামে একটি নতুন সেল সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মসূচি এ সেল-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায়।

১৫. ব্যক্তি মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় আনা দরকার। প্রয়োজনে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সমতার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৬. শিক্ষকদের চাকরির বয়সসীমা ষাট বছরে উন্নীত করতে হবে।

অর্থায়ন

শিক্ষার বিনিয়োগ ও তার সঙ্গে আর্থ সামাজিক প্রতিদানের ইতিবাচক সম্পর্ক নিয়ে এখন আর সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে দ্বিমত নেই। তবে শিক্ষা যেহেতু জীবন ও জীবিকার আশ্রয়স্থল তৈরি করে, সেজন্য শিল্পে ব্যয় ও শিক্ষাখাতে ব্যয় একই দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা যায় না। শিক্ষা বাবদ ব্যয় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে একটি প্রয়োজনীয় শর্ত বলে সকলে মেনে নিয়েছে। জাতীয় আয়ের সামান্য পরিমাণই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়। এর অনুপাত ১৯৭২-৭৩-এ ছিল ১.৮%, সাম্প্রতিককালে এ অনুপাত ২.৩-এ দাঁড়িয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন। জাতীয় উন্নয়ন অর্জন করতে হলে উৎপাদক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রধান উপাদান। বর্তমানে যে পরিমাণ অর্থ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয় তা অপ্রতুল।

সুপারিশ

১. ২০০০ সাল নাগাদ শিক্ষাখাতে ক্রমান্বয়ে জাতীয় আয়ের বর্তমান বরাদ্দ ২.৩% থেকে ৫%–এ উন্নীত করতে হবে। প্রতি বছর ১% হারে বাড়ানো যেতে পারে। জাতীয় আয়ের ৭% শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করতে পারলে শিক্ষাকে সর্বজনীন পর্যায়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

২. বিত্তবানদের আয়ের ওপর শিক্ষা কর হিসেবে কর প্রবর্তন করে শিক্ষা খাতের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই কর ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে ও পৌর এলাকায় স্থানীয় সরকার আদায় করতে পারে এবং তা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যেতে পারে।

৩. ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন ফোরামে আলোচিত হচ্ছে। বেতন বৃদ্ধি করতে হলে বিষয়টি আরও ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। বেতন বৃদ্ধি করতে হলে শেষ পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবে। বেতন বৃদ্ধি করা হলে সেই সঙ্গে শিক্ষা ঋণ ও বৃত্তি যুক্তিযুক্ত মাত্রায় প্রবর্তন করার প্রয়োজন হবে।

৪. বেসরকারি উদ্যোগ বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার প্রসার উৎসাহিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীর অনুদান করমুক্ত করার প্রয়োজন হবে। তবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয় এবং শিক্ষার মান রক্ষা করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৫. অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন ব্যাংকে রিজার্ভ হিসেবে গচ্ছিত রয়েছে। এই গচ্ছিত অর্থ একত্র করে প্রারম্ভিক মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে শিক্ষা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। প্রয়োজনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংক থেকে বিশেষ করে ভৌত কাঠামো তৈরির জন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

দ্বিতীয় অংশ : মূল প্রতিবেদন

অধ্যায়—২

জাতীয় শিক্ষানীতি : পরিপ্রেক্ষিত, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. ভূমিকা

১.১. সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে একটি উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ড. কুদরাত–এ–খুদার নেতৃত্বে সরকার একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে এবং ১৯৭৪ সালে এই কমিশনের রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করা হয়। কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে দেশের তৎকালীন আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রেক্ষাপট যেমন গুরুত্ব লাভ করে তেমনি সমকালীন বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতও বিবেচিত হয়। মূলত তৎকালীন বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক দিকদর্শনগুলো এ কমিশনের রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়।

১.২. এটা খুবই স্পষ্ট যে, পৃথিবীর যে কোন দেশের শিক্ষাদর্শন রাষ্ট্রীয় নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। কাজেই শিক্ষাদর্শনের মধ্যে পরিবর্তনশীলতা লক্ষণীয়। আমাদের দেশেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সাধিত হওয়ার পর দেশের চারটি রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয় এবং বাংলাদেশের সংবিধানেও সংশোধনী আসে। এর প্রভাব আমাদের শিক্ষাদর্শনেও প্রতিভাসিত হয়।

১.৩. যেহেতু শিক্ষার কিছু মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শাশ্বত ও চিরন্তন, তাই কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে শিক্ষার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিধৃত হয়েছিল, শিক্ষা কাঠামোর যে স্তরবিন্যাস ও শিক্ষা সম্পর্কিত যে মৌলিক দিকদর্শন চিহ্নিত করা হয়েছিল সেগুলো দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরও উপযোগিতা হারায় নি। ফলে, কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের অনেকগুলো ক্ষেত্র এখনও সমকালীন চিন্তাস্রোতের সঙ্গে যেমন যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ তেমনি গ্রহণযোগ্য।

১.৪. ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন না হলে হয়ত কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশনের বাস্তবায়ন আমরা অবলোকন করতে সমর্থ হতাম। কিন্তু একটু সচেতনভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট আংশিকভাবে হলেও বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ কমিশনের আলোকে ১৯৭৬ সালে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি। এ কমিটির সুপারিশের আলোকেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়। ১৯৯৫ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তাও মূলত কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বিবেচনায় রেখেই হয়েছে। তবু এ কথা সত্য যে, কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশনের পূর্ণ বাস্তবায়ন হয় নি।

১.৫. কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশের পর বিগত পঁচিশ বছরে আরও তিনটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। ১৯৭৯ সালে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি নামে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ প্রকাশিত হয়, ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট। এ রিপোর্ট মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট নামে পরিচিত। এইসব কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের তেমন চেষ্টা করা হয় নি। তাই দীর্ঘদিন পরে হলেও একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোয় এই প্রথমবারের মতো দেশের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের ব্যাপক সম্পৃক্ততায় ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি।

১.৬. একটি দেশের শিক্ষানীতিতে প্রতিফলিত হয় একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতির দীর্ঘদিনের লালিত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয়–সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ। তাই, শিক্ষানীতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফলিত হয়

কর্মবোধ, মূল্যবোধ ও মানবতাবোধসম্পন্ন একটি জনশক্তি গড়ে তোলার দিক-নির্দেশনা। শিক্ষানীতিতে প্রতিফলিত হয় দেশের জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সাংবিধানিক নীতিমালা। সুতরাং রাষ্ট্রীয় সংবিধানের আওতায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক বিশ্বজগতের সমকালীন জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, দক্ষ, দেশপ্রেমিক, নৈতিক, মানবীয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন একটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হলে নির্ণয় করতে হবে কতগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

২. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

২.২ বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।

২.৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।

২.৪. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদনক্ষম, সৃজনশীল করে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

২.৫. কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্ম সংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

২.৬. বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

২.৭. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা।

২.৮. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা।

২.৯. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা।

২.১০ দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

২.১১. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা।

২.১২ শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী পুরুষ বৈষম্য (Gender bias) দূর করা।

২.১৩ শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো।

২.১৪ পরিবেশ-সচেতনতা সৃষ্টি করা।

অধ্যায়—৩

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

১. ভূমিকা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজ সর্বজনস্বীকৃত। দেশের মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার অনন্য ধাপ হল প্রাথমিক শিক্ষা। আজকের উন্নত দেশগুলো সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে সকল নাগরিকের ন্যূনতম শিক্ষার চাহিদা পূরণ করে ধাপে ধাপে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির শীর্ষে আরোহণ করেছে। তাই আমাদের দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন অপরিহার্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারিত হয়। বিগত দুই যুগে গৃহীত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের ফলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের ৯০ শতাংশের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ৬০ শতাংশের মতো এই শিক্ষা সম্পূর্ণ করে। ভৌত সুযোগসুবিধার গুরুতর অভাব, শিক্ষকস্বল্পতা, তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার সমস্যা এবং প্রাথমিক স্তরে বিভিন্নমুখী শিক্ষার ধারা প্রভৃতি কারণে বর্তমানে সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। সাম্প্রতিককালে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তাতে শিক্ষার পরিমাণগত বিস্তার ঘটলেও দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সে সব যথেষ্ট কার্যকর হয় নি।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং পরবর্তীকালের জীবনভর শিক্ষার ভিত্তিভূমি রচনা করে। কাজেই এই স্তরের শিক্ষা, যাকে আজকাল মৌলিক শিক্ষা বা বুনিয়াদি শিক্ষা বলে গণ্য করা হয়, তা প্রতিটি শিশুর আনন্দময় বর্তমান ও উৎপাদনশীল ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে অনেককে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কর্মজীবন আরম্ভ করতে হয়, আবার অনেকে পরবর্তী শিক্ষাস্তরে প্রবেশ করে। এই দুই ধরনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা দরকার। তাই—

২.১. প্রাথমিক শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক সাক্ষরতা নিশ্চিত করে তাকে জীবনভর শিক্ষাগ্রহণ উপযোগী করে গড়ে তুলবে এবং তার মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণ করবে। মৌলিক শিখন চাহিদার মধ্যে পড়ে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন।

২.২. প্রাথমিক শিক্ষা সৃজনশীল বিকাশের মাধ্যমে শিশুকে পরবর্তী স্তরের শিক্ষালাভের উপযোগী করে গড়ে তুলবে।

২.৩. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হবে শিশুদের ব্যবহারিক সাক্ষরতা সুদৃঢ় করা। এই স্তরের শিক্ষাকাল শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবেগিক-নৈতিক গঠন ও অর্থপূর্ণ কায়িক শ্রমের প্রস্তুতি গ্রহণেরও সময়।

২.৪. প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণ, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করবে। শিশুদের মনে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ, কৌতূহল, সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, শ্রম, সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠা এসব বাঞ্ছিত গুণাবলি জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

২.৫. বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত বিস্তারের লক্ষ্যমাত্রা মোটামুটি অর্জিত হলেও শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা ও তাদের অর্জিত শিক্ষার মান সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষাদানের মান দুর্বল বলেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষায় আগ্রহ হারিয়ে বিদ্যালয়ে প্রায়শ অনুপস্থিত থাকে বা অকালে ঝরে পড়ে। সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। তার মধ্যে প্রধান হল :

২.৫.১. শিক্ষার্থী–শিক্ষক অনুপাত সন্তোষজনক পর্যায়ে আনা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা অর্থাৎ বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে তোলা।

২.৫.২. শিক্ষকদের শিক্ষাদানের চেয়ে শিক্ষার্থীর স্বশিখনের ওপর বেশি গুরুত্বদান, সনাতন পদ্ধতিতে সমগ্র শ্রেণীকে একসঙ্গে পড়ানোর পরিবর্তে শ্রেণীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা।

২.৬. ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি শক্তিশালী করা। এসব লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ

বর্তমানে চালু পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের জীবন সমস্যা সমাধানের উপযোগী সাক্ষরতা, জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের সহায়ক হচ্ছে না। ক্রমাগত জীবন ও সমাজের জটিলতা বৃদ্ধির ফলে সারা পৃথিবীতেই শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিকাল বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবন–দক্ষতার ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জনের এবং জীবনভর শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশনসহ বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে আট বছর করার সুপারিশ করেছে। বুনিয়াদি শিক্ষার আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ আট বছর করা প্রয়োজন ; এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ–সুবিধা, বিশেষ করে শিক্ষকসংখ্যা বহু গুণে বাড়াতে হবে। প্রতি বিদ্যালয়ে একটা ছোটখাট গ্রন্থাগার থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

৩.১. প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীকে নিম্ন প্রাথমিক এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীকে উচ্চ প্রাথমিক স্তর নামকরণ করতে হবে ;

৩.২ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০০৩ সালের মধ্যে ছয় বছর, ২০০৬ সালের মধ্যে সাত বছর এবং ২০১০ সালের মধ্যে আট বছর করতে হবে ;

৩.৩. বর্তমানে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র তিনটি শ্রেণীকক্ষ আছে ; ২০০০ সালের মধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিম্নতম পাঁচটি শ্রেণীকক্ষ নিশ্চিত করা এবং তারপর ক্রমান্বয়ে আরও তিনটি শ্রেণীকক্ষ ও গ্রন্থাগারের জন্য একটি পৃথক কক্ষ যোগ করতে হবে ;

৩.৪. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষক সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি করতে হবে যেন শিক্ষক–শিক্ষার্থী অনুপাত ১ঃ৩৫–এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ষষ্ঠ–অষ্টম শ্রেণীর জন্য বিষয়–ভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৩.৫. একুশ শতকের চাহিদা অনুসারে সুনাগরিক সৃষ্টির জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা

৪.১. আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা যেমন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা, কিনডারগার্টেন শিক্ষা, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষা, বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। মান ও বৈশিষ্ট্যের বিচারে এসব ভিন্ন। ফলে শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই শিশুদের যোগ্যতার মধ্যে যেমন তারতম্য গড়ে ওঠে, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের মধ্যেও ভিন্নতা তৈরি করে। তাতে একটি

ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। আমাদের সংবিধানে স্পষ্টভাবে সমমানের সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে অন্তত প্রাথমিক স্তরে সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই ধারার শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক। অবশ্য এই সমন্বিত শিক্ষাক্রমের মধ্যে প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অগ্রসর ও অনগ্রসর শিশুদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

৫.১. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম হবে দেশের আর্থসামাজিক চাহিদা, শিশুদের দেহমনের পুষ্টি এবং তাদের সংস্কৃতিচেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার বিষয় হবে মাতৃভাষা, গণিত ও পরিবেশ পরিচিতি–সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সংগীত ইত্যাদি বিষয়। তৃতীয় শ্রেণী থেকে থাকবে ইংরেজি ভাষা এবং ধর্ম (জীবনাচরণ ও নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বসহ)। ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে ষষ্ঠ–অষ্টম শ্রেণী প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে। এই পর্যায়ে শিক্ষাক্রমের বিষয় হবে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, বহুমুখী শিখন (গার্হস্থ্য অর্থনীতি, কৃষি ইত্যাদি), ধর্ম, ললিতকলা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা।

৫.২ পর্যায়ক্রমে স্থানীয় বিভিন্ন পেশা ও উৎপাদনশীল কায়িক শ্রম সম্পর্কে শিশুদের ধারণা লাভের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাদের সৃজনশীলতা, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং সাম্প্রদায়িকতামুক্ত উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন ও বিকশিত করতে হবে। পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি, জ্ঞানলাভ ও বিনোদনের জন্য পাঠ্যপুস্তকের বাইরে শিক্ষার্থীদের অন্যান্য বই নিয়মিত পড়ায় এবং নানা ধরনের সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করতে হবে। শিশুদের দেশপ্রেম ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকশিত করার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিয়মিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত গাওয়া, জাতীয় দিবস পালন এবং সাহিত্য চিত্রাঙ্কন সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃবিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক স্তরের নিচের দিকে (বিশেষত প্রথম––দ্বিতীয় শ্রেণীতে) যতদূর সম্ভব একই শিক্ষক একটি শ্রেণীর শিশুদের সকল বিষয়ে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা পদ্ধতি হবে শিশুকেন্দ্রিক, কর্মমুখী ও প্রায়োগিক।

৫.৩. প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা

বর্তমানে প্রথম শ্রেণী থেকেই বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজি শিক্ষাদান করা হয়। অনেকে মনে করেন শিক্ষাজীবনের শুরুতেই এক জন শিশুকে দুটি ভাষা শেখাবার চেষ্টা করলে তার ওপর অতিরিক্ত মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ের পরিবেশ, বিদ্যালয়ে অবস্থানকাল, শিক্ষা উপকরণের অভাব ইত্যাদি কারণে দুটি ভাষা চালু থাকার ফলে ইংরেজি শিক্ষাও হচ্ছে না, আবার মাতৃভাষা শেখাও নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। তাই শিক্ষার্থী মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা আয়ত্ত করার পর তাকে দ্বিতীয় ভাষা পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া এদেশের অধিকাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করে ; তাদের ইংরেজি ভাষার ব্যবহার খুব একটা নেই এবং এ কারণে পরবর্তীকালে তারা ইংরেজি ভাষার অর্জিত দক্ষতা ধরে রাখতে পারে না। এজন্য কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশন ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি শেখাবার প্রস্তাব করেছিল। অন্যদিকে ইংরেজি আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। ইতোমধ্যে ১৯৯১ সাল থেকে সরকারের এক নির্বাহী আদেশবলে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি চালু করা হয়েছে ; অথচ অধিকাংশ গ্রামীণ বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে ইংরেজি শিক্ষা যেন তেন প্রকারে সমাধা করা হচ্ছে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি শিক্ষার এবং প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাদানের মান উন্নত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.৪. প্রাথমিক স্তরে ধর্মশিক্ষা

বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বিদ্যমান। তবে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব ধর্মের শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয় না বলে প্রায়শ এক ধর্মাবলম্বী শিক্ষক অন্য ধর্ম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অনেকে

মনে করেন ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সেজন্য ধর্মশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক অবয়বের প্রয়োজন নেই ; কেউ শিশুকে ধর্মশিক্ষা দিতে চাইলে তা ব্যক্তিগত উদ্যোগে দিতে পারেন। তাঁদের মতে মানবিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমেই হতে পারে ; তার জন্য আলাদাভাবে ধর্মশিক্ষা বিষয় হিসেবে রাখার প্রয়োজন নেই। আবার অন্য মত হল আমাদের দেশে পারিবারিক পর্যায়ে অনেকক্ষেত্রে ধর্মের নামে কুসংস্কার শিক্ষা দেওয়া হয় ; তাই স্ব-স্ব ধর্মশিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অংশরূপে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষত নানামুখী শিক্ষাধারাকে একীভূত করার প্রয়োজনে তৃতীয় শ্রেণী থেকে স্ব-স্ব ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশিক্ষার জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষকের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য মিসেস হেনা দাস প্রাথমিক স্তরে ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থা রাখা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। ধর্মশিক্ষায় নিছক আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে সৎ জীবনাচরণ ও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই সঙ্গে অবিলম্বে ইবতেদায়ি স্তরের এবং ক্রমে ক্রমে বর্তমান দাখিল স্তরের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষকের ব্যাপকভিত্তিক দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি শিক্ষক প্রশিক্ষণের (কর্মকালীন প্রশিক্ষণসহ) ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হবে। যে সব ইবতেদায়ি মাদ্রাসা প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষাসূচি গ্রহণ করবে, উপযুক্ত জরিপের ভিত্তিতে তাদের শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুরূপ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। তবে উপযুক্ত জরিপের মাধ্যমে অস্তিত্বহীন ও ভুয়া ইবতেদায়ি মাদ্রাসা বা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চিহ্নিত করে সরকারি সুযোগ সুবিধা বন্ধ করতে হবে।

৫.৫. প্রাথমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা

উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী কিছু না কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক শিক্ষা শেষ করে যারা আর বিদ্যালয়ে পড়বে না তারা এ শিক্ষার ফলে বাস্তব জীবনে সহজে কর্মসংস্থান নিতে পারবে।

৫.৬. শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ও পঠন-পাঠনের সময়

গত দুই দশকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সে অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায়নি। তাছাড়া একই স্কুল সকাল-দুপুর দুই পালায় পরিচালিত হওয়ার ফলে একদিকে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে অবস্থানকাল (contact hours) কমেছে। প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিদ্যালয়ে অবস্থানকাল হয় বছরে গড়পড়তা মাত্র ৪৬০ ঘণ্টা এবং তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণীতে মাত্র ৬৯০ ঘণ্টা। শ্রেণীর আকার মাত্রাতিরিক্ত বড়, প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিশুর সংখ্যা গড়ে ৭০-৭৫ জন, তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণীতে এ সংখ্যা ৪৫-৫০ জন। এ সবই মানসম্মত শিক্ষার পরিপন্থী। বর্তমানে শিক্ষকের পক্ষে প্রতি বিষয়ের জন্য প্রতি শিশুকে গড়ে মাত্র ৩০ সেকেন্ড সময় দেওয়া সম্ভব। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৩৫ এর চেয়ে বেশি হওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়। বছরে ২৩০টি কার্যদিবস ধরে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকাল বছরে অন্তত ৬৯০ ঘণ্টা এবং তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণীতে অন্তত ১,২৬৫ ঘণ্টা (শেষোক্ত ক্ষেত্রে আধ ঘণ্টা বিরতিসহ) হওয়া উচিত।

৬. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে একজন শিক্ষার্থী অনায়াসে মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মান যাচাইয়ের জন্য কোন পরীক্ষা নেওয়া হয় না। সব শিক্ষার্থী যাতে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তা নিশ্চিত করার জন্য অনেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে বহিঃপরীক্ষা চালু করার সুপারিশ করে থাকেন। আবার অন্য মত হল এ পর্যায়ে বহিঃপরীক্ষা মনোবিজ্ঞানসম্মত নয় ; ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। তবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করা দরকার ; ধারাবাহিক মূল্যায়নের সঙ্গে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা প্রথাও চালু থাকতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সহজতর ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু করা যেতে পারে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে বৃত্তি পরীক্ষা ও অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হবে।

৭ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশের অধিকাংশ বয়স্ক মানুষ নিরক্ষর ও অসুবিধাগ্রস্ত হওয়ায় এদেশের বহু শিশু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক যোগ্যতা অর্জনের পরিবেশ নিজ পরিবারে পায় না। তাদের অনেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়, কেউ কেউ ঝরে পড়ে। তাই তাদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন। আবার অন্য মত হল প্রথম শ্রেণীর প্রথম ছয় মাসের শিক্ষাকে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার পর্যায়ে এনে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব, আলাদা শিশু শ্রেণীর প্রয়োজন নেই। কেননা তাতে অতি শৈশবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর স্বাভাবিক বর্ধন ও মুক্ত শিক্ষা ব্যাহত হয়, এজন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচটি শ্রেণী কক্ষ স্থাপন করা যাচ্ছে না তখন সারা দেশের সব শিশুর জন্য পৃথক শ্রেণীকক্ষ খুলে অবৈতনিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা বাস্তবসম্মত নয়। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও শিশুর শারীরিক বিকাশের ধারা, মানসিক বিকাশের স্তরসমূহ এবং সামাজিকীকরণের কৌশল পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এছাড়া খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্যবিধির জ্ঞানসহ শিশুদের খেলাধুলার সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ উদ্ভাবন ও ব্যবহার সম্বন্ধেও তাদের ওয়াকিবহাল হতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এ রকম আয়োজন করা সাপেক্ষে আট বছর মেয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম ছয় মাসের শিক্ষাকে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা যায়।

৮. শিক্ষক ও কর্মকর্তা নির্বাচন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ

৮.১. শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা

বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে মহিলাদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি এবং পুরুষের ক্ষেত্রে একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি। শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে শিক্ষকদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া বর্তমানে তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণীতে বিষয়ভিত্তিক যেসব ধারণার অবতারণা করা হয়েছে সেগুলো দুর্বল শিক্ষকের পক্ষে পড়ানো সম্ভব নয়। তবে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত। অনেকে মনে করেন নিম্ন-প্রাথমিকের জন্য (প্রথম-পঞ্চম শ্রেণী) এইচএসসি পাশ মহিলা নিয়োগ করা যেতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে পারে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি. পাশ। প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পর্যায়ক্রমে আট বছর করা হলে শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা উচিত নিম্ন-প্রাথমিকের জন্য একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি পাশ মহিলা এবং উচ্চ-প্রাথমিকের জন্য একটি দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণীসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা বা পুরুষ। প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক ; তিন বছরের মধ্যে সিইনএড বা বি এড (প্রাইমারি) অর্জন করতে হবে।

৮.২. শিক্ষক নির্বাচন

বর্তমানে নির্বাহী আদেশে প্রাথমিক শিক্ষার মহাপরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচন করা হয়। অধিদপ্তরের কাজের চাপ হ্রাস এবং নির্বাচন পদ্ধতিকে আরও যথার্থ করার লক্ষ্যে অনেকে মনে করেন শিক্ষাপেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গঠিত শিক্ষক নির্বাচনী কমিটিকে এ দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। আবার কারও কারও মতে নির্বাচনী পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষাগত যোগ্যতার (এসএসসি, এইচএসসি ও স্নাতকে প্রাপ্ত নম্বর) ভিত্তিতে নির্বাচন করা যেতে পারে। মেধাভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ নির্বাচনের স্বার্থে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পর্যায়ের সকল স্তরের শিক্ষক নির্বাচনের জন্য সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি অভিন্ন নিয়োগবিধি প্রবর্তন করতে হবে।

৯. শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের পদোন্নতি

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষক ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সুযোগ খুবই সীমিত। তাঁদের একই পদে বছরের পর বছর থাকতে হয়। ফলে তাঁরা কর্মোদ্যম হারিয়ে ফেলেন এবং হতাশায় ভোগেন। সঠিকভাবে যোগ্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে পদোন্নতি ও উচ্চপদ লাভের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়া তাঁদের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণের সুযোগ এবং প্রশিক্ষণের সঙ্গে পদোন্নতির যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক। উচ্চতর ডিগ্রিধারী যোগ্যতাসম্পন্নদের সরাসরি নিয়োগ এবং পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর পদপূরণ—আনুপাতিক হারে এই দুই প্রথাই চালু করা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের সহায়ক হবে। সেই সঙ্গে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দিয়ে এবং কর্তব্যনিষ্ঠ ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের সফলতার ভিত্তিতে ধাপে ধাপে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন উচ্চপদে পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

৯.১. শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের এক বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রচলিত একবছর মেয়াদি সিইনএড প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ফলপ্রসূ নয় বলে অনেকে মনে করেন। এই কোর্স তাত্ত্বিক বিষয়ে ভারাক্রান্ত এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বাস্তব শিক্ষকতার সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসূচি অনুযায়ী যেসব মড্যুল সরবরাহ করা হয় তার বাইরে আর তেমন কোন পঠন সামগ্রী নেই। এতে তাঁদের স্বাধীন চিন্তা ও সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ অতি সামান্য। এই কার্যক্রম বাস্তবমুখী করা প্রয়োজন যাতে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা শ্রেণী–শিক্ষণ ও স্কুল পরিচালনার কাজে ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে বলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মানও যথাযথভাবে উন্নত করার প্রয়োজন হবে। এ অবস্থায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৯.১.১. এইচএসসি পাশ শিক্ষকদের জন্য এক বছর মেয়াদি সিইনএড প্রশিক্ষণ কোর্স এবং স্নাতক ডিগ্রিধারীদের জন্য এক বছর মেয়াদি বি.এড (প্রাইমারি) কোর্স চালু করতে হবে এবং এ সকল কোর্সে শিক্ষাদানের প্রায়োগিক বিষয়ে বেশি জোর দিতে হবে। কিছু সংখ্যক পিটিআইকে ডিগ্রি কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

৯.১.২ পর্যায়ক্রমে মান উন্নয়ন করে দু বছরের প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। বিএড প্রাইমারি কোর্স চালু করার জন্য কিছু সংখ্যক পিটিআইকে ডিগ্রি স্তরে উন্নীত করতে হবে।

৯.১.৩. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য মড্যুলের পরিবর্তে বিষয়ভিত্তিক যথাযোগ্য মানের পাঠ্যবই প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.১.৪. প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও গ্রন্থাগারে উপযুক্ত বইপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.১.৫. বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ ভাতা দিতে হবে।

৯.১.৬. শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য দেশে ও বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৯.২. শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য শুধু চাকরিপূর্ব এককালীন প্রশিক্ষণই যথেষ্ট নয়, তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতা ক্রমাগত সঞ্জীবিত রাখার জন্য চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ১৯৮৩ সাল থেকে দেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত বিদ্যালয়ভিত্তিক ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু হয়। এই পদ্ধতির কিছু অসুবিধার জন্য পরবর্তীকালে এর পরিবর্তে সাব–ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। চার–পাঁচটি কাছাকাছি বিদ্যালয়ের সমন্বয়ে একটি সাব–ক্লাস্টার গঠিত হয়। এই ব্যবস্থায় প্রতি দুমাসে একদিন করে শিক্ষক তাঁর এলাকার এটিইও–র কাছে বছরে মোট ছয় দিনের প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। এই প্রশিক্ষণ শক্তিশালী করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে—

ক. বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়মিত কর্মকালীন প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ও অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন এটিইও নিয়োগ এবং তাঁদের জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

খ. এটিইওদের জন্য যানবাহন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত, খাবার ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সঙ্গে পিটিআই শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট করা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নিয়মিত পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. অঞ্চলভিত্তিক প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকের সংখ্যা নিরূপণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.৩. প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা

প্রশিক্ষণ, গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রকাশনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়তা করার জন্য ১৯৭৮ সালে ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ) প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গবেষণা, উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও প্রকাশনার জন্য এখানে যে ধরনের অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবল থাকা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি (এই প্রতিষ্ঠানে শুধু পরিচালক ছাড়া সহকারী অধ্যাপকের ঊর্ধ্ব মর্যাদার কোন পদ নেই) ; ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ও বিকাশে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। নেপকে অভীষ্ট মানের শীর্ষ পর্যায়ের জাতীয় চিন্তার আধার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে :

ক. জাতীয় পর্যায়ে শীর্ষ প্রতিষ্ঠানরূপে নেপকে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষমতাসহ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মর্যাদা দিতে হবে।

খ. এখানকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের সঙ্গে শিক্ষণসম্পর্কিত প্রশিক্ষণ যোগ করতে হবে।

গ. পদোন্নতির সুযোগসহ নেপ–এর নিজস্ব জনবল সৃষ্টি, তাঁদের জন্য দেশেবিদেশে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ এবং সম্ভব হলে অন্যান্য দেশের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ. নেপ–এর গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালী করা ; শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে যুক্ত করা ; গবেষণার জন্য গ্রন্থাগারে যথেষ্ট সংখ্যক বইপত্র ও সাময়িকী রাখার ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, সম্মেলন প্রভৃতির আয়োজন করতে হবে।

ঙ. নেপ–এর প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

১০. প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা

১০.১. **বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি :** প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে সমাজ জীবনের নানা স্তরের জনগণের সমর্থন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। বর্তমানে স্কুল পরিচালনা ও স্থানীয়ভাবে শিক্ষা সমস্যা সমাধানের জন্য তিনটি কমিটি : বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক–অভিভাবক সমিতি ও ওয়ার্ড কমিটি আছে। এসব কমিটির অধিকাংশই নিষ্ক্রিয়। এতগুলো কমিটির পরিবর্তে শুধু ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় করা প্রয়োজন। বর্তমানে ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব থাকলেও প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অভাবে কমিটি দায়িত্ব পালনে সক্ষম হচ্ছে না। তাই বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান হবেন বিদ্যালয় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্বাচিত বা মনোনীত প্রতিনিধি। সমাজের সঙ্গে স্কুলের আন্তঃসম্পর্ক সুদৃঢ় করার মাধ্যমে শিক্ষক ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য তা খুবই প্রয়োজন। এছাড়া গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে

সম্পৃক্ত করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য সেই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলাদলির কেন্দ্রে পরিণত হয়ে মূল শিক্ষাদান কার্যক্রম ব্যাহত না করে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।

১০.২ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুল সরাসরি সরকার পরিচালিত, বেশ কিছু স্কুল ও মাদ্রাসা বেসরকারি, কিন্তু সরকার থেকে অনুদানপ্রাপ্ত ; কিছু কিছু স্কুল এনজিও পরিচালিত। সাংবিধানিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং সব ধরনের প্রাথমিক শিক্ষার মূল দায়িত্ব সরকারকর্তৃক গ্রহণ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক স্তরের সব ধরনের শিক্ষক ও কর্মচারীর চাকরি জাতীয়করণ করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার ও ম্যানেজিং কমিটির ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা সরকারি অনুমোদন ও অনুদান পাওয়ার জন্য আবশ্যক হবে।

১০.৩. শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী সংখ্যা যেভাবে বেড়েছে সে অনুযায়ী পরিবীক্ষণ কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার ফলে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে উঠেছে। বর্তমানে তত্ত্বাবধান কাজ মূলত প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে সীমাবদ্ধ, শিক্ষাদানের তত্ত্বাবধানে সামান্যই গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত প্রশাসন এবং তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়মিত দায়িত্বের অতিরিক্ত অন্যান্য বহু ধরনের সরকারি কাজে ব্যবহারের প্রবণতা তাঁদের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এজন্য তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের কাজ যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে স্থানীয় সরকারকে সংশ্লিষ্ট করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। এছাড়া বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মূলত প্রধান শিক্ষকের ওপর দিয়ে প্রধান শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১০.৪. বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমাজের সম্পৃক্ততা

বর্তমানে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে বিদ্যালয় ভবন মেরামত, নতুন ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে স্থানীয় সমাজ বা ম্যানেজিং কমিটির কোন ভূমিকা নেই। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজের মান সন্তোষজনক নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন ভবন নির্মাণের দুচার বছরের মধ্যেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তাই অনেকে মনে করেন ফেসিলিটিজ বা এলজিআরডি–এর প্লান অনুসারে তাঁদের তত্ত্বাবধানে স্কুল কমিটির ওপর এসব কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। অথবা ফেসিলিটিজ বা এলজিআরডির প্লান অনুসারে ম্যানেজিং কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ঠিকাদার দ্বারা কাজ করানো যেতে পারে।

১০.৫. শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি

বর্তমানে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি নির্বাচিত বেশ কিছু থানায় চালু আছে। এর ফলে ভর্তিহার বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই কর্মসূচি সারাদেশে চালু করা সম্ভব না হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া এই কর্মসূচি পরিচালনা করতে গিয়ে প্রচুর প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের শিক্ষাদান কাজ ব্যাহত হচ্ছে। যদি দেশের সব বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিশুদের খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনা না যায় তবে খাদ্যের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসামগ্রী দেওয়া দরকার। তাছাড়া উন্নত পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ ও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি করে স্কুলকে আকর্ষণীয় করার মাধ্যমে শিশুভর্তির হার বৃদ্ধি করা সম্ভব। সেজন্য এই কর্মসূচি বন্ধ করে শিক্ষা–সামগ্রী সরবরাহের ও টিফিন প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা, উন্নত পাঠদান পদ্ধতি ও অন্যান্য উপায়ে স্কুলকে আকর্ষণীয় করা এবং পৃথক কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলোকে স্বাবলম্বী করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করার জন্য নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুদের বিশেষত মেয়েদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১১. প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তার

সারাদেশে সব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষালাভের অধিকার যাতে সুনিশ্চিত হয় সেজন্য থানা পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে চাহিদা ও সম্ভাব্যতা যাচাই করে বাংলাদেশের বিদ্যালয়হীন প্রতিটি গ্রামে জনসংখ্যার ভিত্তিতে এক বা একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বেসরকারি বিদ্যালয় স্থাপন উৎসাহিত করা হবে। সরকারি–বেসরকারি নির্বিশেষে সব বিদ্যালয়ে যেন সমমানের শিক্ষাদান করা হয় তা নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ, উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক, গ্রন্থাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বালক–বালিকাদের পৃথক শৌচাগার, শিক্ষা–উপকরণ ও ক্রীড়াসামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে।

১১.১. প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সম্পদ বিনিয়োগ

বাংলাদেশে শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ জাতীয় সম্পদ ব্যয় হয় তার পরিমাণ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে খুবই কম। সাম্প্রতিককালে শিক্ষার জন্য জাতীয় বিনিয়োগ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এখনও শিক্ষার জন্য রাজস্বখাতে সরকারি ব্যয় মোট দেশজ আয়ের মাত্র ২.২ শতাংশ; তার মধ্যে মোটামুটি অর্ধেক অর্থাৎ ১.১ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। অথচ ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য মোট দেশজ আয়ের অন্তত ৫ শতাংশ ব্যয় করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশে অর্থনীতিবিদদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের উচ্চ হারে আর্থসামাজিক প্রতিদান পাওয়া যায়। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত; সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি বা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সফলতা অর্জন আদৌ সম্ভব নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সব শিশুর জন্য মানসম্মত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ প্রতি বছর অন্তত ০.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করে আগামী দুতিন বছরের মধ্যে মোট দেশজ আয়ের অন্তত তিন শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন এবং সমগ্র শিক্ষার জন্য অন্তত মোট ৫% উন্নীত করা উচিত।

১১.২. প্রাথমিক শিক্ষা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব

দেশের সকল শিশুর জন্য যথোপযুক্ত মানের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু এই দায়িত্ব এমন বিশাল যে দেশের সকল নাগরিক এবং সকল সরকারি–বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা ব্যতীত রাষ্ট্রের পক্ষে এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা দুঃসাধ্য। আমাদের শিশুরাই এ দেশের ভবিষ্যৎ। এরাই বাংলাদেশকে একুশ শতকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে। এই শিশুদের আজ আমরা যেভাবে গড়ে তুলছি তার ওপরই নির্ভর করবে একুশ শতকে বাংলাদেশ কোন পথে কিভাবে এগোতে পারবে। জাপান আজ থেকে সোয়া শ বছর আগে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করেছিল। ইংল্যান্ড সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করে আজ থেকে এক শ বছর আগে। অনেক দেরিতে শুরু করে আজ আমরা তাদের সমকক্ষ হবার চেষ্টা করছি। কাজেই আমাদের আর অপেক্ষা করার সময় নেই। সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সমগ্র জাতিকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম কাঠামো

শ্রেণী	বিষয়	মোট নম্বর	সপ্তাহে পিরিয়ড সংখ্যা (দুই পালার বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে)	মন্তব্য
১ম ও ২য় শ্রেণী (দৈনিক সময় ২ ঘন্টা ৩০ মি.)	১. বাংলা (ক) ছড়া (৫০ মি.) ও আঁকা (৪০ মি.) : সপ্তাহে ২ দিন (খ) শোনা-বলা (১৫ মি.), পড়া (৪৫ মি.) ও লেখা (৩০ মি.) : সপ্তাহে ৪ দিন ২. গণিত (দলীয় ও একক অনুশীলন)	১০০ ১০০ = ২০০	৬ (৯০ মিনিটের পিরিয়ড) ৬ (৬০ মিনিটের পিরিয়ড)	ললিতকলা, সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা বাংলা, গণিত বিষয়ের শিখন কৌশলের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। সে অনুসারে বিভিন্ন কৌশল যথা অভিনয়, অঙ্গভঙ্গি, তাল ও ছন্দ, ছবি আঁকা ইত্যাদি শিখন-শেখানো কার্যাবলি পাঠ-পরিকল্পনায় থাকবে যাতে শিশুদের কাছে শিক্ষা আনন্দদায়ক হয়।
অতিরিক্ত সময় ৩০ মি.	অতিরিক্ত বিষয় আরবি ও ধর্ম/ইংরেজি	১০০	৬ (৩০ মিনিটের পিরিয়ড)	মাদ্রাসার ক্ষেত্রে আরবি ও ধর্ম; কেজি স্কুলের ক্ষেত্রে ইংরেজি (অন্তর্বর্তীকালে)
৩য়-৫ম শ্রেণী (দৈনিক সময় ৪ ঘন্টা ১০ মি.) অতিরিক্ত : বিরতি ৩০ মি.	১. বাংলা ২. গণিত ৩. ইংরেজি ৪. পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান ও জীবনদক্ষতা) ৫. পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) ৬. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (ধর্মের মূলনীতি ও উন্নত জীবনাচরণের ওপর গুরুত্বসহ)	১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৫০ ৫০ = ৫০০	৭ ৬ ৬ ৬ ৪ ৪	(ক) ঐ (খ) প্রতি পিরিয়ড ৪০ মিনিট (গ) বাংলা বিষয়ে একদিন সহায়ক পুস্তিকা পঠনের জন্য; সেজন্য আলাদা পুস্তিকা থাকবে।
অতিরিক্ত সময় ১ ঘন্টা	অতিরিক্ত বিষয় আরবি ও ধর্ম/ইংরেজি	১০০	৬	মাদ্রাসার ক্ষেত্রে আরবি ও ধর্ম; কেজি স্কুলের ক্ষেত্রে ইংরেজি (অন্তর্বর্তীকালে)
৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী (দৈনিক সময় ৬.০ ঘন্টা)	১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. গণিত ৪. সাধারণ বিজ্ঞান ৫. সামাজিক বিজ্ঞান ৬. কর্মমুখী শিক্ষা* (কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদি) ৭. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (ধর্মের মূলনীতি ও উন্নত জীবনাচরণের ওপর গুরুত্বসহ) ৮. 'ক' গুচ্ছ : (১) ললিতকলা (২) স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা 'খ' গুচ্ছ (বিকল্প) আরবি ও ধর্ম	২০০ ২০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৫০ ৫০ = ১০০০ ১০০	৮ ৮ ৫ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ২ ৪	(ক) প্রতি পিরিয়ড ৪০ মিনিট (খ) বাংলা বিষয়ে একদিন এক পিরিয়ড দ্রুত পঠনের জন্য; সেজন্য আলাদা পুস্তক থাকবে। (গ) *বালক ও বালিকা উভয় প্রকার শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবন ও সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই সমন্বিত বিষয় চালু করা হবে। (ঘ) বিকল্প 'খ' গুচ্ছ শুধু মাদ্রাসার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হবে।

অধ্যায়—৪

গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

১. ভূমিকা

বিশ্বের সর্বাধিক নিরক্ষর জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। স্বাধীনতার পর এদেশের মোট জনসংখ্যা যা ছিল, পঁচিশ বছরে এখন শুধু নিরক্ষর জনসংখ্যাই তার কাছাকাছি। বর্তমানে সাত বছরের বেশি বয়সীদের সাক্ষরতার হার শতকরা ৪৪। তবে এ হার মোটেই সুষম নয় ; পুরুষদের চেয়ে নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার অনেক কম ; আবার শহরের চেয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে নিরক্ষরতা বেশি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর এদেশে মোটামুটি চার জনে একজন বয়স্ক মানুষ সাক্ষর ছিল, বর্তমানে এই হার কিছুটা বেড়েছে, প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে দুজন সাক্ষর হয়েছে। গত দু দশকে বয়স্ক নিরক্ষরতার হার কমলেও মোট নিরক্ষরের সংখ্যা অব্যাহতভাবে বেড়েই চলেছে। বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে মোট বয়স্ক নিরক্ষর মানুষের মাত্র দু শতাংশকে প্রতি বছর সাক্ষরতা কার্যক্রমের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে। অন্য দিকে বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী অনেক শিশু ভর্তি হতে পারছে না। আর যদিও বা ভর্তি হচ্ছে তাদের শতকরা ৪০ ভাগ পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ছে। এখন দেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তার অপ্রতুলতা, অনমনীয়তা ও অব্যবস্থাপনার কারণে অনেক মানুষ শিক্ষার আওতায় আসতে পারছে না। তাই নিরক্ষর নারী–পুরুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। নিরক্ষরতার ফলে অদৃষ্টবাদিতা, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা সমগ্র জাতিকে গ্রাস করছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। জনগণের দ্বারে স্বাধীনতার সুফল পৌঁছাচ্ছে না। তাই দেশে বিরাজমান ভয়াবহ নিরক্ষরতা দূর করার জন্য গণশিক্ষা অর্থাৎ একাধারে বয়স্ক শিক্ষা এবং যে সব শিশুকিশোর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে থেকে যাচ্ছে তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন অপরিহার্য।

২. গণশিক্ষার সংজ্ঞা, ধারা ও লক্ষ্য

২.১ গণশিক্ষার সংজ্ঞা ও ধারা

সাধারণ অর্থে গণমানুষের জন্য সাক্ষরতা শিক্ষার যে আয়োজন তাই গণশিক্ষা। নিরক্ষর শিশুকিশোর ও বয়স্ক মানুষের জন্য চাহিদাভিত্তিক, ব্যবহারিক এবং স্বল্প সময়ে অল্প খরচে পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারাই গণশিক্ষা। তাই গণশিক্ষায় একদিকে যেমন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সাক্ষরতা ও সচেতনতা শিক্ষা, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষা। শিক্ষার্থীর বয়স ও শিখন–বিষয়কে ভিত্তি করে গণশিক্ষার দুটি ধারা গড়ে উঠেছে—১. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং ২. বয়স্ক শিক্ষা।

২.২ গণশিক্ষার লক্ষ্য

গণশিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হবে 'সমগ্র মানুষ'। এ শিক্ষার লক্ষ্য হবে কুসংস্কার ও ভাগ্যনির্ভরতা থেকে মুক্ত আত্মপ্রত্যয়ী, সমাজমনস্ক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্দীপ্ত মানুষ গড়ে তোলা। এসব মানুষ পড়া, লেখা ও হিসাব–নিকাশের দক্ষতার পাশাপাশি গণতন্ত্র, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও স্থিতিশীল জীবনমুখী সচেতনতা শিক্ষা অর্জন করবে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব আইনের দ্বারা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ২০০৫ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার

অন্তত ৯০ শতাংশে উন্নীত করা। এ ছাড়া নতুন সাক্ষর জনমানুষকে মূলধারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করাও গণশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

৩. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা

৩.১ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি

আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশ নিতে পারছে না বা ভর্তি হয়েও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে এমন সব বঞ্চিত শিশুকিশোরের জীবনমান উন্নয়নের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হবে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা মূলত মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষার বিকল্প নয়, একটি পরিপূরক ব্যবস্থা। নানারকম অসুবিধার কারণে পিছিয়ে পড়া শিশুকিশোরদের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত অপেক্ষাকৃত নমনীয় ধাঁচের প্রাথমিক শিক্ষাই উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা। এই ধারার মাধ্যমে শিশুকিশোররা মৌলিক শিক্ষা লাভ করবে। তারা বাংলা ভাষায় স্বাধীনভাবে কোন কিছু পড়তে বুঝতে পারবে এবং অন্যকে বোঝাতে পারবে, লেখার মাধ্যমে নিজের প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে এবং হিসাব-নিকাশেও দক্ষ হয়ে উঠবে। কৃষি, শিল্প, যানবাহন, ব্যবসাসহ সকল কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য জ্ঞান আহরণের প্রাথমিক ধাপে পৌঁছতে পারবে। এইসব শিশুকিশোর তাদের লব্ধ শিক্ষা ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাতে সমর্থ হবে। শিশুকিশোরদের মধ্যে দেশপ্রেম, সহিষ্ণুতা, সংস্কৃতি, গণতন্ত্র, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য চেতনার বিকাশ ঘটবে, তারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারী শিশুকিশোররা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৩.২ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় সেইসব শিশুকিশোরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যারা সরকারি বা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে নি কিংবা লেখাপড়া শেখার আগেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। কাজেই উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার বয়স আট বছরের নিচে হওয়া উচিত নয় এবং ভর্তির বয়সসীমা ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা হবে তিন বছর মেয়াদি ও কেন্দ্রভিত্তিক। প্রতিটি কেন্দ্রে সর্বাধিক ৩৫ জন শিক্ষার্থী থাকবে। একজন শিক্ষকই তিন বছর কেন্দ্রটি পরিচালনা করবেন। শিক্ষাকেন্দ্রে গড়পড়তা দৈনিক তিন ঘণ্টা শিখন শেখান চলবে। এই কাঠামোতে শিক্ষাদানের জন্য বছরে ৮০০ সংযোগ ঘণ্টা বরাদ্দ হবে। তিন বছরের কোর্স শেষে শিক্ষার্থীর অধিক বয়স, শিক্ষকদের জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত সংযোগ ঘণ্টা, শিক্ষার্থী-শিক্ষকের যথাযথ অনুপাত এবং নিবিড় অনুসারক কর্মতৎপরতায় সমন্বয় ঘটিয়ে তিন বছরে প্রাথমিক শিক্ষার সমমান অর্জন করা সম্ভবপর হবে।

৩.৩ উপকরণ ও প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণ প্রণীত হবে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণে জাতীয় চাহিদার প্রতিফলন থাকবে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় এমন উপকরণ দ্বারাই উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হবে। গণশিক্ষার শিক্ষাক্রমবিষয়ক একটি জাতীয় কমিটি বিভিন্ন উপকরণ পর্যালোচনা করে মানসম্মত উপকরণাদির অনুমোদন দেবে। এই প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত জাতীয় গণশিক্ষা একাডেমীর পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের নিয়েই গণশিক্ষার শিক্ষাক্রম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠিত হবে। অনুমোদিত যে কোন উপকরণ দ্বারা যাতে বাস্তবায়নকারী সংস্থা উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করতে পারে সেই সুযোগ থাকতে হবে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করা হবে। এজন্য তিন বছরের মধ্যে শিক্ষকদের মোট ৪০ দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। ভিত্তি প্রশিক্ষণটিতে তাত্ত্বিক বিষয়াদির সঙ্গে হাতেকলমে অনুশীলনের সুযোগ থাকতে হবে। তাই ভিত্তি প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল কমপক্ষে ২০ দিনের হবে। পরবর্তীকালে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ এবং নতুন বিষয়ের ওপর চার দফায় ২০দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে নিজেদের সমর্থ করে তুলবে।

৪. বয়স্ক শিক্ষা

৪.১ বয়স্ক শিক্ষার পরিধি

বয়স্ক শিক্ষার আওতায় প্রধান তিনটি ধারা থাকবে। এই ধারাগুলো হল—১. সাক্ষরতা শিক্ষা, ২. সচেতনতা শিক্ষা, ও ৩. পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের শিক্ষা। সাধারণভাবে যে পড়ালেখা মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগে তাই সাক্ষরতা শিক্ষা। কিন্তু সাক্ষরতা শিক্ষার প্রকৃত অর্থ আরও ব্যাপক। সাক্ষরতা শিক্ষার দ্বারা একজন শিক্ষার্থী বাংলা ভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারবে, মৌখিক ও লিখিতভাবে তা প্রকাশ করতে পারবে, সমাজ–পরিবেশ বিশ্লেষণ করতে পারবে ; দৃশ্যমান সামগ্রী যেমন আলোকচিত্র, পোস্টার, ছবি, চার্ট ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং সেই সঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন হিসাব–নিকাশ করতে ও তা লিখে রাখতে পারবে। এই কোর্স শেষে শিক্ষার্থীরা ভাষা ও হিসাব–নিকাশের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তৃতীয় শ্রেণীর সমমানের যোগ্যতা অর্জন করবে। সচেতনতা শিক্ষার আওতায় দেশপ্রেম, শান্তি ও মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও সুশাসন, পরিবেশ–ব্যবস্থাপনা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক শিক্ষাসহ অন্যান্য কোর্স অন্তর্ভুক্ত হবে। সচেতনতা শিক্ষা মানুষকে সমাজমনস্ক ও রাজনীতি–সচেতন করে গড়ে তুলবে। পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের শিক্ষার আওতায় নানাবিধ বৃত্তিমূলক শিক্ষা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন শিক্ষা, জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা এবং স্থিতিশীল জীবন নির্বাহ শিক্ষাসহ সময়ের চাহিদাপূরণের জন্য আরও শিক্ষা কোর্স অন্তর্ভুক্ত হবে। এই শিক্ষা মানুষকে নিজ নিজ পেশা উন্নয়নে এবং বিজ্ঞানমনস্ক হতে সহায়তা করবে।

৪.২ বয়স্ক শিক্ষার কাঠামো

উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত নারী–পুরুষের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমাদের দেশে বয়স্ক নারী–পুরুষের বেশির ভাগই নিরক্ষর। তাদের সকলের জন্য বয়স্ক সাক্ষরতা কোর্স পরিচালনা খুবই জরুরি। তবে নিরক্ষরদের মধ্যে যাদের বয়স ১৫ থেকে ৩৫ বছর তারা অগ্রাধিকার পাবে। এই বয়ঃক্রমের জন্য বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে তা জাতীয় ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনবে। বয়স্ক সাক্ষরতা সমাপনকারীরা নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হবে। বইপত্র পড়ার মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং নিজেদের ছেলেমেয়েকে শিক্ষাদানে উদ্যোগী হবে। বয়স্ক সাক্ষরতা কোর্স ন্যূনতম ছয়মাসব্যাপী পরিচালিত হওয়া উচিত। দৈনিক দুঘণ্টা হিসেবে শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে পাঁচ/ছয় দিন শিক্ষাদলে উপস্থিত থাকবেন। বয়স্ক সাক্ষরতা সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা যেন অব্যাহত শিক্ষা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন সে ব্যবস্থা বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে। বয়স্ক সাক্ষরতা কোর্স ভিন্ন অন্যান্য কোর্সের সময়সীমা, বিষয়বস্তু, পঠন–পাঠনের পদ্ধতি, শিক্ষকের যোগ্যতা ও শিখন–প্রক্রিয়া, স্থানীয় জনমানুষের চাহিদা, সম্পদের প্রাপ্যতা ও পেশাগোষ্ঠীর প্রকৃতি–অনুসারে নির্ধারিত হবে। জাতীয় গণশিক্ষার শিক্ষাক্রম–বিষয়ক কমিটি প্রয়োজনে শিক্ষার অন্যান্য ধারার যেমন — বৃত্তিমূলক ও কারিগরি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি, বন ও পরিবেশ, মৎস্য ও পশুপালন ইত্যাদির সঙ্গে সমন্বয় রেখে উপযুক্ত বিষয়াদির শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করবে।

৪.৩ প্রশিক্ষণ ও উপকরণ

ন্যূনতম অষ্টম/নবম শ্রেণী বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন নারী–পুরুষ শিক্ষাদল পরিচালনায় নিয়োজিত হবেন। শিক্ষাদল পরিচালনাকারীদের মোট প্রশিক্ষণ সময় হবে ২৫ দিন। ১৫ দিনের ভিত্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁরা শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা শুরু করবেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা দুদফায় ১০ দিনের প্রশিক্ষণ নেবেন। বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ প্রশিক্ষণ প্রদানে নিজেদের সমর্থ করে গড়ে তুলবে। দেশে বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনার জন্য অনেক রকম উপকরণ আছে। এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু উপকরণ দিয়ে মানসম্মত বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনা সম্ভব। জাতীয় গণশিক্ষার শিক্ষাক্রম বিষয়ক কমিটি বয়স্ক শিক্ষার উপকরণও পর্যালোচনা করবে। ঐ কমিটির অনুমোদিত যে–কোন উপকরণ দ্বারা বয়স্ক সাক্ষরতা কোর্স পরিচালনা করা যাবে।

৫. অব্যাহত শিক্ষা

৫.১ অব্যাহত শিক্ষার জন্য লোককেন্দ্র

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে মৌলিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশু–কিশোরদের অনেকেই পরবর্তী স্তরের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তির সুযোগ পায় না। আবার বয়স্ক শিক্ষা সমাপনকারী নারী–পুরুষদের জন্য নিয়মিত শিক্ষাচর্চার সুযোগও নেই। অথচ অর্জিত দক্ষতাকে অটুট রাখা কিংবা বৃদ্ধির জন্য অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। এজন্য অব্যাহত শিক্ষাকেন্দ্র চালু করতে হবে। বর্তমানে সরকার পরিচালিত ৬৯০টি গ্রাম শিক্ষা–মিলনকেন্দ্রের পাশাপাশি এনজিওরও রয়েছে অনেক গ্রামীণ পাঠকেন্দ্র। এগুলো মূলত পাঠ–অনুশীলন–চক্র। গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি গ্রামে ২০০০ সালের মধ্যে অন্তত একটি করে পাঠ–অনুশীলন–চক্র/গ্রামশিক্ষা–মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এসব পাঠচক্রের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে জনমানুষের পাঠের অভ্যাস গড়ে উঠবে। এ ছাড়া ২০০৫ সালের মধ্যে প্রতি ওয়ার্ডে অন্তত একটি পাঠ–অনুশীলন–চক্র/গ্রামশিক্ষা–মিলনকেন্দ্রকে লোককেন্দ্রে উন্নীত করতে হবে। লোককেন্দ্র মূলত মানুষের জীবনভর শিখনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এটি স্থানীয়ভাবে নানা ধারার পড়ালেখার একটি পরিসম্পদ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হবে এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও আধুনিক যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠবে। পাঠ–অনুশীলন–চক্রসমূহ অব্যাহতভাবে লোককেন্দ্র থেকে কারিগরি ও পরিসম্পদগত সহায়তা পাবে। গ্রামের মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পাঠ–অনুশীলন–চক্র পরিচালনা করবে। আর লোককেন্দ্র ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ওয়ার্ড ভিত্তিতে নির্মিতব্য স্থানীয় সরকারের কার্যালয়ের সঙ্গে লোককেন্দ্রের সুনির্দিষ্ট কার্যালয় থাকবে। লোককেন্দ্র বা পাঠ–অনুশীলন–চক্র না থাকলে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যাবে। লোককেন্দ্রে যে কেবল নব্যসাক্ষররাই যাবেন তা নয়, সীমিত লেখাপড়া জানা নারী–পুরুষ সেখানে শিক্ষার সুযোগ পাবেন। এমন কি এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশু ও বয়স্ক নিরক্ষর মানুষেরাও উপকৃত হবেন। লোককেন্দ্রে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীসহ স্থানীয় তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিয়মিত শিল্প, সংস্কৃতি এবং উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করবেন। স্থানীয় চাহিদা অনুসারে লোককেন্দ্রসমূহে নানা ধরনের কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তবে নিচের কর্মসূচিসমূহ থাকা অত্যন্ত জরুরি : ১. অধি–পরামর্শ (advocacy) ও প্রচারণা, ২. আর্থসামাজিক, ৩. পাঠাগার স্থাপন, ৪. বৃত্তিমূলক ও সমতাস্থাপক, ৫. সংস্কৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ ও ৬. জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি।

৫.২ লোককেন্দ্রের পরিচালনা

লোককেন্দ্রের কর্মসূচিসমূহ একটি ব্যবস্থাপনা পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। পরিষদের সদস্যদের ন্যূনতম যোগ্যতা হল তাঁদের কমপক্ষে সাক্ষরতা শিক্ষা সমাপনকারী হতে হবে। লোককেন্দ্রের সদস্যদের মধ্য থেকে লোকজ্ঞানসম্পন্ন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি লোককেন্দ্র পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হবেন। আর একজন আদর্শ স্থানীয় শিক্ষক যিনি স্থানীয় জনমানুষের শিক্ষার উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তিনি লোককেন্দ্রের অবৈতনিক সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বাংলাদেশ গণশিক্ষা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ চাহিদা অনুযায়ী অনুসারক ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন, মুদ্রণ ও সরবরাহ করবে। তবে এসব প্রতিষ্ঠানকে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পঠন ও দৃশ্যমান উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয়ভাবে সাক্ষর পরিবেশ সৃষ্টি ও অদূর ভবিষ্যতে একটি সাক্ষর সমাজ নির্মিতির পথে অনুসারক ও অব্যাহত শিক্ষার উপকরণ অনন্য অবদান রাখবে।

৬. গণশিক্ষার পরিচালনা প্রক্রিয়া

৬.১ **সমন্বিত সাক্ষরতা অভিযান/সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন :** বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, স্থানীয় সরকার, জনসংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্যদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসরে নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। সমন্বিত সাক্ষরতা অভিযানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজ বিভিন্ন পদ্ধতি, উপকরণ, প্রক্রিয়া ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সমন্বয় ঘটিয়ে কম সময়ে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে পারে।

৬.২ **বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা/স্থানীয় সরকার :** স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেসরকারি সংস্থাসমূহ এককভাবে কেন্দ্র/স্কুলের মাধ্যমে নিরক্ষরতা হ্রাসের কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। দেশে এ যাবৎ প্রায় ৪১৫টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা নানাভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অবদান রেখে চলেছে। কেন্দ্রভিত্তিক সাক্ষরতা কর্মসূচি সম্প্রসারণে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের উদ্যোগ অব্যাহত থাকতে হবে। এছাড়াও স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কেন্দ্রভিত্তিক সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালিত হতে পারে। স্থানীয় সরকারের মূল দায়িত্ব হবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা, সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা এবং শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা।

৬.৩ **বেতার/টেলিভিশন/সংবাদপত্র**

বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনা করা যেতে পারে। বিশেষ করে বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র জনগণকে সাক্ষরতামনস্ক হতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারে। এছাড়া সংবাদপত্রের অর্ধ পৃষ্ঠা নতুন সাক্ষরদের উপযোগী করে তৈরি করে নিয়মিতভাবে সপ্তাহে একদিন প্রচার করলে তা নতুন লেখাপড়া জানা মানুষদের কাজে লাগবে।

৬.৪ **অব্যাহত শিক্ষার আন্দোলন**

দেশময় অব্যাহতভাবে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান চর্চার জন্য সমন্বিত কর্মসূচি চালু থাকবে। প্রধানত স্থানীয় জনমানুষের উদ্যোগে ও অংশগ্রহণে সারা বছর এই কর্মসূচি জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত পরিচালিত হবে। বাংলা নববর্ষের শুরুতে জাতীয়ভাবে প্রতি বছর একটি শিরোনাম নির্বাচন করা হবে। এই শিরোনামটিকে কেন্দ্র করে নানা রকমের কর্মসূচি যেমন মেলা, আলোচনা, বিতর্ক, সেমিনার, র‍্যালি, পোস্টার বা উপকরণ প্রতিযোগিতা, ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী ইত্যাদি নেওয়া হবে। কর্মসূচিগুলো লোককেন্দ্র ও পাঠ–অনুশীলন–চক্র/গ্রামশিক্ষা–মিলনকেন্দ্র সমন্বয় করবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অব্যাহত শিক্ষা আন্দোলন ইউনিয়ন পরিষদ, সামাজিক সংস্থা ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হবে। অব্যাহত শিক্ষার আন্দোলন সফলভাবে গড়ে তুলতে পারলে জীবনভর শিখনের পরিবেশ গড়ে উঠবে এবং সাক্ষর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। সাক্ষর সমাজে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই লেখাপড়ার দায়িত্ব নেবে না, বরং শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এমন সব প্রতিষ্ঠানও শিক্ষা সম্প্রসারণে এগিয়ে আসবে। ফলে সাক্ষর সমাজে সকলেরই জীবনভর শিক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে এবং সকলেই তা ব্যবহার করবে। অব্যাহত শিক্ষা আন্দোলনে স্থানীয় শিক্ষাকর্মীদের পাশাপাশি যোগাযোগ মাধ্যমের সদস্যকর্মী, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সদস্যকর্মী এবং নাগরিক সমাজসহ নানারকমের মানুষ সম্মিলিতভাবে দেশব্যাপী অব্যাহত শিক্ষার আন্দোলন গড়ে তুলবে।

৭. **গণশিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়**

৭.১ গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারের জন্য যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা পূরণ করার জন্য আইনগত কাঠামো প্রবর্তন প্রয়োজন।

৭.২ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিষদ' গঠিত হয়েছে। পরিষদের কর্মপরিধি আরও বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। গণশিক্ষা বিষয়ক অর্থায়ন নীতিমালা প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান এবং গণশিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে সমন্বিত সাক্ষরতা কর্মকাণ্ড পরিচালনায় দিক–নির্দেশনা প্রদান—এই দুটি কর্মতৎপরতা পরিষদের কর্মপরিধিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিষদে প্রতিনিধিত্বের সমতা আনয়ন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য এর সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই পরিষদের সদস্য হিসেবে এনজিওসমূহের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ মূলধারার শিক্ষা প্রদায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রথিতযশা সদস্যকর্মী, গণশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা পরিসরের প্রজ্ঞানুশীল ব্যক্তিবর্গ এবং নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৭.৩ দেশে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন ধারার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালিত হলেও আশির দশক পর্যন্ত কেন্দ্রীয়ভাবে তার পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি

উন্নয়ন সংস্থার সার্থকতা বিশ্বপরিসরে নন্দিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয়ভাবে এ দিকটির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন তারই ইতিবাচক পদক্ষেপ। গণশিক্ষা বিষয়ক নীতি নির্ধারণীতে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এই অধিদপ্তরকে বাংলাদেশ গণশিক্ষা ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে। এই ফাউন্ডেশনটি সোসাইটিজ অ্যাক্ট অথবা ট্রাস্ট আইনে নিবন্ধিত হবে। ফাউন্ডেশনের একটি সাধারণ পরিষদ থাকবে ; তার সদস্যসংখ্যা হবে অনধিক ২১ জন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সম্প্রসারণবিদ এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত হবে। ফাউন্ডেশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। প্রধান পৃষ্ঠপোষকের মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। সাধারণ পরিষদ প্রতি তিন বছরের জন্য সাত সদস্যের একটি পরিচালনা পরিষদ গঠন করবে। ফাউন্ডেশনের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য মহাপরিচালক এবং প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকবেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত বা আত্তীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে পরিগণিত হবেন। ফাউন্ডেশনের দুধরনের কার্যক্রম থাকবে— (ক) প্রশাসনিক ও (খ) অর্থায়ন।

(ক) প্রশাসনিক : ফাউন্ডেশন একটি দক্ষ পেশাজীবীগোষ্ঠী দ্বারা গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বারোপ করবে। এছাড়া ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত সংগঠনসমূহের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাসহ গণশিক্ষার একটি কার্যকর তথ্যভিত্তি গড়ে তুলবে। ফাউন্ডেশন নিজস্ব পরিবীক্ষণকুশলীদের মাধ্যমে এই তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে ; এছাড়া এনজিওসমূহের শিক্ষাবিষয়ক কুশলীরা এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। ফাউন্ডেশন শিক্ষার্থীদের অর্জন পরিমাপের জন্য প্রমিত পরিমাপক প্রণয়ন এবং সেগুলোর সহায়তায় নিয়মিত পরিবীক্ষণ সম্পাদন করবে।

(খ) অর্থায়ন : বাংলাদেশ গণশিক্ষা ফাউন্ডেশন বয়স্ক সাক্ষরতা, উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং এ জন্য জাতীয় বাজেটে গণশিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট খাত সৃষ্টি ও অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করবে, প্রয়োজনে বৈদেশিক সহায়তা গ্রহণ করবে। সামর্থ্যের মাত্রা–অনুযায়ী সরকারি সংস্থা, স্থানীয় সরকার পরিষদ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উপানুষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থায়ন করবে। বাংলাদেশ গণশিক্ষা ফাউন্ডেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যেসব সামাজিক ও বেসরকারি সংস্থাকে অর্থায়ন করবে সেগুলো নিম্নোক্ত নির্ণায়কের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে :

১. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, ক্লাব, সামাজিক–সাংস্কৃতিক সংস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিবন্ধনকৃত হতে হবে ; ২. যে এলাকায় সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালিত হবে বাস্তবায়নকারী সংস্থায় সেই এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ; ৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রস্তাবিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকতে হবে অথবা তা গড়ে তোলার পরিকল্পনা থাকতে হবে ; ৪. প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষণের সর্বশেষ রিপোর্ট থাকতে হবে ; এবং ৫. কোন প্রতিষ্ঠানের শাখাকর্তৃক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কমিটির সুপারিশ থাকতে হবে।

৭.৪. দেশে গণশিক্ষার জন্য পেশাজীবী তৈরির কোন বড় উদ্যোগ এখন পর্যন্ত নেওয়া হয় নি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক ক্ষেত্র হিসেবে গণশিক্ষা একটি নতুন পরিসর। এই পরিসরে প্রশিক্ষিত প্রচুর জনবল প্রয়োজন যারা অব্যাহতভাবে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, কার্যক্রম, উপকরণ ইত্যাদি পরিকল্পনা, পরিচালনা ও প্রণয়নের জন্য গবেষণা করবে। গণশিক্ষা পরিসরে নবতর পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দেশে একটি জাতীয় গণশিক্ষা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একাডেমী একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে। গণশিক্ষায় নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কুশলীদের সমন্বয়ে একাডেমীর পেশাজীবীদল গড়ে উঠবে। তাছাড়া একাডেমীর কর্মতৎপরতা পরিচালনায় পরামর্শ ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের জন্য একটি উপদেশক পরিষদ থাকবে। এক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের টেকনিক্যাল সাপোর্ট সার্ভিস ইউনিটকে ভিত্তি করে প্রস্তাবিত গণশিক্ষা একাডেমী গড়ে তোলা যেতে পারে। এই একাডেমী সুব্যবস্থিতভাবে ক্ষমতা বিনির্মাণসহ গণশিক্ষার শিক্ষাক্রম ও উপকরণ প্রণয়ন, নবায়ন ও পরিমার্জন ; গণশিক্ষার শিক্ষাক্রমের সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষাধারার শিক্ষাকোর্সের সমন্বয়ন ; গণশিক্ষার উপকরণ উন্নয়ন বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন, উপকরণাদি পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং গণশিক্ষার ওপর গবেষণা ও তথ্যোপকরণ সংগ্রহ

ও সন্নিবেশ করবে। এ ছাড়াও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে পেশাজীবিতা উন্নয়নে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থাকে এই প্রতিষ্ঠান কারিগরি সহযোগিতা দেবে।

৮. **গবেষণা**

অল্প সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করে দেশের ৮–৩৫ বছরের প্রায় চার কোটি মানুষকে কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য গণশিক্ষা পরিসর ক্ষেত্রে আরও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে গবেষণাকর্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরও বস্তুনিষ্ঠ গবেষক করার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গণশিক্ষা বিষয়ে ফলিত গবেষণা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

৯. **গণশিক্ষার কর্মসূচির সমন্বয়ন**

গণশিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং জাতীয় গণমাধ্যমের ভূমিকা সমন্বয় করা হবে। চাষাবাদ, পশুপালন, হাঁসমুরগি পালন, মাছচাষ, কৃষি–বিষয়ক বার্তা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার–কল্যাণ ও জনসংখ্যা–বিষয়ক বার্তা, বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ পরিবেশ–বিষয়ক বার্তা এবং তথ্য ও গণসংযোগ–বিষয়ক সকল বার্তা পাঠচর্চা কেন্দ্রের উপযোগী করে প্রকাশ করা হবে। সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান জনপ্রচারের জন্য বই, পত্রপত্রিকা, চার্ট, পোস্টার, প্রচারপত্র প্রকাশের সময়ে গণশিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন–বিষয়ক নীতিমালা মেনে চলবে। টেলিভিশনে দৈনিক ৩০ মিনিট এবং বেতারে দৈনিক এক ঘণ্টা গণশিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকবে। গণশিক্ষা একাডেমীর সহযোগিতায় এসব অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করা হবে। এছাড়া সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান যেমন জাদুঘরসমূহ, বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ইত্যাদি দেশের সংস্কৃতি বিষয়ক পুস্তিকা নিয়মিত প্রকাশ করবে। এসব পুস্তিকা নব্যসাক্ষরদের শিখন যোগ্যতা অনুযায়ী রচিত হবে। দেশের মানুষকে সংস্কৃতিমনস্ক করার জন্য এ ধরনের উপকরণ প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অধ্যায়—৫

মাধ্যমিক শিক্ষা

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের শিক্ষা-কাঠামোর মধ্যে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অংশটি মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন ধারার প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী এবং ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষার পূর্ববর্তী স্তর মাধ্যমিক শিক্ষা নামে চিহ্নিত। শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এই স্তরে শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত তৈরি করবে, এখানকার অর্জিত দক্ষতার মাধ্যমে তাদের জীবন হয়ে উঠবে সাফল্যমণ্ডিত। ফলে তারাও সমাজ ও দেশের জন্য অমূল্য সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর সাধারণ শিক্ষার সর্বশেষ পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এই স্তরের শিক্ষাই বিভিন্ন বিভাগে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ছাড়পত্র বলে বিবেচিত হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানের ওপর উচ্চশিক্ষার সুযোগ নির্ভরশীল। এই স্তরের শিক্ষাশেষে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বাছাই করার পর উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধারায় তাদের প্রবেশের সুযোগ ঘটবে। আর যারা শিক্ষাক্ষেত্রে ওপরের দিকে যেতে চাইবে না বা উপযুক্ত বিবেচিত হবে না তারা এই স্তরে লব্ধ বৃত্তিমূলক বিষয়ে দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে উপযোগী জীবিকা অবলম্বন করতে পারবে। এ স্তরের মেধা ও প্রবণতা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীরা উপযোগী ধারায় স্থানান্তরিত হতে পারবে। কাজেই এ স্তরের শিক্ষায় যেমন একদিকে থাকবে জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন ধারার সমাহার আর অন্যদিকে থাকবে জীবন ও জীবিকা নির্ভর হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীর দক্ষতার উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জ্ঞান লাভ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জনের জন্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে :

* শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা ;
* কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা ;
* উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা ;
* শিক্ষার্থীর প্রাথমিক স্তরের প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা ;
* শিক্ষার্থীকে মৌলিক বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানদান।

৩. বর্তমান অবস্থা

বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তিনটি অংশে বিভক্ত : নিম্নমাধ্যমিক তিন বছর, মাধ্যমিক দু বছর এবং উচ্চ মাধ্যমিক দু বছর। দেশে বর্তমানে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

সংখ্যা ২৩৪৯টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৬৬৩টি এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের সংখ্যা ৬০৩টি। সর্বমোট সংখ্যা ১২৬১৫। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল ও আলিম স্তর মাধ্যমিক শিক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত।

এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে আসছে। তবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের মাসিক প্রারম্ভিক বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ এবং আনুষঙ্গিক কিছু আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়। সরকার এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পও গ্রহণ করে। এছাড়া পৌরসভার বাইরে গ্রামীণ মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের উপবৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার যে অনুদান দিয়ে থাকে তা পর্যাপ্ত নয় এবং আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নানাভাবে বিঘ্নিত হয়। যোগ্যতাসম্পন্ন ও উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের অপ্রতুলতা, প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোর যথেষ্ট অভাব, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব ইত্যাদি কারণে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান–উন্নয়ন ঘটছে না। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈষম্য আছে, বৈষম্য আছে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। তাছাড়া ক্যাডেট কলেজ, রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল, ল্যাবরেটরি স্কুল, শাহীন স্কুল, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান অনেকাংশে বৈষম্যের কারণ হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণবিহীন বলে সর্বত্র সমমানের শিক্ষাদান সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে পার্থক্য থাকায় বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষার মানের ব্যাপারেও অসংগতি বিরাজ করছে। স্বাধীন দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে হলে এসব সমস্যার যথাযোগ্য সমাধান বের করা প্রয়োজন।

৪. মাধ্যমিক শিক্ষার ধারা

৪.১ দেশের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, জীবনধারা, স্থানীয় অর্থনীতির কর্মধারা ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সুষ্ঠু প্রতিফলন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যসূচিতে থাকা বাঞ্ছনীয়। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে অর্থাৎ বয়সসীমা ১৪ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী নানা কারণে স্কুলের পাঠ ত্যাগ করে এবং সমাজজীবনে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। অথচ জীবিকার্জনে সহায়ক তেমন কোন প্রশিক্ষণ তারা পায় না। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য তারা দুর্বহ বোঝা স্বরূপ। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক শিক্ষা এবং স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে বিবেচিত। তাই নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রমের যোগসূত্র বজায় রাখা এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় সমতা নিশ্চিত করার জন্য একই শিক্ষায়তনে এই চারটি শ্রেণীর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি এ তিনটি ধারায় বিভক্ত। এ তিনটি ধারার বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বৈষম্যহীন স্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই স্তরের সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষার কার্যক্রমের মধ্যে যোগসূত্র ও সমন্বয় প্রয়োজন। আবার এই পর্যায়ের শিক্ষা–কার্যক্রম এমন হতে হবে যাতে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা অথবা উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা কোন একটি বৃত্তিমূলক পেশা অবলম্বন করে শিক্ষালাভকে অর্থবহ করে তুলতে পারে। অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন যাতে জীবন ও জীবিকার মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব হয়। তাছাড়া শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রকৃতি এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের সাধারণ, মাদ্রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পরিক স্থানান্তর সহজ হয়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য দুর করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

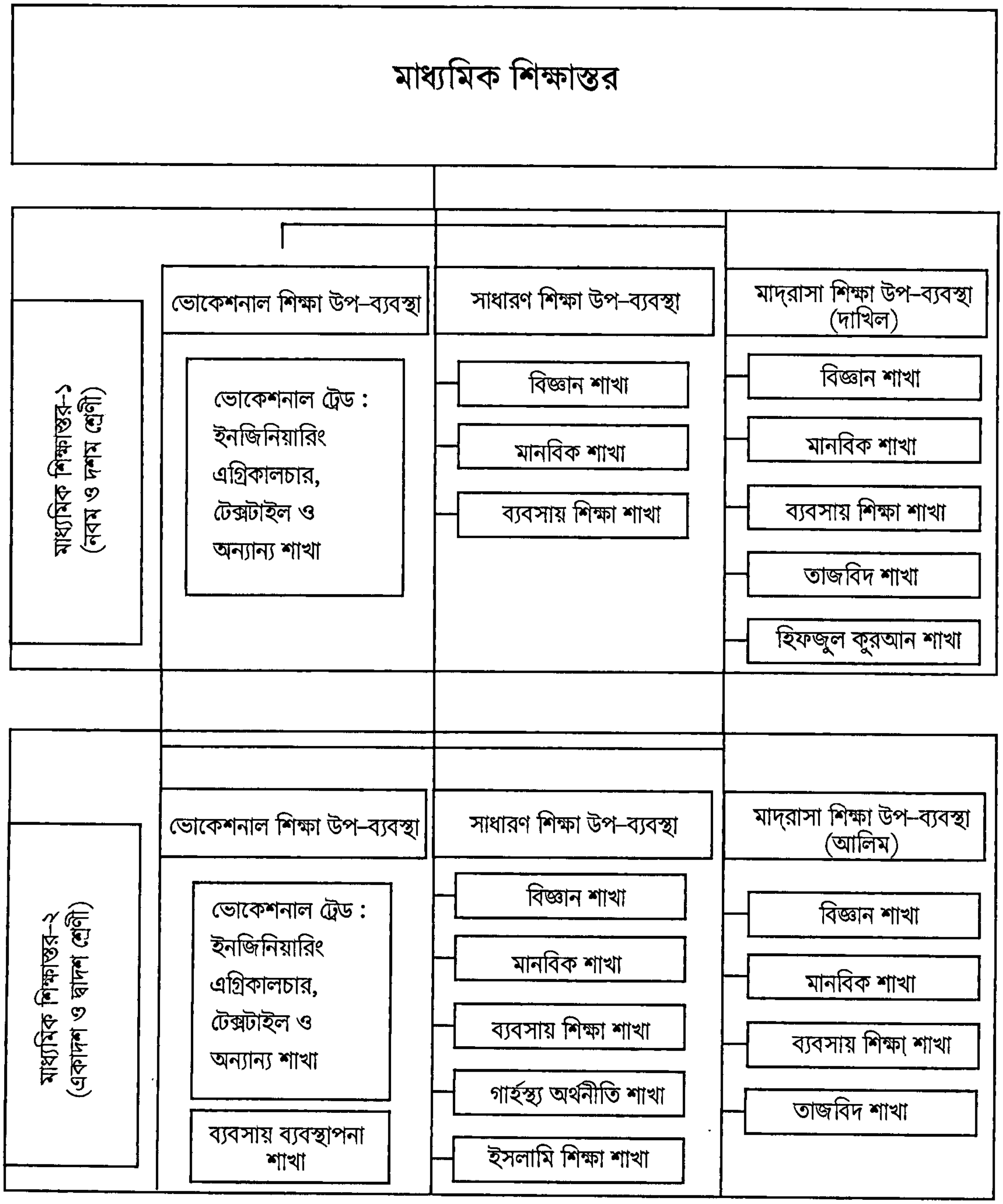

৪.২. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে মানবিকতাবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক ও দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যোগ্যতার সঙ্গে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে তৈরি করার জন্য উপযোগী বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক ধারায় থাকবে কতগুলো মৌলিক বিষয় যা সব শিক্ষার্থীর জন্য অবশ্যপাঠ্য এবং কতগুলো বিষয় থাকবে নৈর্বাচনিক যেগুলো শিক্ষার্থীদের প্রবণতা–অনুযায়ী বাছাই করা হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে থাকবে বিষয়ের বৈচিত্র্য। দেশের চাহিদার গুরুত্ব বিবেচনা করে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রবণতা–অনুযায়ী বিভিন্ন ধারার মধ্যে একটি ধারা গ্রহণ করবে। নির্বাচিত ধারাটি অবলম্বন করে শিক্ষার্থী দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট হবে। মূল শিখন–দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ পেশা নির্বাচিত হবে। দক্ষতার বিষয়গুলো হবে বহুমাত্রিক।

৪.৩. সাধারণ শিক্ষা বিভাগ

মাধ্যমিক শিক্ষার নবম–দশম শ্রেণীর জন্য অন্যতম বিভাগ সাধারণ শিক্ষা বিভাগ। এর মধ্যে থাকবে বিজ্ঞান শাখা, মানবিক শাখা ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা।

বিজ্ঞান শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয় ৬০০ নম্বরের, তিনটি নৈর্বাচনিক বিষয় ৩০০ এবং একটি ১০০ নম্বরের নৈর্বাচনিক আবশ্যিক প্রযুক্তি বিষয় থাকবে। এছাড়া ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে।

মানবিক শাখায় থাকবে আবশ্যিক বিষয় ৬০০ নম্বরের, তিনটি আবশ্যিক বিষয় ৩০০ এবং একটি ১০০ নম্বরের নৈর্বাচনিক আবশ্যিক প্রযুক্তি বিষয় থাকবে। এছাড়া এ শাখায় আরও একটি ১০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে।

ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় আবশ্যিক বিষয় ৬০০, তিনটি আবশ্যিক বিষয় ৩০০ এবং একটি নৈর্বাচনিক আবশ্যিক প্রযুক্তি বিষয় ১০০। এছাড়া ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষা বিভাগে সকল শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক বিষয় ৪০০, নৈর্বাচনিক বিষয় ৬০০ এবং প্রযুক্তি শিক্ষা ১০০, মোট ১১০০। বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় বাংলা ২০০ এবং ইংরেজি ১০০, মোট ৩০০ নম্বর সবার জন্য নির্ধারিত থাকবে। বিজ্ঞান শাখা, ব্যবসায় শিক্ষা শাখা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও সংগীত শাখায় স্বতন্ত্র আবশ্যিক, নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে।

৪.৪. বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিভাগ

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে তিন ধারার মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিভাগ একটি পূর্ণাঙ্গ ধারা হিসেবে বিরাজ করবে। জনশক্তি হল উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগসৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদাবৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক এবং প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমাদের অফুরন্ত জনসম্পদকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার এই বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনা করে মাধ্যমিক শিক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংযোগ সাধন করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতামান তিন, দুই ও এক পর্যায়ের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিভাগে নবম দশম শ্রেণীতে থাকবে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ধর্মশিক্ষা ও সামাজিক বিজ্ঞান। এর মোট নম্বর ৬০০। এ ছাড়া থাকবে ৪টি অতিরিক্ত আবশ্যিক বিষয়। উচ্চতর গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শিক্ষায় মোট নম্বর ৪০০। এ ছাড়া নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে একটি বৃত্তিমূলক ট্রেড ৩০০ ও সংশ্লিষ্ট ট্রেডে বাস্তব প্রশিক্ষণ ১০০ নম্বর। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিভাগে সর্বমোট নম্বর হবে ১৪০০। এই বিভাগে যেসব ট্রেড থাকবে তার শাখাগুলো এ রকম : ১. কৃষি উপশাখা, ২. ইনজিনিয়ারিং উপশাখা, ৩. তথ্য উপশাখা, ৪. সার্ভিস উপশাখা, ৫. টেক্সটাইল উপশাখা, ও ৬. অন্যান্য বৃত্তি উপশাখা।

নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষা বিভাগে আবশ্যিক ও নৈর্বাচনিক বিষয়ের সঙ্গে একটি ১০০ নম্বরের প্রযুক্তি বিষয় নৈর্বাচনিক আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নিতে হবে। অপরদিকে মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে একই ধরনের একটি ১০০ নম্বরের নৈর্বাচনিক আবশ্যিক বিষয় গ্রহণ করতে হবে। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে অনুরূপ বৃত্তিমূলক শিক্ষা রয়েছে।

একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিভাগে সাধারণ আবশ্যিক বিষয় ৪০০, অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় ৭০০ এবং নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ ৫০০ নম্বর। বৃত্তিমূলক ট্রেড উপশাখা, কৃষি উপশাখা, ইনজিনিয়ারিং উপশাখা, তথ্য উপশাখা, সার্ভিস উপশাখা, টেক্সটাইল উপশাখা, অন্যান্য বৃত্তি উপশাখা, কারবার ব্যবস্থাপনা উপশাখা, কম্পিউটার অপারেশন উপশাখা, বহুভাষিক সেক্রেটারিয়াল সায়েন্স উপশাখা, হিসাবরক্ষণ উপশাখা ও উদ্যোগ উন্নয়ন উপশাখা ইত্যাদি উপশাখাগুলোতে সাধারণ আবশ্যিক বিষয়গুলো থাকবে সকল শিক্ষার্থীর জন্য, অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় ও নৈর্বাচনিক বিষয় বিশেষ বিশেষ শাখার জন্য থাকবে।

মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়া শিক্ষার্থী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পূর্বেই মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য বর্তমানে ভিটিআই, টিটিসি ও অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কোর্স পরিচালনার পর প্রাপ্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে বেসিক ট্রেড পর্যায়ে নির্বাচিত ট্রেডে বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। বৃত্তিমূলক, প্রকৌশল ডিপ্লোমা ও ডিপ্লোমা পর্যায়ের অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর জন্য জাতীয় দক্ষতা মানের বেসিক ট্রেড তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম গ্রেডের উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৫. মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে নবম ও দশম শ্রেণী (দাখিল) পর্যায়ে থাকবে বিজ্ঞান, মানবিক ও বৃত্তিমূলক শাখা। সকল শাখার জন্যই আবশ্যিক বিষয় ৬০০, অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় ৩০০ এবং নৈর্বাচনিক আবশ্যিক প্রযুক্তি বিষয় ১০০। এছাড়া ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে। এই পর্যায়ে বিভিন্ন শাখার জন্য সাধারণ আবশ্যিক বিষয় যেমন থাকবে, তেমনি বিশেষ বিশেষ শাখার জন্য স্বতন্ত্র আবশ্যিক বিষয় ও ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে। সকল শাখায় একটি প্রযুক্তি বিষয় গ্রহণ করতে হবে।

একাদশ ও দ্বাদশ (আলিম) শ্রেণীতে থাকবে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা। প্রত্যেক শাখায় সাধারণ আবশ্যিক বিষয় থাকবে ৪০০ নম্বরের, শাখা ভিত্তিক অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়ে থাকবে ৬০০ নম্বর। এছাড়া ২০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে।

এ পর্যায়ে তিনটি উপ-ব্যবস্থার বিষয়-তালিকা সংযোজিত হল। এখানে দেখা যাবে এ তিনটি উপ-ব্যবস্থায় অনেকগুলো বিষয়ই একই ধরনের ও সমপর্যায়ের। এতে শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা করলে সহজেই এক উপ-ব্যবস্থা থেকে অন্য উপ-ব্যবস্থায় বদলি হতে পারবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বিষয় তালিকা

৯ম ও ১০ম শ্রেণী

সাধারণ শিক্ষা উপ–ব্যবস্থা	ভোকেশনাল শিক্ষা উপ–ব্যবস্থা	মাদ্‌রাসা শিক্ষা উপ–ব্যবস্থা (দাখিল বিজ্ঞান)
বিজ্ঞান শাখা : ক. **আবশ্যিক বিষয়** ৬০০ ১. বাংলা ২০০ ২. ইংরেজি ১০০ ৩. গণিত ১০০ ৪. ধর্ম শিক্ষা ১০০ ৫. সামাজিক বিজ্ঞান ১০০ (Bangladesh Studies) খ. নৈর্বাচনিক বিষয় (৩টি) ৩০০ ১. উচ্চতর গণিত (আবশ্যিক) ১০০ এবং নিচের যে কোন ২টি বিষয় নিতে হবে ১. রসায়ন বিজ্ঞান ১০০ ২. পদার্থ বিজ্ঞান ১০০ ৩. জীব বিজ্ঞান ১০০ গ. নৈর্বাচনিক আবশ্যিক (প্রযুক্তি) (যে কোন ১ টি) ১০০ ১. কম্পিউটার ২. কৃষি শিক্ষা ৩. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ৪. কর্মমুখী শিক্ষা ৫. বেসিক ট্রেড ৬. হিসাব বিজ্ঞান ৭. বিদ্যুৎ বিদ্যা ৮. গার্মেন্টিস ৯. অটোসার্ভিস ঘ. ঐচ্ছিক (যে কোন ১ টি) ১০০ ১. উচ্চতর ইংরেজি ২. আধুনিক আরবি ৩. সংস্কৃত ৪. পালি ৫. সংগীত ৬. পদার্থ বিদ্যা ৭. রসায়ন বিজ্ঞান ৮. জীব বিজ্ঞান ৯. শারীরিক শিক্ষা ১০. ভূগোল ১১. আল–কুরআন ১২. আল–হাদিস ১৩. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান খ ও গ গুচ্ছ থেকে কোন বিষয় নেওয়া হলে ঘ গ্রুপ থেকে একই বিষয় নেওয়া যাবে না।	ক. **আবশ্যিক বিষয়সমূহ** ৬০০ ১. বাংলা ২০০ ২. ইংরেজি ১০০ ৩. গণিত ১০০ ৪. ধর্ম শিক্ষা ১০০ ৫. সামাজিক বিজ্ঞান ১০০ (Bangladesh Studies) খ. অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়সমূহ ৪০০ ১. উচ্চতর গণিত ১০০ ২. পদার্থ বিজ্ঞান ১০০ ৩. রসায়ন বিজ্ঞান ১০০ ৪. কম্পিউটার ১০০ গ. নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ : ৩০০+১০০ = ৪০০ একটি ভোকেশনাল ট্রেড ৩০০ সংশ্লিষ্ট ট্রেডে বাস্তব প্রশিক্ষণ ১০০ **বৃত্তিমূলক ট্রেডসমূহ :** ঘ. কৃষি উপশাখা ১. অ্যাকোয়াকালচার ২. এগ্রো–বেজ্‌ফুড ৩. ডেয়রি ৪. ফার্মমেশিনারি ৫. ফ্লোরিকালচার ৬. হর্টিকালচার ৭. মিল্ক এন্ড মিল্ক প্রোডাক্টস্ ৮. পোল্ট্রি ঙ. ইনজিনিয়ারিং উপ–শাখা ১. আর্মেচার ওয়েল্ডিং ২. অটোমোটিভ ৩. কেবল জয়েন্টার ৪. কার্পেন্ট্রি ৫. সিরামিক্স ৬. সিভিল কন্সট্রাকশন (মেসনারি) ৭. ড্রাফটিং (সিভিল) ৮. ড্রাফটিং (মেকানিক্যাল) ৯. ইলেকট্রিক্যাল লাইনম্যান ১০. ফাউন্ড্রি ১১. জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান ১২. জেনারেল মেকানিক্স ১৩. হাউজ ওয়্যারিং ১৪. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রিশিয়ান ১৫. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স ১৬. মেশিনিস্ট	**বিজ্ঞান শাখা :** ক. **আবশ্যিক বিষয়সমূহ** ৬০০ ১. বাংলা ২০০ ২. ইংরেজি ১০০ ৩. গণিত ১০০ ৪. আল–কুরআন ১০০ ৫. আধুনিক আরবি ১০০ খ. অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়সমূহ ৩০০ (যে কোন ৩ টি) ১. পদার্থ বিজ্ঞান ১০০ ২. রসায়ন বিজ্ঞান ১০০ ৩. জীববিজ্ঞান ১০০ ৪. উচ্চতর গণিত ১০০ গ. নৈর্বাচনিক আবশ্যিক (প্রযুক্তি) (যে কোন ১ টি) ১. কম্পিউটার ২. কৃষি শিক্ষা ৩. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ৪. কর্মমুখী শিক্ষা ৫. বেসিক ট্রেড ৬. হিসাব বিজ্ঞান ৭. বিদ্যুৎ বিদ্যা ৮. গার্মেন্টিস ৯. অটোসার্ভিস ঘ. ঐচ্ছিক (যে কোন ১ টি) ১. উচ্চতর ইংরেজি ২. উচ্চতর গণিত ৩. জীববিজ্ঞান ৪. সামাজিক বিজ্ঞান (Bangladesh Studies) ৫. ইসলামের ইতিহাস ৬. উর্দু ৭. ফারসি ৮. ফিক্‌হ্‌ ও আকাইদ ৯. আল–হাদিস ১০. স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান কোন বিষয় খ ও গ গুচ্ছে নেওয়া হলে ঘ গ্রুপে নেওয়া যাবে না।

মানবিক শাখা :

ক. আবশ্যিক বিষয় ৬০০
১. বাংলা ২০০
২. ইংরেজি ১০০
৩. গণিত ১০০
৪. ধর্ম শিক্ষা ১০০
৫. সাধারণ বিজ্ঞান ১০০

খ. অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় (৩টি) ৩০০
১. ইতিহাস ১০০
২. ভূগোল ১০০
৩. অর্থনীতি/পৌরনীতি ১০০

গ. নৈর্বাচনিক আবশ্যিক (প্রযুক্তি)
(যে কোন ১টি) ১০০
১. কম্পিউটার
২. কৃষি শিক্ষা
৩. গার্হস্থ্য অর্থনীতি
৪. কর্মমুখী শিক্ষা
৫. বেসিক ট্রেড
৬. হিসাব বিজ্ঞান
৭. বিদ্যুৎ বিদ্যা
৮. গার্মেন্টস
৯. অটোসার্ভিস

ঘ. ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি) ১০০
১. অর্থনীতি
২. পৌরনীতি
৩. গার্হস্থ্য অর্থনীতি
৪. উচ্চতর বাংলা
৫. উচ্চতর ইংরেজি
৬. উচ্চতর গণিত
৭. আরবি/সংস্কৃত/পালি
৮. চারু ও কারুকলা
৯. হিসাব বিজ্ঞান
১০. সংগীত
১১. শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া
১২. আল-কুরআন
১৩. আল-হাদিস

(যে কোন বিষয় দুবার নেওয়া যাবে না)

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা :

ক. আবশ্যিক বিষয় ৬০০
১. বাংলা ২০০
২. ইংরেজি ১০০
৩. গণিত ১০০
৪. ধর্ম শিক্ষা ১০০
৫. সাধারণ বিজ্ঞান ১০০

১৭. প্যাটার্ন মেকিং
১৮ প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং
১৯ রেডিও এন্ড টিভি
২০. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং (ডোমেস্টিক)
২১. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং (ইন্ডাস্ট্রিয়াল)
২২. টার্নার
২৩. ওয়েল্ডিং

চ. ইনফরমেশন উপ-শাখা
১. কম্পিউটার মেকানিক্স
২. কম্পিউটার অপারেটর

ছ. লেদার উপ-শাখা
১. ফুট ওয়্যার
২. লেদার প্রোডাক্টস
৩. লেদার ট্যানিং

জ. সার্ভিস উপ-শাখা
১. কুকিং
২. ড্রাইভিং
৩. ফুড প্রোসেসিং এন্ড প্রিজার্ভেশন
৪. হেয়ার ড্রেসিং
৫. পেইন্টার
৬. সেলসম্যানশিপ

ঝ. টেক্সটাইল উপ-শাখা
১. ড্রেস মেকিং
২. ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং
৩. গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং
৪. নিটিং
৫. স্পিনিং
৬. উইভিং/ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং

ঞ. বিবিধ বৃত্তি উপ-শাখা
১. ফরেস্ট্রি
২. প্রিন্টিং
৩. সেরিকালচার

মানবিক শাখা :

ক. আবশ্যিক বিষয় ৬০০
১. বাংলা ২০০
২. ইংরেজি ১০০
৩. গণিত ১০০
৪. আল-কুরআন ১০০
৫. আধুনিক আরবি ১০০

খ. অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় ৩০০
১. আল-হাদিস ১০০
২. ফিকহ্ ও উসুলে ফিকহ্ ১০০
৩. সাধারণ বিজ্ঞান ১০০

গ. নৈর্বাচনিক আবশ্যিক (প্রযুক্তি) ১০০
(যে কোন ১ টি)
১. কম্পিউটার
২. কৃষি শিক্ষা
৩. গার্হস্থ্য অর্থনীতি
৪. কর্মমুখী শিক্ষা
৫. বেসিক ট্রেড
৬. হিসাব বিজ্ঞান
৭. বিদ্যুৎ বিদ্যা
৮. গার্মেন্টস
৯. অটোসার্ভিস

ঘ. ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি) ১০০
১. উচ্চতর ইংরেজি
২. উচ্চতর গণিত
৩. জীববিজ্ঞান
৪. সামাজিক বিজ্ঞান (Bangladesh Studies)
৫. ইসলামের ইতিহাস
৬. উর্দু
৭. ফারসি.
৮. ফিক্হ্ ও আকাইদ
৯. আল-হাদিস
১০. স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান

দাখিল ভোকেশনাল

ক. আবশ্যিক বিষয় ৬০০
১. বাংলা ২০০
২. ইংরেজি ১০০
৩. গণিত ১০০
৪. আল-কুরআন ১০০
৫. আধুনিক আরবি ১০০

খ. অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় (৩টি) ৩০০ ১. ব্যবসায় পরিচিতি ১০০ ২. হিসাব বিজ্ঞান ১০০ ৩. ব্যবসায় উদ্যোগ অথবা বাণিজ্যিক ভূগোল ১০০ গ. নৈর্বাচনিক আবশ্যিক (প্রযুক্তি) (যে কোন একটি) ১০০ ১. কম্পিউটার ২. কৃষি শিক্ষা ৩. গার্হস্থ্য অর্থনীতি ৪. কর্মমুখী শিক্ষা ৫. বেসিক ট্রেড ৬. হিসাব বিজ্ঞান ৭. বিদ্যুৎ বিদ্যা ৮. গার্মেন্টস ৯. অটোসার্ভিস ঘ. ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি) ১০০ ১. অর্থনীতি ২. পৌরনীতি ৩. গার্হস্থ্য অর্থনীতি ৪. উচ্চতর বাংলা ৫. উচ্চতর ইংরেজি ৬. উচ্চতর গণিত ৭. আরবি/সংস্কৃত/পালি ৮. চারু ও কারুকলা ৯. হিসাব বিজ্ঞান ১০. সংগীত ১১. শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া ১২. আল-কুরআন ১৩. আল-হাদিস (যে কোন বিষয় দুবার নেওয়া যাবে না)		

—৯

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বিষয় তালিকা

(একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)

সাধারণ শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা

আবশ্যিক বিষয়মূহ : ৩০০
নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ : ৬০০
প্রযুক্তি শিক্ষা : ১০০

ঐচ্ছিক বিষয় (১টি) ২০০
আবশ্যিক বিষয়সমূহ : ৩০০
১. বাংলা ২০০
২. ইংরেজি ১০০

অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় :
বিজ্ঞান শাখা :
ক গুচ্ছ :
গণিত (আবশ্যিক) ২০০
নৈর্বাচনিক বিষয় (২টি) ৪০০
১. রসায়ন বিজ্ঞান ২০০
২. পদার্থ বিজ্ঞান ২০০
৩. জীব বিজ্ঞান ২০০

খ গুচ্ছ :
ঐচ্ছিক বিষয় (১টি) ২০০
১. রসায়ন বিজ্ঞান
২. পদার্থ বিদ্যা
৩. জীব বিজ্ঞান
৪. ভূগোল
৫. মনোবিজ্ঞান
৬. কম্পিউটার বিজ্ঞান
৭. পরিসংখ্যান
৮. কৃষি শিক্ষা
৯. হিসাব বিজ্ঞান
১০. আরবি/সংস্কৃত/পালি
১১. আইন শিক্ষা
১২. ক্রীড়া : ফুটবল/হকি/ক্রিকেট/টেনিস/ভলিবল/সাঁতার/অ্যাথলেটিকস্।*

* বিষয়টি শুধু বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা একটি নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে নিতে পারবে।

ভোকেশনাল শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা

সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহ ৪০০
অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়সমূহ ৭০০
নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ ৫০০

সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহ : মোট ৪০০
১. বাংলা ২০০
২. ইংরেজি ২০০

ভোকেশনাল ট্রেড শাখা :
অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় : মোট ৭০০
১. পদার্থ বিজ্ঞান : ২০০
২. রসায়ন বিজ্ঞান ২০০
৩. গণিত ২০০
৪. কম্পিউটার ব্যবহার/আত্ম-কর্মসংস্থান ১০০

নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ : মোট ৫০০
ক. একটি ভোকেশনাল ট্রেড ৪০০
খ. সংশ্লিষ্ট ট্রেডে বাস্তব প্রশিক্ষণ ১০০

ভোকেশনাল ট্রেডসমূহ :
কৃষি উপশাখা
১. অ্যাকোয়াকালচার
২. এগ্রোবেজড ফুড
৩. ডেয়রি
৪. ফার্ম মেশিনারি
৫. ফ্লোরিকালচার
৬. হর্টিকালচার
৭. মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্টস
৮. পোল্ট্রি

ইনজিনিয়ারিং উপশাখা
১. আর্মেচার ওয়েল্ডিং
২. অটো ইলেকট্রিশিয়ান
৩. অটোমোটিভ
৪. কেবল জয়েন্টার
৫. কার্পেন্ট্রি
৬. সিরামিক্স
৭. সিভিল কন্সট্রাকশন (মেসনারি)
৮. ড্রাফটিং (সিভিল)
৯. ড্রাফটিং (মেকানিক্যাল)
১০. ইলেকট্রিক্যাল লাইনম্যান

মাদ্‌রাসা শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা : (আলিম)

বিজ্ঞান শাখা
ক. আবশ্যিক বিষয়সমূহ ৪০০
১. বাংলা ২০০
২. ইংরেজি ১০০
৩. আল-কুরআন ও আল-হাদিস ১০০

খ. অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়সমূহ ৬০০
১. পদার্থ বিজ্ঞান ২০০
২. রসায়ন বিজ্ঞান ২০০
৩. জীব বিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত ২০০

গ. ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি) ২০০
১. আরবি
২. ফিক্‌হ ও আকাইদ
৩. কম্পিউটার বিজ্ঞান
৪. কৃষি বিজ্ঞান
৫. জীব বিজ্ঞান
৬. ইসলামের ইতিহাস
৭. উচ্চতর বাংলা
৮. উচ্চতর গণিত
৯. উচ্চতর ইংরেজি
১০. গার্হস্থ্য অর্থনীতি

মানবিক শাখা
ক. আবশ্যিক বিষয়সমূহ ৭০০
১. বাংলা ২০০
২. ইংরেজি ১০০
৩. আল-কুরআন ১০০
৪. আল-হাদিস ১০০
৫. আরবি ২০০

খ. অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়সমূহ ৩০০
১. ফিক্‌হ ও আকাইদ ১০০
২. উসুলে ফিক্‌হ ও ফারায়েজ ১০০
৩. ইসলামের ইতিহাস ১০০

মানবিক শাখা :

ক. গুচ্ছ :

নৈর্বাচনিক বিষয় (২টি) ৪০০

১. অর্থনীতি
২. পৌরনীতি
৩. সমাজ বিজ্ঞান/সমাজ কল্যাণ
৪. ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস

খ. গুচ্ছ :

১টি নৈর্বাচনিক ও ১টি ঐচ্ছিক বিষয় (২০০+২০০= ৪০০)

১. যুক্তিবিদ্যা
২. উচ্চতর বাংলা
৩. উচ্চতর ইংরেজি
৪. গণিত
৫. পরিসংখ্যান
৬. ভূগোল
৭. মনোবিজ্ঞান
৮. সমাজ কল্যাণ
৯. সমাজ বিজ্ঞান
১০. গার্হস্থ্য অর্থনীতি
১১. আরবি/সংস্কৃত/পালি
১২. ইসলামি শিক্ষা
১৩. সামরিক বিজ্ঞান
১৪. সংগীত
১৫. উচ্চাঙ্গ সংগীত
১৬. চারু ও কারুকলা
১৭. নাট্যকলা
১৮. কৃষি শিক্ষা
১৯. কম্পিউটার শিক্ষা
২০. হিসাব বিজ্ঞান
২১. শিক্ষক শিক্ষণ
২২. আইন শিক্ষা
২৩. ক্রীড়া : ফুটবল/হকি/ক্রিকেট/টেবিলটেনিস/ভলিবল/সাঁতার/বক্সিং/অ্যাথলেটিক্স/জিমন্যাস্টিক্স।*

২৪. 'ক' থেকে যে ২টি বিষয় নেওয়া হয়েছে সেগুলো ছাড়া অবশিষ্ট বিষয়সমূহ থেকে ১টি নৈর্বাচনিক ও অন্য যে কোন ১টি বিষয় ঐচ্ছিক হিসেবে নেওয়া যাবে।

ঐচ্ছিক বিষয় : ক ও খ থেকে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে নির্বাচিত বিষয় ৩টি ছাড়া অন্য যে কোন ১টি বিষয় ঐচ্ছিক হিসেবে নিতে পারবে। তবে সমাজকল্যাণ ও সমাজ বিজ্ঞান এবং ইসলামের ইতিহাস একত্রে নেওয়া যাবে না।

* বিষয়টি শুধু বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা একটি নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে নিতে পারবে।

১১. ফাউন্ড্রি
১২. জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান
১৩. জেনারেল মেকানিক্স
১৪. হাউজ ওয়্যারিং
১৫. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রিশিয়ান
১৬. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স
১৭. মেশিনিস্ট
১৮. প্যাটার্ন মেকিং
১৯. প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং
২০. রেডিও এন্ড টিভি
২১. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং (ডোমেস্টিক)
২২. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং (ইন্ডাস্ট্রিয়াল)
২৩. টার্নার
২৪. ওয়েল্ডিং

ইনফরমেশন উপ-শাখা

১. কম্পিউটার মেকানিক্স
২. কম্পিউটার অপারেটর

লেদার উপ-শাখা

১. ফুট ওয়্যার
২. লেদার প্রোডাক্টস
৩. লেদার ট্যানিং

সার্ভিস উপ-শাখা

১. কুকিং
২. ড্রাইভিং
৩. ফুড প্রোসেসিং এন্ড প্রিজার্ভেশন
৪. হেয়ার ড্রেসিং
৫. পেইন্টার
৬. সেলসম্যানশিপ

টেক্সটাইল উপ-শাখা

১. ড্রেস মেকিং
২. ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং
৩. গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং
৪. নিটিং
৫. স্পিনিং
৬. উইভিং/ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং

বিবিধ বৃত্তি উপ-শাখা

১. ফরেস্ট্রি
২. প্রিন্টিং
৩. সেরিকালচার

গ. ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি) ২০০

১. উচ্চতর বাংলা
২. উচ্চতর ইংরেজি
৩. উর্দু
৪. ফারসি
৫. তাজবীদ
৬. পৌরনীতি
৭. ইসলামি অর্থনীতি
৮. কম্পিউটার বিজ্ঞান
৯. কৃষি বিজ্ঞান
১০. গার্হস্থ্য অর্থনীতি
১১. সমাজবিজ্ঞান
১২. পরিসংখ্যান
১৩. মানতেক
১৪. মনোবিজ্ঞান

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

ক. আবশ্যিক বিষয়সমূহ ৬০০

১. বাংলা ২০০
২. ইংরেজি ১০০
৩. আল-কুরআন ১০০
৪. আল-হাদিস ১০০
৫. আরবি ১০০

খ. অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়সমূহ ৪০০

১. ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ ২০০
২. হিসাব বিজ্ঞান ২০০
অথবা
ব্যবসায়িক উদ্যোগ
অথবা
বাণিজ্যিক ভূগোল

গ. ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি) ২০০

১. ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা
২. অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল
৩. অর্থায়ন, উৎপাদন ও বিপণন
৪. কম্পিউটার বিজ্ঞান
৫. কৃষি বিজ্ঞান
৬. পরিসংখ্যান
৭. সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা
৮. ফিক্‌হ, উসুলে ফিক্‌হ ও ফারায়েজ
৯. আরবি

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা :

ক. গুচ্ছ (আবশ্যিক বিষয়) ২টি : ৪০০

১. ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ (কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ব্যাংকিং ও বীমা)

২. হিসাব বিজ্ঞান

খ. গুচ্ছ (নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক)

(২০০ + ২০০) = ৪০০

১. ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা

২. অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল

৩. অর্থায়ন উৎপাদন এবং বিপণন

৪. কম্পিউটার

৫. পরিসংখ্যান

৬. কৃষি শিক্ষা

৭. সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা

৮. আরবি/সংস্কৃত/পালি

৯. আইন শিক্ষা

ঐচ্ছিক 'খ'-এর যে বিষয়টি নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে শিক্ষার্থী নির্বাচন করবে ঐ বিষয়টি ছাড়া 'খ'-এর যে কোন ১টি বিষয় শিক্ষার্থী ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করতে পারে।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখা :

ক. গুচ্ছ :

নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ (৩টি) ৬০০

১. সাধারণ বিজ্ঞান এবং খাদ্য ও পুষ্টি

২. ব্যবহারিক শিল্পকলা এবং বস্ত্র ও পোশাকশিল্প

৩. গৃহ ব্যবস্থাপনা ও শিশু পরিবর্ধন এবং পারিবারিক সম্পর্ক

খ. গুচ্ছ

ঐচ্ছিক বিষয় (১টি) ২০০

১. পৌরনীতি

২. অর্থনীতি

৩. মনোবিজ্ঞান

৪. ইসলাম শিক্ষা

৫. কৃষি শিক্ষা

৬. সংগীত

৭. কম্পিউটার শিক্ষা

৮. সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা

৯. ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা

ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা শাখা

অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় :

১. বাংলা টাইপরাইটিং

২. ইংরেজি টাইপরাইটিং

৩. কম্পিউটার পরিচিতি ও ওয়ার্ড প্রোসেসিং

৪. অর্থনীতি

৫. ব্যবসায়িক যোগাযোগ

৬. ব্যবসায়িক গণিত

৭. ব্যবসায়িক পরিসংখ্যান

৮. ব্যবসায়িক ভূগোল

৯. সংগঠন ও ব্যবসায় পরিচিতি

১০. ব্যবস্থাপনা নীতি ও পদ্ধতি

১১. অফিস ব্যবস্থাপনা

নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ :

যে কোন একটি উপশাখা

কম্পিউটার অপারেশন উপশাখা

১. কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন (১,২,৩, ও ৪)

বহুভাষিক সেক্রেটারিয়্যাল সায়েন্স উপশাখা

১. বহুভাষী সাঁটলিপি, বাংলা ও ইংরেজি ইংরেজি ও আরবি (১,২,৩, ও ৪)

হিসাবরক্ষণ উপশাখা

১. হিসাবরক্ষণ নীতি ও পদ্ধতি (১ ও ২)

২. উৎপাদন ব্যয় হিসাব (১ ও ২)

ব্যাংকিং উপশাখা

১. ব্যাংকিং কার্যাবলি ও নীতি (১ ও ২)

২. ব্যাংকিং হিসাবরক্ষণ (১ ও ২)

উদ্যোক্তা উন্নয়ন উপশাখা

১. আত্ম-কর্মসংস্থান ও উদ্যোগগ্রহণ (১ ও ২)

২. ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা (১ ও ২)

সংগীত শাখা : ক. আবশ্যিক বিষয় ৭০০ ১. বাংলা ২০০ ২. ইংরেজি ১০০ ৩. সংগীতের তত্ত্ব ১০০ ৪. সংগীতের ইতিহাস ১০০ ৫. উচ্চাংগ সংগীত ২০০ খ. নৈর্বাচনিক বিষয় (একটি) ২০০ ১. রবীন্দ্র সংগীত ২. নজরুল সংগীত ৩. আধুনিক গান ৪. দেশাত্মবোধক গান ৫. লোক সংগীত ৬. যন্ত্র সংগীত গ. ঐচ্ছিক বিষয় (একটি) ২০০ ১. পৌরনীতি ২. অর্থনীতি ৩. সাধারণ ইতিহাস ৪. সমাজকল্যাণ		

৫. সুপারিশ

৫.১ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হবে চার বছরের—নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।

৫.২ সাধারণ শিক্ষা, মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় নির্ধারিত অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে এবং এই স্তরের শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা বলে অভিহিত করা হবে।

৫.৩ মাধ্যমিক স্তরে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

মাদ্‌রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব থাকবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের।

৫.৪. বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করতে হবে এবং উচ্চমাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৫. সকল বিষয়ের শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শূন্য পদ পূরণের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

৫.৬. সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় উদ্যোগ ও সহযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীগণের বেতন ভাতা সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে বহন করতে হবে। সেই সঙ্গে সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতনের একটি যুক্তিসঙ্গত হার নির্ধারণ করতে হবে এবং তা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।

৫. ১০. শিক্ষার্থীদের উপদেশ ও নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান জোরদার করতে হবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য দুজন উপাধ্যক্ষ থাকা প্রয়োজন।

৫.১১. শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিকতাবোধের অভাবে দেশে ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউশন এবং কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। অনতিবিলম্বে তা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫.১২ শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

৫.১৩. দশম শ্রেণীর পর একটি বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর নাম হবে মাধ্যমিক প্রথম পর্ব। এই পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফল সমন্বিত করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে অনুরূপ একটি বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এর নাম হবে মাধ্যমিক দ্বিতীয় পর্ব। এতে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয় করতে হবে। পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে।

প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের নম্বর যোগ করে মাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্ত ফল নির্ধারিত হবে।

৫.১৪. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্য অনুপাত হবে ১ : ৪০।

৫.১৫. শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বিদেশীদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম চালু থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে সহজ বাংলা আবশ্যিক হিসেবে পাঠ্য থাকবে।

৫.১৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে।

৫. ১৭. দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.১৮. সরকারের নির্ধারিত স্তরের চেয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান বেশি হারে বেতন আদায় করে, যারা চাঁদা আদায় করে, যাদের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে এবং মিশনারি, ট্রাস্ট ও দেশী বিদেশী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের শিক্ষাখাত থেকে অর্থ বরাদ্দ করা চলবে না। তবে অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও অন্যান্য নীতিমালা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে। তবে সরকারের অনুমতিক্রমে কোন কোন শিক্ষা–প্রতিষ্ঠান "ও" লেবেল–"এ" লেবেল চালু রাখতে পারে।

৫.১৯. বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে যে, অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষকদের প্রাপ্য সরকারি অনুদান ভোগ করছেন। এ ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের মাধ্যমে এসব চিহ্নিত করে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.২০. ক্যাডেট কলেজগুলোতে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে এবং ক্যাডেট কলেজের ব্যয় নির্বাহ হবে সামরিক বাজেট বরাদ্দ থেকে।

অধ্যায়—৬

বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) ও কারিগরি শিক্ষা

১. ভূমিকা

দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ব্যবসা–বাণিজ্য, পরিবহণ, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রফতানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এ অসম প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের অফুরন্ত জনসম্পদকে বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) এবং প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

২. বর্তমান অবস্থা

জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত একটি জরিপ থেকে দেখা যায় দক্ষ কাজে নিয়োজিত ৮৫%–৯৪% শ্রমিকের কোন প্রশিক্ষণ নেই, মধ্যস্তরে ৬৪% কারিগরি পদে নিয়োজিত সুপারভাইজারদেরও কোন প্রশিক্ষণ নেই। এ ছাড়া, উচ্চস্তরে নিয়োজিত পেশাজীবীদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে মধ্যস্তরে নিয়োজিত কারিগরি পেশাজীবীদের (টেকনিশিয়ান) চেয়ে বেশি। জব মার্কেট এমপ্লয়মেন্ট প্যাটার্নে উল্লিখিত এ তিন ধরনের বিকৃতি বিদ্যমান থাকায় কৃষি, শিল্পকারখানা এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজে উৎপাদন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অন্য একটি জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় বিদেশে ক্রমান্বয়ে অধিক হারে অদক্ষ জনশক্তি রফতানির ফলে এ ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার আয় দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

এ অবস্থা দেশের উৎপাদনশীলতা তথা জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে মোটেও সহায়ক নয়। জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে কৃষি, ব্যবসা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, অন্যান্য উৎপাদনমুখী ও সেবামূলক কাজে বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং প্রকৌশল ও অন্যান্য কারিগরি শিক্ষায় ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পদ্ধতির বিকৃতি নিরসন এবং বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রফতানির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন আরও গতিশীল করার জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা দরকার।

৩. সুপারিশ

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

৩.১. জাতীয় দক্ষতামান তিন, দুই ও এক পর্যায়ের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষাক্রম (মাদ্‌রাসা শিক্ষাসহ) পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক করতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বর্ধিত হারে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.২ শিল্পকারখানা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে স্যান্ডুইচ প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাস্টার ক্রাফটসম্যান সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৩. বৃত্তিমূলক কোর্সের মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃতকার্য শিক্ষার্থীকে প্রকৌশল ডিপ্লোমাসহ সমপর্যায়ের অন্যান্য ডিপ্লোমা কোর্সের কমপক্ষে ২৫% আসনে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ইচ্ছুক উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের কোর্সে কৃতকার্য শিক্ষার্থীকে পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। এ ছাড়া, সাধারণ শিক্ষাসহ নিজ নিজ পর্যায়েও স্পেশালাইজেশন অনুযায়ী অন্যান্য বিশেষ ধারায় উচ্চ শিক্ষা কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ রাখতে হবে।

৩.৪. বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে দুই শিফট চালু করা হবে।

৩.৫. শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি নিয়মিত মেরামত, সংরক্ষণ ও ব্যবহারোপযোগী রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

ডিপ্লোমা স্তরের প্রকৌশল ও অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা

৩.৬. ডিপ্লোমা স্তরের সকল কারিগরি শিক্ষার মেয়াদ বর্তমানে প্রচলিত তিন বছর প্রাতিষ্ঠানিক এবং দুই মাস শিল্পকারখানায়/মাঠ পর্যায়ে সংযুক্তির স্থলে তিন বছর ছয় মাস প্রাতিষ্ঠানিক এবং ছয় মাস শিল্পকারখানায়/মাঠ পর্যায়ে সংযুক্তি করতে হবে।

৩.৭. এ শিক্ষাকে ইনজিনিয়ারিং, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট. ডিজাইন, ইনফরমেশন টেকনোলজি, এপ্লাইড সায়েন্স, এনভায়রনমেন্ট, সেরিকালচার, হর্টিকালচার, লেদার, ড্রেসমেকিং, গার্মেন্টস, এগ্রিকালচার পোস্ট হারভেস্ট, টেক্সটাইল এন্ড ক্লোদিং, প্রিন্টিং, গ্লাস, সিরামিক, মার্কেটিং, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, মেডিকেল ইন্সট্রুমেন্ট, ইন্সট্রুমেন্টেশন, মাইনিং, পেট্রোলিয়াম, সেলসম্যানশিপ, পশুপালন, মৎস্য, বনায়ন, রুরাল টেকনোলজি, পানি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ডিপ্লোমাস্তরের শিক্ষা বহুমুখী ও সম্প্রসারণ করতে হবে।

বিভিন্ন প্রকার ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান পলিটেকনিক ও মনোটেকনিকগুলোকে পূর্ণাঙ্গ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করতে হবে।

৩.৮. কারিগরি ডিপ্লোমা পর্যায়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষা কোর্সে (যেমন ইনজিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ের কোর্সের আসনের কিছু অংশ কারিগরি ডিপ্লোমা কোর্সে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে।

৩.৯. প্রকৌশল ডিপ্লোমা ও অন্যান্য ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোর্সগুলো দুই শিফটে চালু রাখতে হবে।

৩.১০. পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে চার বছর মেয়াদি (তিন বছর ছয় মাস প্রাতিষ্ঠানিক এবং ছয় মাস সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে সংযুক্তি) পশুপালন, হার্টিকালচার, পশু চিকিৎসা ও মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

৩.১১. শিল্প প্রতিষ্ঠান/সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রের সঙ্গতি রেখে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি নিয়মিত মেরামত, সংরক্ষণ ও ব্যবহারোপযোগী রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.১২ কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কারিগরি জনশক্তির প্রয়োজনের নিরিখে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা উত্তর স্বল্পমেয়াদি বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার্থী

৩.১৩. মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়া হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পূর্বেই মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য বর্তমানে ভিটিআই, টিটিসি ও অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কোর্স পরিচালনার পর প্রাপ্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে বেসিক ট্রেড পর্যায়ে নির্বাচিত ট্রেডে

বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। বৃত্তিমূলক, প্রকৌশল ডিপ্লোমা ও ডিপ্লোমা পর্যায়ের অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর জন্য জাতীয় দক্ষতা মানের বেসিক ট্রেড, তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম গ্রেডের উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.১৪. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে মেধাবী ও গরিব শিক্ষার্থীর জন্য বৃত্তি, উপবৃত্তি, অনুদান ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য অধিক উপযোগী ট্রেড/টেকনোলজির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৩.১৫. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ঝোঁক, সামর্থ্য, আগ্রহ ও উদ্যোগ সমীক্ষা করা এবং তাদের কর্মসংস্থান বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করার জন্য পরামর্শ ও নির্দেশনার ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজের উপযুক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.১৬. সকল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্রমে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ইতোমধ্যেই Entrepreneurship বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীর স্বকর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণের বর্তমান প্রক্রিয়া আরও জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীর স্বকর্মসংস্থানের বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.১৭. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে কৃতকার্য শিক্ষার্থীর জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে।

৩.১৮. সীমিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পেশাজীবন নির্ধারণের সুবিধার্থে স্কুল ও মাদ্রাসায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য ন্যূনতম একটি আবশ্যিক বৃত্তিমূলক বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ও চালু করতে হবে।

৩.১৯. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত ১:১৫ করতে হবে।

৩.২০. শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্রেডিট প্রথা চালু করার ফলে বিভাগ ও মেধা তালিকা প্রণয়নের পরিবর্তে GPA (Grade Point Average) চালু করতে হবে।

শিক্ষক ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণ

৩.২১. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে অধিকতর অবদান রাখেন এবং শিক্ষকতার বাইরের কর্মক্ষেত্রে আকর্ষণীয় বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি যথেষ্ট আছে বলে তাঁদের বেতন সমমানের অন্যান্য পদের বেতনক্রমের পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে নির্ধারণ, টেকনিক্যাল পে, শিক্ষকতা ভাতা এবং পদোন্নতির উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষকের স্বীয় পদ মানোন্নয়ন করে পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকতার সকল পদে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য অগ্রিম বর্ধিত বেতনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.২২. শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক পর্যায়ে শিক্ষকের পদোন্নতির বিষয় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একাডেমিক কমিটি/বোর্ড কর্তৃক তাঁর অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং কাজের মানের ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রণীত সুপারিশের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।

৩.২৩. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের কোন বিধিনিষেধ থাকবে না এবং এরূপ শিক্ষকের চাকরিকাল ৬৫ বৎসর পর্যন্ত হবে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সুযোগ্য ব্যক্তিদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.২৪. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের দায়িত্ব সরাসরি শিক্ষকের ওপর ন্যস্ত থাকায় শিক্ষকের জন্য প্রাইভেট পড়ানো/কোচিং সেন্টার পরিচালনা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩.২৫. সর্বস্তরে সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিল্পকারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৩.২৬. সকল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ভিটিটিআই ও টিটিসি এর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে হবে। টিটিসিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। ভিটিটিআইতে বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণে ডিগ্রি কোর্স খুলতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের সকল ক্ষেত্রে প্রাক-চাকরি কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। এছাড়া দূরশিক্ষণের মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.২৭. শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রার্থীর অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩.২৮. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষকের জন্য দেশবিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ এবং স্বল্পমেয়াদি কোর্স, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের মাধ্যমে আপগ্রেডিং ও আপডেটিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থাসহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ উৎসাহিত করতে হবে।

৩.২৯. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বিভাগীয় প্রধান ও সিনিয়র শিক্ষকের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৩০. ছুটি ও প্রশিক্ষণজনিত কারণে মোট শিক্ষক পদের ১০% অধিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৩১. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, শিল্পকারখানায় কাজের অভিজ্ঞতা, শিখন-শিক্ষণে জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং কাজের মান ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৩২. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কারিগরি ও অফিস কর্মচারীকে আধুনিক অফিস, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, যন্ত্রপাতি, রেকর্ডপত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষার কার্যকরতা আরও বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করতে হবে।

একাডেমিক কাঠামো, শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা

৩.৩৩. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষাব্যবস্থায় শারীরিক শিক্ষা এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৩৪. শিক্ষাক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে ক্রমানুয়ে বর্তমান প্রচলিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ন্যায় ক্রেডিট-আওয়ারভিত্তিক কোর্স স্ট্রাকচার প্রণয়ন করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে ক্রেডিট-আওয়ারের মান নির্ধারণ, অনুমোদন, বদলির ব্যবস্থা করতে হবে। আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল পদ্ধতিতে অর্জিত ক্রেডিট/প্রায়র লার্নিং জাতীয় পর্যায়ে উপযুক্ত ক্ষেত্রে শিক্ষায় ভর্তির জন্য গ্রহণযোগ্য করতে হবে।

৩.৩৫. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্রমে প্রচলিত ধারাবাহিক চূড়ান্ত পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্মকর্তা ও কারিগরি কর্মচারীর অব্যাহত যথোপযুক্ত স্টাফ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও উন্নত করতে হবে।

৩.৩৬. বর্তমানে প্রচলিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর জন্য দুই মাসব্যাপী শিল্পকারখানায়/কর্মক্ষেত্রে সংযুক্তির মেয়াদ কোর্সের অচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ক্ষেত্র বিশেষে দুই মাস থেকে ছয় মাস পর্যন্ত উন্নীত করতে হবে এবং সার্বিকভাবে এ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে।

৩.৩৭. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্রম কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের পরিবর্তনশীল চাহিদা বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা কাউন্সিল কর্তৃক নিরূপিত হতে হবে এবং তা নিয়মিতভাবে সংশোধিত, পরিমার্জিত করতে হবে।

৩.৩৮. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্রমের ৬০% ব্যবহারিক এবং ৪০% তাত্ত্বিক ক্লাসের বর্তমান ব্যবস্থা অব্যাহত থাকতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানা সম্পর্ক

৩.৩৯. জাতীয় পর্যায়ে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নে শিল্পকারখানা, ক্ষেতখামার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার মালিক/ব্যবস্থাপক/ প্রতিনিধির অধিকতর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৪০. প্রতিটি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিল্প প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অতিথি বক্তা হিসেবে নিয়োগ করার এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিষয়ক পরিষদে শিল্প প্রতিষ্ঠান/সংস্থার একাধিক প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে পারে।

৩.৪১. শিল্প প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজ নিজ শিল্প প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় প্রশিক্ষণার্থীর বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদানে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণকালীন সময়ের ভাতা প্রদানে সরকারিভাবে উৎসাহিত করতে হবে।

৩.৪২ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও নিয়োগকারী শিল্পকারখানা, ক্ষেতখামার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক অথবা নিয়োগকারী সংস্থাভিত্তিক স্যান্ডুইচ প্রোগ্রাম চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৪৩. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা অধিক ব্যয়বহুল বলে এসকল প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ভৌত সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এগুলোর অব্যবহৃত সময়ে বা ছুটির দিনে বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত ফি প্রদানের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা কোর্স পরিচালনার জন্য সুযোগ দিতে হবে। এরূপভাবে প্রাপ্ত অর্থ প্রতিষ্ঠানের আবর্তক বাজেটের সঙ্গে সমন্বয় করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ব্যয় করতে দিতে হবে।

পুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ

৩.৪৪. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত পুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষককে ছুটি দিয়ে অথবা উপযুক্ত শিক্ষককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে পুস্তক লেখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৪৫. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার শিক্ষা উপকরণ যেমন—পুস্তক, অডিও ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট, চার্ট, ইলাস্ট্রেশন, মডেল ইত্যাদি ডিজাইন উন্নয়ন, উৎপাদন, প্রকাশনা, মাননিয়ন্ত্রণ, বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

অর্থায়ন

৩.৪৬. মোট শিক্ষাবরাদ্দের অধিকতর অংশ ক্রমান্বয়ে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ করতে হবে।

৩.৪৭. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যয়ের বড় অংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে আসা উচিত। সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানার উৎপাদন ব্যয়ের একটি উপযুক্ত অংশ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে।

৩.৪৮. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাকে শিল্প হিসেবে বিবেচনাপূর্বক এ ক্ষেত্রে সহজ শর্তে, স্বল্পসুদে শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা ঋণ ও অনুদান দিয়ে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করতে হবে।

৩.৪৯. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় ব্যবহারিক ক্লাস ৬০% বিধায় শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক ক্লাসের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৫০. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার বিশেষ করে উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষার আবর্তক ব্যয় শিক্ষার্থীকে বহন করতে হবে। মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়ের ৫০% শিক্ষার্থীর বহন করতে হবে। গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীর শিক্ষাব্যয় মিটানোর জন্য উপবৃত্তি, শিক্ষাঋণ ও অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশাসনিক কাঠামো

৩.৫১. কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনের নিরিখে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ, বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তিউদ্যোগে পরিচালিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার নীতিনির্ধারণ, সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি এবং মাননির্ধারণ, উন্নয়ন, সমতাবিধান ও সমন্বয় সাধনের জন্য একটি স্বশাসিত ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা কাউন্সিল গঠন করতে হবে। এ কাউন্সিল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা এবং কর্মক্ষেত্রের সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে গবেষণাকার্য পরিচালনা করবে। এ কাউন্সিল অবিলম্বে গঠন ও কার্যকর করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিটি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে একটি গবেষণা সেল কাজ করবে।

৩.৫২. বর্তমানে প্রচলিত জটিল ও দীর্ঘসূত্রিতা শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়নপ্রকল্প পর্যায়ক্রমে প্রণয়ন, মূল্যায়ন, প্রাক–একনেক অনুমোদন এবং একনেক অনুমোদন প্রথা ও পদ্ধতি বিলোপ করে প্রণীত শিক্ষানীতির ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দের দায়িত্ব স্ব–স্ব মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৫৩. অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত জটিল ও ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক সম্পর্ক পরিবর্তন করে এবং শিক্ষাপ্রশাসন কার্যক্রম আরও গতিশীল করার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। সেজন্য অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগে রূপান্তর করতে হবে। অধিদপ্তর প্রধান সরাসরি মন্ত্রী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন।

৩.৫৪. বর্তমানে প্রচলিত জটিল ও দীর্ঘসূত্রিতাপূর্ণ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তি এবং পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষকের বাছাই ও নিয়োগ প্রদান পদ্ধতি বাতিল করে প্রস্তাবিত বিভাগের আওতায় গঠিত একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ডের মাধ্যমে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন প্রয়োজনের নিরিখে শিক্ষকের জন্য সুষ্ঠু নিয়োগ ও পদোন্নতিবিধি প্রণয়ন করতে হবে।

৩.৫৫. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলি যথা দাপ্তরিক, হিসাব, নিরাপত্তা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, কেনাকাটা ইত্যাদি কার্যসম্পাদনের জন্য একজন উপাধ্যক্ষ এবং শিক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ডের জন্য অন্য একজন উপাধ্যক্ষ মোট দুজন উপাধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৫৬. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা কাউন্সিল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের জন্য ব্যক্তি, সংস্থা, এনজিও বা প্রাইভেট উদ্যোগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য এককালীন আর্থিক অনুদান, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, পরামর্শ এবং শিক্ষক কর্মচারীর সম্পূর্ণ বা আংশিক বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

অধ্যায়—৭

মাদ্‌রাসা শিক্ষা

১. ভূমিকা

মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি দিক রয়েছে—একটি চিরন্তন অন্যটি পরিবর্তনশীল। প্রথমটি আল–কুরআন ও আল–হাদিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি শরীয়তে নিহিত। দ্বিতীয়টি অপরাপর জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত — স্থান ও কালভেদে এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা সম্ভবপর। মাদ্‌রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা এবং জাগতিক শিক্ষাকে পৃথকরূপে না ভেবে বরং দুটিকে পরস্পরের পরিপূরক রূপে দেখা হয়।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১. মাদ্‌রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক বিষয়ে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন করা। শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসূল (স)–এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।

২.২ মাদ্‌রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ইসলামের যথার্থ সেবক ও রক্ষকরূপে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা। তাদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মূলনীতিকে ভাল করে জানে, সে অনুসারে সুদৃঢ় নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ও তার উন্নয়ন বিধানে উদ্যোগী হয়।

৩. সুপারিশ

৩.১. বর্তমানে মাদ্‌রাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজার রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার যাতে এ শিক্ষাব্যবস্থা নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

৩.২ বর্তমানে বাংলাদেশে ইবতেদায়ি পাঁচ বছর, দাখিল পাঁচ বছর, আলিম দুই বছর, ফাযিল দুই বছর ও কামিল দুই বছর মেয়াদি। একে পুনর্বিন্যাস করে ইবতেদায়ি আট বছর, দাখিল দুই বছর, আলিম দুই বছর, ফাযিল তিন বছর/চার বছর, কামিল দুই/এক বছর মেয়াদি করতে হবে।

৩.৩. সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্‌রাসা শিক্ষা ধারায়ও নারী শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধা নিশ্চিত করাতে হবে। নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।

৩.৪. মাদ্‌রাসা শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা, তবে ক্ষেত্রবিশেষে আরবি ভাষাও ব্যবহৃত হতে পারে।

৩.৫. সাধারণ শিক্ষা ধারায় অনুসৃত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা ধারায়ও অনুসরণ করতে হবে।

৩.৬. সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সমভাবে উন্মুক্ত রাখা হবে। এই উদ্দেশ্যে গাজীপুরে স্থাপিত মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কলেজ/ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।

৩.৭. মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীগণ দেশে ও বিদেশে নিয়োগক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নির্বাচিত মাদ্‌রাসাগুলোর জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ন্যায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৮. সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ,বৃত্তিদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৯. মাদ্‌রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ি, দাখিল ও আলিম স্তরে স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, পরিদর্শন, সনদ প্রদান ইত্যাদি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনের নিরিখে পুনর্গঠন করে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে।

৩.১০. মাদ্‌রাসা শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ শিক্ষার সর্বস্তরে একাডেমিক পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাদ্‌রাসা শিক্ষা সুচারুরূপে পরিচালনার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে মাদরাসা শিক্ষার জন্য পৃথক পরিচালক (মাদ্‌রাসা)–এর পদ থাকবে। মাদ্‌রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায় তত্ত্বাবধানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা স্থাপন করা হবে। তবে মাদ্‌রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে এবং সাধারণ শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের মধ্যে মানের সমতা নির্ণয়ের দায়িত্ব থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের।

৪. বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের বিষয়

৪.১ ইবতেদায়ি (প্রাথমিক) স্তর

এই স্তরে বাংলা, আরবি, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ পরিচিত—বিজ্ঞান, পরিবেশ পরিচিত—সমাজ, আল–কুরআন, আল–হাদিস, ফিক্‌হ ও আকাইদ এবং শারীরিক শিক্ষা পাঠ্যসূচির আওতাভুক্ত থাকবে।

৪.২ দাখিল বিজ্ঞান শাখা

বাংলা, ইংরেজি, গণিত, আল–কুরআন, আল–হাদিস, আরবি, ফিক্‌হ ও আকাইদ আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠ্য থাকবে। অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়—পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞানসহ আবশ্যিক জীববিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিত থেকে যে কোন একটি নিয়ে মোট তিনটি বিষয় নিতে হবে। কম্পিউটার বিজ্ঞান, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, হিসাব বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ বিদ্যা, গার্মেন্টস ও অটোসার্ভিস, উচ্চতর গণিত, জীববিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস, উচ্চতর ইংরেজি, উর্দু, ফারসি, ইসলামি জীবন পদ্ধতি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান থেকে যে কোন একটি ঐচ্ছিক হিসেবে নেওয়া যাবে। কোন বিষয় একাধিকবার গ্রহণ করা যাবে না।

৪.৩. দাখিল মানবিক শাখা

বাংলা, ইংরেজি, গণিত, আল–কুরআন ও আরবি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে থাকবে। আল–হাদিস, ফিক্‌হ ও আকাইদসহ ইসলামের ইতিহাস ও সাধারণ বিজ্ঞান থেকে যেকোন একটি নিয়ে মোট তিনটি বিষয় আবশ্যিক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া প্রযুক্তি থেকে যে কোন একটি, উচ্চতর ইংরেজি, উর্দু, ফারসি, তাজবিদ, উচ্চতর গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান, পৌরনীতি, ইসলামের ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল, মানতেক–এর মধ্য থেকে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

৪.৪. দাখিল ভোকেশনাল শাখা

বাংলা, ইংরেজি, গণিত, আল–কুরআন ও আরবি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে থাকবে। আল–হাদিস, ফিক্‌হ ও আকাইদসহ সাধারণ বিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস থেকে যে কোন একটি নিয়ে মোট তিনটি বিষয় নিতে হবে। এ্যাকোয়াকালচার, এগ্রো–বেজ্‌ফুড, ডেয়ারি, ফার্মমেশিনারি, ফ্লোরিকালচার, হর্টিকালচার, মিল্ক এন্ড মিল্ক প্রোডাক্টস্‌, পোলট্রি, আর্মেচার ওয়েল্ডিং, অটোমোটিভ, কেবল জয়েন্টার, কার্পেন্ট্রি, সিরামিক্স, সিভিল

কন্সট্রাকশন (মেসনারি), ড্রাফটিং (সিভিল), ড্রাফটিং (মেকানিক্যাল), ইলেকট্রিক্যাল লাইনম্যান, ফাউন্ড্রি, জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান, জেনারেল মেকানিক্স, হাউজ ওয়্যারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রিশিয়ান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স, মেশিনিস্ট, প্যাটার্ন মেকিং, প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং, রেডিও এন্ড টিভি, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং (ডোমেস্টিক), রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং (ইন্ডাস্ট্রিয়াল), টার্নার, ওয়েল্ডিং, কম্পিউটার মেকানিক্স, ফুট ওয়্যার, লেদার টোনিং, কুকিং, ড্রাইভিং, ফুড প্রসেসিং এন্ড প্রিজার্ভেশন, হেয়ার ড্রেসিং, পেইন্টার, সেলসম্যানশিপ, ড্রেস মেকিং, ডাইং প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং, গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং, নিটিং, স্পিনিং, উইভিং, ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং, ফরেস্ট্রি, প্রিন্টিং, সেরিকালচার ইত্যাদি বৃত্তিমূলক ট্রেডসমূহ থেকে যে কোন একটি বিষয় নৈর্বাচনিক আবশ্যিক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৪.৫ আলিম বিজ্ঞান শাখা

বাংলা, ইংরেজি, আল–কুরআন ও আল–হাদিস আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞানসহ জীববিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিত থেকে যে কোন একটি নিয়ে মোট তিনটি বিষয় নিতে হবে। আরবি, ইসলামের ইতিহাস, কম্পিউটার বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, উচ্চতর বাংলা, ভূগোল ও অর্থনীতি, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় থেকে যে কোন একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। তবে একই বিষয় বার বার নেওয়া যাবে না।

৪.৬. আলিম মানবিক শাখা

বাংলা, আরবি, ইংরেজি, আল–কুরআন ও আল–হাদিস, ফিক্হ ও আকাইদ, ইসলামের ইতিহাস আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। উচ্চতর বাংলা, উচ্চতর ইংরেজি, উর্দু, ফারসি, তাজবিদ, পৌরনীতি, ইসলামি অর্থনীতি, কম্পিউটার বিজ্ঞান, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান বিষয় থেকে যে কোন একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নেওয়া যাবে।

৪.৭. আলিম ব্যবসায় শাখা

বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আলিম স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা চালু নেই। তবে এই শাখাটি চালু করা হবে। এই শাখায় বাংলা, ইংরেজি, আরবি, আল–কুরআন, আল–হাদিস, ফিক্হ ও আকাইদ, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ/হিসাব বিজ্ঞান আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নিতে হবে। অর্থায়ন, উৎপাদন ও বিপণন, অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল, গণিত, পরিসংখ্যান, কৃষি শিক্ষা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা, ফিক্হ ও আকাইদ, তাজবিদ, ইসলামি জীবন পদ্ধতি থেকে যে কোন একটি ঐচ্ছিক হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

৫. আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় কওমি/খারেজি মাদ্রাসা নামে আরও একটি ধারা রয়েছে। এ মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে ভিন্ন। তবে এ শিক্ষাধারায়ও প্রচুর সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করছে।

অধ্যায়—৮

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

১. ভূমিকা

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম উপায়। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবনে ও সমাজে নৈতিকতা প্রয়োগের মানসিকতা ও চরিত্র গঠন। শিক্ষার্থী নিজ নিজ ধর্মের এবং অন্য ধর্মেরও মূল বিষয়গুলো জানবে, নিজ ধর্মের আচার অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে এবং পরমতসহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, জীবসেবা প্রভৃতি বৃত্তি ও গুণাবলিতে বিভূষিত হবে। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সেই লক্ষ্যে প্রদান করা হবে।

২. ইসলাম শিক্ষা

২.১. ইসলামি বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হলে প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য ইসলাম শিক্ষা গ্রহণ এবং স্বীয় জীবনে তা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। তাই ইসলাম শিক্ষাকে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২.৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের আল্লাহতায়ালার প্রিয় বান্দাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (স)–র সত্যিকার অনুসারী উম্মত এবং সমাজের যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে সৎ ও চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিক তথা মহৎ-মানুষরূপে গড়ে তোলায় সাহায্য করাই ইসলাম শিক্ষার মূল লক্ষ্য। উপরোক্ত মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ইসলাম শিক্ষার নিম্নেবর্ণিত সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

২.৩.১ শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং আল্লাহতায়ালার একত্ববাদ ও গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।

নবী-রাসূল, আখিরাত ও ফেরেশ্‌তাগণের সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা। কুরআন মজীদের সঙ্গে পরিচিত করা, কুরআন মজীদ শুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া, ইবাদত সম্পর্কীয় হুকুম আহকামের জ্ঞান দান করা এবং তা পালন করতে অভ্যস্ত করা।

২.৩.২ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সহানুভূতি ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা, কায়িক শ্রমের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তোলা।

২.৪ সুপারিশ

২.৪.১ শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অনুসারে ইসলাম শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক যথার্থভাবে প্রণয়ন করতে হবে। আল্লাহতায়ালার সিফাত ও গুণাবলি, রাসূল, কিতাব, আখিরাত, কবর, মীযান, কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়গুলো বিভিন্ন শ্রেণীতে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ–এর তাৎপর্য বর্ণনাসহ যথার্থভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৪.২ ইসলাম শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি ও বিষয়বস্তু কেন্দ্র করে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করতে হবে। স্তরভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে। এরই আলোকে পাঠ্যসূচি, পাঠ্যসূচির পরিসর ও পরিকল্পিত কাজ নির্ণয় করতে হবে।

২৪.৩ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনা, শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নির্দেশনা চিহ্নিত করতে হবে। উদ্দেশ্যের আলোকেই শিখনফল, শিক্ষকের কাজ ও শিক্ষার্থীর কাজ নির্দিষ্ট করতে হবে। এরই ভিত্তিতে শিখন শেখানোর কার্যাবলি, শিক্ষা উপকরণ, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর জন্য শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. হিন্দু ধর্ম শিক্ষা

৩.১ হিন্দু ধর্ম শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর (দশম শ্রেণী) পর্যন্ত প্রদান করা হয়। হিন্দু ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ হিন্দু ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণের মাধ্যমে মাধ্যমিক কোর্সে (এসএসসি প্রোগ্রাম) ধর্ম শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সি এড কোর্সের প্রবর্তন করেছে। উক্ত কোর্সে হিন্দু ধর্ম শিক্ষা কোর্সও প্রবর্তিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে প্রদত্ত সি এড কোর্সেও হিন্দু ধর্ম শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত আছে।

৩.২ ধর্ম শিক্ষার জন্য ধর্মীয় ভাষা সংস্কৃত ও ধর্মীয় বিষয়াদি পঠন পাঠনের ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি বোর্ড উক্ত বিষয়সমূহে তিন বছর মেয়াদি কোর্স (প্রথম বর্ষ আদ্য,. দ্বিতীয় বর্ষ মধ্য, তৃতীয় বর্ষ উপাধি) পরিচালনা করে। ১৫টি কোর্সের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা, পৌরোহিত্য, স্মৃতি (হিন্দু আইন) প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

৩.৩ এছাড়া সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত রূপে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পঠন পাঠনের ব্যবস্থায় ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে উচ্চ শিক্ষা স্তর পর্যন্ত পড়ানো হয়ে থাকে।

৩.৪ বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১১০টি টোল চতুষ্পাঠী ও কলেজ আছে। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এসএসসি বা তদূর্ধ্ব শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ভর্তি হওয়ার যোগ্য। তিন বছর মেয়াদি কোর্স গ্রহণ করলে তীর্থ উপাধি দেওয়া হয়। প্রতি বিষয়ে আলাদা আলাদা করে উপাধি দেওয়া হয়। যেমন ব্যাকরণে ব্যাকরণতীর্থ, এরূপ স্মৃতিতীর্থ, কাব্যতীর্থ ইত্যাদি। প্রতিটি বিষয়ের জন্যই পৃথক পৃথকভাবে আদ্য, মধ্য, উপাধি এই তিন বছর অধ্যয়ন করে কোর্স সমাপ্ত করতে হয়। তবে সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মীয় বিষয়াদি ছাড়া বাংলা ইংরেজি প্রভৃতি সাধারণ বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা উক্ত কোর্সে নেই। উপাধিটি একটি ডিপ্লোমার অনুরূপ।

৩.৫ বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি বোর্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বায়ত্তশাসিত নয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদাধিকার বলে বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি বোর্ডের সভাপতি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একটি পরিচালনা পরিষদ বোর্ডের কার্যাদি পরিচালনা করে। পরিষদের একজন অবৈতনিক সদস্য সচিব মনোনীত হন।

৩.৬ টোল–চতুষ্পাঠী ও সংস্কৃত কলেজগুলোতে ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও সংস্কৃত কাব্য, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি পড়ানো হয়। প্রতিটি টোল চতুষ্পাঠীতে একজন অধ্যক্ষসহ তিনজন শিক্ষকের পদ রয়েছে। একটি চতুর্থ শ্রেণীর পদ রয়েছে। অফিসের কাজ নির্বাহ করার জন্য কোন করণিক বা হিসাবরক্ষক ইত্যাদি পদ নেই। শিক্ষকরা এক বা একাধিক তীর্থ (উপাধি) ধারী। বেশির ভাগ শিক্ষকের সাধারণ শিক্ষাও (এসএস সি থেকে এম এ পর্যন্ত) রয়েছে। সংস্কৃত টোল চতুষ্পাঠী ও কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের কোন বেতনক্রম নেই। তাঁরা ৩০% মহার্ঘ ভাতাসহ মোট ১৪৯ টাকা ৫০ পয়সা ভাতা পান মাত্র। তাঁদের ছাত্ররাই পরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধর্ম/ক্লাসিকাল শিক্ষক হিসেবে বেতন স্কেলের আওতায় বেতন পান। কিন্তু এদের জন্য ১৯৪৭ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত কোন বেতন স্কেল নির্ধারণ করা হয় নি। একজন কর্মচারীর বেতন ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা + ৩০% মহার্ঘ ভাতা।

৩.৭ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্কৃত ও হিন্দুধর্ম শিক্ষায়ও শিক্ষকের ব্যবস্থা অপ্রতুল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলেও বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিন্দুধর্ম শিক্ষা দানের ব্যবস্থা নেই, সংস্কৃত ভাষা পড়ানো হয় না এবং শিক্ষকের পদ নেই। এ কারণে এসএস সি পরীক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম শিক্ষার বিকল্প হিসেবে ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে হিন্দুধর্ম শিক্ষার বিষয়টি আর বাধ্যতামূলক না থেকে কার্যত ঐচ্ছিক হয়ে গেছে। ধর্মশিক্ষা কোন সম্প্রদায়ের জন্য বাধ্যতামূলক, কোন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও শিক্ষকের ব্যবস্থা না রেখে ঐচ্ছিক বিষয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া বৈষম্যমূলক এবং গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থি।

৩.৮ মাধ্যমিক স্কুলের ধর্মশিক্ষক/সংস্কৃত শিক্ষকদের তীর্থ উপাধির মূল্য দেওয়া হচ্ছে না এবং তাঁরা নিজেও তাঁদের সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে বেতন পাচ্ছেন না। এ বিষয়ে তীর্থ উপাধির বিষয়ে সমতা নিরূপণ করার জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে সুপারিশ করার অনুরোধ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানান হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন উক্ত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করেছে।

৪. বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

৪.১ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও বৌদ্ধদের ধর্মীয় ভাষা পালি শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা হিন্দুধর্ম শিক্ষা ও পালি শিক্ষার প্রায় অনুরূপ। পালিতে তিন বছর মেয়াদি উপাধি কোর্স আছে এবং তীর্থের পরিবর্তে পালিতে বিশারদ উপাধি দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড সনাতন পদ্ধতির পালি শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে সারাদেশে পালি টোলের সংখ্যা ১০০টি।

৫. হিন্দুধর্ম শিক্ষা তথা সংস্কৃত শিক্ষা এবং বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা তথা পালি শিক্ষার সুপারিশ

৫.১ সাধারণ শিক্ষার একটি অভিন্ন ধারা থাকবে এবং সেখানে শিক্ষার্থীর নিজধর্ম শিক্ষা, ধর্মীয় ভাষা শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। সকল ধর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক ও কোর্সের ব্যবস্থাসহ সমান ব্যবস্থা ও সুযোগ থাকবে।

৫.২ বিভিন্ন শিক্ষাস্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

৫.২.১ প্রাক-প্রাথমিক স্তর

প্রাক–প্রাথমিক স্তরে মৌলিকভাবে সকল ধর্মের নৈতিক উপাখ্যান, সততা, গুরুজনকে ভক্তি করা, মানুষকে ভালবাসা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে মুখে মুখে পাঠদান করা হবে। শিক্ষার্থীরা শুধু শুনবেই না নিজেরা বলবেও। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাষার কারণে ভিন্ন ভিন্ন নামে থাকলেও সৃষ্টিকর্তা একজনই, এ কথা এ স্তরের শিক্ষার্থীরা জানবে। বিভিন্ন ধর্মের আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কেও একেবারেই প্রাথমিক বা পরিচয়মূলক জ্ঞান তারা অর্জন করবে।

৫.২.২ প্রাথমিক শিক্ষা স্তর

অষ্টম শ্রেণী বা প্রস্তাবিত প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত সকল ধর্মের নৈতিক শিক্ষাভিত্তিক তত্ত্ব ও উপাখ্যান সন্নিবেশিত হবে। এ স্তরে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধর্মের আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কেও জানবে।

৫.২.৩ মাধ্যমিক স্তর (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী)

নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্মদর্শন, ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মীয় উপাখ্যান মহাপুরুষদের জীবনী, নিজ নিজ ধর্মীয় ভাষা ও সকল ধর্মের নৈতিক উপাখ্যান সংবলিত নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে।

৫.২.৪ পত্র ও মান বণ্টন

নবম/দশম শ্রেণী একটি পত্র, ১০০ নম্বর।

নিজ নিজ ধর্ম ৪০ + ধর্মীয় ভাষা ৪০ (আরবি/সংস্কৃত/পালি যা প্রযোজ্য) + নৈতিক শিক্ষা ২০ = ১০০

৫.২.৫ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ইসলামি শিক্ষার ন্যায় ঐচ্ছিক বিষয়রূপে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিস্টানধর্মের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে পারে।

৫.২.৬ ডিগ্রি ও মাস্টার্স

ডিগ্রি ও মাস্টার্স স্তরে ইসলামি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অনুরূপ ব্যবস্থা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের জন্যও প্রবর্তন করতে হবে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিয়ন্ত্রণকারী বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি ও মাস্টার্স স্তরের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৬. হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় ভাষা সংস্কৃত ও পালি ভাষা শিক্ষা

কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে 'টোলশিক্ষা' শিরোনামে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষার উল্লেখ আছে। সেখানে তথ্যচিত্র তুলে ধরে সংস্কৃত ও পালি তথা ধর্মশিক্ষার বিষয়গুলোর সঙ্গে বাংলা, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইংরেজি এ চারটি বিষয় যোগ করে সনাতন পদ্ধতির সংস্কৃত ও পালি শিক্ষার সংস্কারের প্রস্তাব ছিল। এ ধরনের সংস্কার মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধিত হলেও সংস্কৃত ও পালি শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন সংস্কার সাধিত হয় নি।

সংস্কৃত ও পালি শিক্ষার বিষয়ে সুপারিশ

৬.১ আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্কৃত ও পালি শিক্ষার ব্যবস্থা প্রাথমিক স্তরে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম এই তিন শ্রেণীতে থাকবে।

৬.২ নবম ও দশম শ্রেণীতে ধর্মশিক্ষার অতিরিক্ত সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য বিষয়ে ১০০ নম্বরের একটি করে পত্র থাকবে।

৬.৩ ডিগ্রি স্তরে সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃত ও পালি ভাষা শিক্ষার প্রতি আরও গুরুত্ব প্রদান করে শিক্ষাক্রমে সে ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬.৪ বাংলা ভাষার পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে সংস্কৃত পালি ও প্রাকৃত ভাষার গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং সে ভাবে তার পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ডিগ্রি ও বাংলা অনার্স কোর্সে রাখা যেতে পারে।

৬.৫ টোলসমূহ সনাতন পদ্ধতির সংস্কৃত/পালি শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃত/পালিকে আবশ্যিক রেখে বাংলা, ইংরেজি ইত্যাদি বিষয় যোগ করে ঢেলে সাজাতে হবে।

৬.৬ আদ্য মধ্য উপাধি কোর্সটিকে প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ অব্যাহত রাখতে হবে।

৬.৭ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশের আলোকে প্রচলিত সনাতন পদ্ধতির সার্টিফিকেটের সমতা বিধান করতে হবে।

৬.৮ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডকে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত বোর্ডে রূপান্তর করতে হবে।

৭. খ্রিস্টধর্ম

৭.১ প্রাক–প্রাথমিক স্তর ও প্রাথমিক স্তরে থাকবে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা।

৭.২ মাধ্যমিক স্তরে থাকবে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার ১০০ নম্বরের একটি পত্র। মানবণ্টন বাইবেল ৫০ + চার্চ বিষয়ক শিক্ষা ২৫ + নৈতিক শিক্ষা ২৫ = ১০০।

৭.৩ বিকল্প : দশম শ্রেণী পর্যন্ত

খ্রিস্ট ধর্ম ৪০ + সংস্কৃত/পালি/আরবি ৪০ + নৈতিক শিক্ষা ২০ = ১০০।

একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার (ধর্ম ৫০ + নৈতিক শিক্ষা ৫০) ব্যবস্থা থাকতে পারে।

৭.৪ প্রচলিত খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার বিষয়, ডিগ্রি স্তর প্রভৃতির মূল্যায়ন করে সমতা নিরূপণ করতে হবে এবং উপযুক্ত স্বীকৃতি দিতে হবে।

৮. ধর্মশিক্ষার সুযোগ, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক প্রসঙ্গ

৮.১ ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য সমান সুযোগ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াবার ব্যবস্থা বিভাগ বা শিক্ষক না থাকার কারণে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে নির্ধারিত ধর্মশিক্ষার বিকল্প হিসেবে অন্য কোন বিষয় পড়ানোর প্রচলিত রীতির পরিবর্তন করতে হবে। বাধ্যতামূলক বিষয়ের শিক্ষক অবশ্যই রাখতে হবে।

৮.২ সংস্কৃত/পালি/টোল চতুষ্পাঠী ও সংস্কৃত/পালি কলেজগুলোতে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, কর্মকর্তা কর্মচারীর প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করতে হবে। ভাতা প্রদান প্রথা বন্ধ করে উপযুক্ত বেতন স্কেলের আওতায় আনতে হবে এবং বেসরকারি স্কুল/কলেজের অনুরূপ অনুদান সরকারকর্তৃক প্রদান করতে হবে।

৮.৩ বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসিত বোর্ডে রূপান্তরিত করতে হবে। চেয়ারম্যান, সচিব, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, পরিদর্শক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি/রূপান্তরিত করতে হবে।

৮.৪ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে বর্তমানে কর্মরত হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম তথা সংস্কৃত/পালি শিক্ষকদের তীর্থ বিশারদ উপাধি এবং তাঁদের সাধারণ শিক্ষার সার্টিফিকেট/ডিগ্রি বিবেচনা করে সমতাবিধানের যে সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন করেছে তা বিবেচনা করতে হবে।

৮.৫. সংস্কৃত ও পালি শিক্ষার সংস্কার আধুনিকীকরণ ও সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পরিকল্পনা, অর্থ, শিক্ষা ও আইন মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, সংস্কৃত ও পালি বোর্ড, যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পঠন পাঠনের ব্যবস্থা আছে সেগুলো থেকে কমপক্ষে দুজন প্রতিনিধি, সংস্কৃত টোল চতুষ্পাঠী সংস্কৃত কলেজ/মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অধ্যায়—৯

উচ্চ শিক্ষা

১. ভূমিকা

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমগ্র দেশের জন্য উন্নয়ন ও কল্যাণ বহনকারী ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী একটি অভিন্ন নীতি প্রণয়ন করা একান্ত জরুরি। উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য হবে জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলা। উচ্চ শিক্ষার সমস্ত আয়োজনকে অবধারণ করতে হবে কিছুটা ইতিহাসের দৃষ্টিতে, এর ক্রমবিকাশের ধারায়, আন্তর্জাতিক পটভূমিতে এবং সেই সঙ্গে দেশের সমস্যা ও বাস্তবতার নিরিখে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি প্রয়োজন জ্ঞানের সঞ্চয় ও জ্ঞানতত্ত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলোর জন্য স্বাধীনতা ও স্ব–শাসনের অধিকার অপরিহার্য। বর্তমানে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানসাধনায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের সাধনার ক্ষেত্রকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করছেন আপন বিষয়ে গভীরতা অর্জনের প্রয়োজনে। ফলে বিভাজন ঘটছে জ্ঞানের জগতে। অন্যদিকে একটি বিপরীত প্রক্রিয়াও চলছে এবং তা হল জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার বৃদ্ধি এবং এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিজ্ঞান পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে অভিনব উপলব্ধি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই জ্ঞানের জগতে সকল বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি অতিক্রম করে একটি সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এরই আলোকে বর্তমানে প্রচলিত উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন দেশের সম্পূর্ণ প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস আবশ্যক।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১ নিরলস জ্ঞানচর্চা ও নিত্যনতুন বহুমুখী গবেষণার ভেতর দিয়ে জ্ঞানের দিগন্তের ক্রমসম্প্রসারণ।

২.২ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানে যোগ্য নাগরিক সৃষ্টি।

২.৩ দেশের অদক্ষ ও স্থবির জনসংখ্যাকে এই যুগের রাষ্ট্র ও সমাজের উপযোগী কর্মচঞ্চল জনসম্পদে রূপান্তরিত করা।

২.৪ উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য উচ্চ শিক্ষার জন্য নীতি হবে—

২.৪.১ সর্বৈব ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী।

২.৪.২ অবাধ বুদ্ধিচর্চা, মননশীলতা ও চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশে সহায়তাদানকারী ও নিশ্চয়তাদানকারী।

২.৪.৩ সম্পূর্ণ সমাজমুখী অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যা সনাক্তকরণে সচেষ্ট ও সমাধান প্রয়োগে উপযুক্ত।

২.৪.৪ আধুনিক ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের উন্নয়ন ও প্রগতির অনুষঙ্গী।

২.৪.৫ উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সমাজের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে একে সমাজ সংযুক্তকরণে প্রতিশ্রুত।

২.৪.৬ শিক্ষকতা ও গবেষণার মান উন্নত করতে সমর্থ এমন ব্যবস্থা।

৩. উচ্চ শিক্ষার জন্য যোগ্যতা নিরূপণ

মাধ্যমিক (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর) শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করার পর ছাত্র/ছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করবে। এ ক্ষেত্রে মেধাগত সমতা নিশ্চিত করার জন্য মাদ্‌রাসা শিক্ষাসহ সকল ধরনের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমকে অবশ্যই সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষাক্রমের সমমান হতে হবে। এই প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার কারণ হল ইতিপূর্বে সমমান নির্ণয়করণ যেভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে, তা যুক্তিসিদ্ধ ও উচ্চশিক্ষার মান অক্ষুণ্ন রাখার সহায়ক বলে মনে হয় না। এ জন্য ন্যায্যতার বিবেচনায় সমমান নির্ণয়করণ কমিটির সিদ্ধান্ত পুনর্বার পর্যালোচিত ও সংশোধিত হওয়া বিধেয়।

শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে পারে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন—বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ও কলেজে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হবে। শিক্ষার্থীর মেধা, আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করবে। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও নারী–পুরুষ নির্বিশেষে মেধাই হবে উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রধান শর্ত। কোটা পদ্ধতি বা অন্য কোন কারণে যোগ্যতার শর্ত শিথিল করা হবে না।

৪. উচ্চ শিক্ষার মান

উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বপ্রকার যত্ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নকামী দেশসমূহের তুলনায় আমাদের উচ্চ শিক্ষার সুনির্দিষ্ট মান যতদিন না অর্জিত হচ্ছে, ততদিন দেশের সরকার এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় সামর্থ্য ও সম্পদের সরবরাহ অব্যাহত রাখবে বলে আশা ব্যক্ত করা হচ্ছে। জাতীয় স্বার্থেই শিক্ষকদের শিক্ষকতা ও গবেষণার মান সন্তোষজনক হতে হবে। শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যোগ্যতাই হবে একমাত্র মাপকাঠি। আধুনিক শিক্ষার উপকরণ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে। শিক্ষকতার মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের অবশ্যই গবেষণায় নিযুক্ত থাকতে হবে এবং কার্যকর গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষকদের পদোন্নতি সরাসরি তাঁদের ফলপ্রসূ গবেষণাকর্ম ও নিরলস চর্চার মাধ্যমে শিক্ষকতার বাস্তব মান বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হবে।

৫. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে চার বছরের সমন্বিত ডিগ্রি কোর্স ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ানো হবে। অন্যদিকে সাধারণ কলেজগুলোতে তিন বছরের সমন্বিত ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হবে। যে সকল কলেজে শিক্ষার মান উন্নত সে সকল কলেজে চার বছরের সমন্বিত ডিগ্রি কোর্স ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে। এই সকল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বলা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো জেলা সদরে অবস্থিত হবে।

সাধারণ কলেজ পর্যায়ে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু থাকবে। অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে একজন শিক্ষার্থী তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে পারবে এবং এই কোর্সের সফল সমাপ্তিতে তাকে তিন বছরের স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হবে। যারা এই ডিগ্রি কোর্সে অধ্যয়ন এবং এই কোর্স সফলভাবে সমাপ্ত করবে মেধা অনুযায়ী বাছাইয়ের পর তাদের দুই বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ার সুযোগ থাকবে। ডিগ্রি ও মাস্টার্স কোর্সের বেলায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র একই মানের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হবে। এই পাঠ্যসূচি হবে এক ও অভিন্ন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই কোর্স ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করবে।

ডিগ্রি ও মাস্টার্স পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতিতে মান নির্ণীত হবে। যারা ডিগ্রি পর্যায়ের পরীক্ষায় A পাবে তাদের 'অনার্স' গ্র্যাজুয়েট বলা হবে। কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের ইংরেজি ভাষা বিষয় সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে। ইংরেজিতে প্রথমবারের জন্য অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা পরবর্তীকালে সর্বাধিক দু বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ লাভ করবে।

৬. এমফিল, পিএইচডি

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ এমফিল কোর্স দু বছরের হবে। তন্মধ্যে এক বছর কোর্স ওয়ার্ক ও এক বছর গবেষণা কর্ম। তবে যারা কোর্স ওয়ার্কে ন্যূনতম B + পাবে তারা ইচ্ছা করলে পিএইচডিতে ট্রান্সফার নিতে পারবে। কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তিন বছর শিক্ষকতা সম্পন্ন করার পর সরাসরি পিএইচডিতে ভর্তি

হতে পারবেন। সর্বমোট তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পিএইচডি কোর্স শেষ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমফিল ও পিএইচডি গবেষণার ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে Centre of Excellence প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এই সকল কেন্দ্রে প্রধানত এমফিল/ পিএইচডি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা হবে।

৭. গবেষণা

গবেষণার মাধ্যমে শুধু জ্ঞানের পরিধি বর্ধিত হয় না বরং শিক্ষাদান কার্যেও দক্ষতা জন্মে। প্রধানত গবেষণার মাধ্যমেই শিক্ষকমণ্ডলী তাঁদের মানসিক সজীবতা, কর্মতৎপরতা এবং শিক্ষাদানে প্রায়োগিক দক্ষতা বজায় রাখতে পারেন। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ডিগ্রি কলেজগুলোতে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। গবেষণার কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে একযোগে অংশগ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রধান কাজ হবে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি এবং তা সম্ভব হবে মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে। মৌলিক গবেষণার গুরুত্ব অক্ষুণ্ন রেখে গবেষণার বিষয়বস্তু যথাসম্ভব দেশের বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একই বিষয়ে গবেষণাক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধীত প্রত্যেক বিষয় ও ক্ষেত্রের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে, তবু প্রয়োজনবোধে বিশেষ কোন ক্ষেত্র বা বিষয়ের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রদের গবেষণার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চ মূল্যের গবেষণা ও ফেলোশিপের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

উচ্চ শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের। নতুন নতুন জ্ঞান উদ্ভাবন ও তার যথাযথ প্রয়োগও উচ্চ শিক্ষার অঙ্গ বলেই বিবেচিত হবে। উচ্চ শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষা ছাড়াও দ্বিতীয় একটি বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। যাঁরা শিক্ষকতা, গবেষণা ও নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হবেন তাঁদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। অন্যদিকে একথাও সত্য যে, শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রচলন বাধ্যতামূলক করা বাঞ্ছনীয় এবং তা ইতোমধ্যে করাও হয়েছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যত যে ফাঁক ও ফাঁকি থেকে যাচ্ছে তা লক্ষ করা হচ্ছে না। পঠন–পাঠন, অধ্যয়ন ও জ্ঞানচর্চার জন্য অতীত ও বর্তমানের যে জ্ঞানভাণ্ডার আমরা উচ্চ শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে চাইছি, বাস্তবত তার প্রায় সবটাই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। বোধগম্য, সৃজনশীল, গতিশীল এবং নিজ প্রবহমান বাংলা ভাষান্তরণের মধ্য দিয়ে এই জ্ঞানভাণ্ডারকে শিক্ষার্থীদের আয়ত্তের মধ্যে এখনও সন্তোষজনকভাবে আনা যায় নি। শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রচলনের কোন বিকল্প নেই এবং সেই কারণেই ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যবহারযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা বাংলা ভাষায় ভাষান্তরণ এবং মাতৃভাষায় মৌলিক গ্রন্থ রচনা একটি জাতীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। এই কাজকে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গণ্য করে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। তবে যেহেতু জ্ঞানের রাজ্যে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এত তাড়াতাড়ি হচ্ছে যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা ভাষায় বই বা সাময়িকী অনুবাদ করা এখনও সম্ভব হচ্ছে না, তাই সাময়িকভাবে হলেও প্রয়োজনবোধে ইংরেজিতে পড়ান ও প্রশ্নোত্তর লেখা চালু রাখা যেতে পারে।

৯. ভর্তি ফি ও বেতন

উচ্চ শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি অনুদান ছাড়াও শিক্ষার্থীর বেতন, ব্যাংক ঋণ বা ব্যক্তিগত অনুদানের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা মেধার ভিত্তিতে সহজ শর্তে ব্যাংক থেকে যেন ঋণ পেতে পারে সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাছাড়া মেধা ও অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার নিরিখে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃত্তি প্রদান করা হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ভর্তি ফি ও বেতন খুবই সামান্য। অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার প্রত্যয়ন পত্রের মাধ্যমে বেতন নির্ধারণ করা হবে। এতে অসচ্ছল অভিভাবক ও

ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকদেরকেও সন্তোষজনক বেতন ভাতাদি প্রদান করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় যে দায়িত্ব পালন করছে তার সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রদত্ত মূল দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বের কথা স্মরণ রেখে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়। তবে, এ ধারণার সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভিন্নমত পোষণ করেন। প্রয়োজনবোধে এর একাধিক শাখা থাকতে পারে।*

১১. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য কুদরাত–এ–খুদা কমিশন যে রিপোর্ট প্রদান করেছে তাতে একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুরে স্থাপিত হয়। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও শিক্ষার মান সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমমানের হতে হবে। তবে, যেহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ইত্যাদি ভিন্ন সেজন্য বয়সসীমার কোন বাধ্যবাধকতা এখানে থাকবে না। টেলিভিশনে সুবিধাজনক কোন চ্যানেল—যেমন, দ্বিতীয় চ্যানেলে অধিকতর সময়, রেডিও ট্রান্সমিশন, মাল্টি ইনফরমেশন সিস্টেম, ইন্টারনেট সিস্টেম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চালু করা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের বিকাশমান অর্থনীতিতে বস্ত্র ও চামড়া খাতের বিপুল গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনা রেখে টেক্সটাইল কলেজ ও কলেজ অব লেদার টেকনোলজিকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১২. গ্রন্থাগার/গবেষণাগার

প্রত্যেক কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে এমন পদ্ধতি চালু করতে হবে যাতে অতি দ্রুত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়। Library Network/Inter Library loan/Internet চালু করতে হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় ও আধুনিক গবেষণাগার থাকা অত্যাবশ্যক।

১৩. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের বাস্তবতা এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন স্বীকার করতে হয়। দেশের ১৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেওয়া আছে। আরও কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এগুলোর সার্বিক কার্যক্রম সম্বন্ধে এখনও বিস্তারিত জানা যায় নি। দেশের উচ্চ শিক্ষার স্বার্থে অনুমোদিত ও প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষাক্রম, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের হতে হবে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয় কোনভাবেই সাম্প্রদায়িক ও বাণিজ্যিকভিত্তিক হতে পারবে না এবং মহান স্বাধীনতা ও

* বি. দ্র. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্ট অনুযায়ী এটি একই সঙ্গে একটি স্নাতকোত্তর এবং অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। অতএব এ পর্যায়ে এর নাম পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়।

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী হতে পারবে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকাণ্ড ও কর্মপরিধি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে দেখার জন্য সরকার একটি Accredition Council প্রতিষ্ঠা করতে পারে।.

যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে হবে।

১৪. উচ্চ শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

একটি উদারনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করতে পারে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কমিশনের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশনের অবদানকে অধিক ফলপ্রসূ এবং সুদূরপ্রসারী করে তোলা সম্ভব। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন ও নেতৃত্ব প্রদান করবে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নের জন্য অব্যাহতভাবে দায়িত্ব পালন করবে এবং ক্রমাগত পর্যালোচনার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার মান যাতে একটি মর্যাদাপূর্ণ আসনে স্থিত হয় তার ব্যবস্থা করবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন এই কমিশনের দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্প, নতুন বিভাগ খোলা, বর্তমান বিভাগের সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নেবে।

অধ্যায়—১০

প্রকৌশল শিক্ষা

১. ভূমিকা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতো বটেই, আমাদের সমাজেও সাধারণ মানুষের জীবনে সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞান এবং তার প্রয়োগ হয়ে পড়েছে একান্ত অপরিহার্য। এর ফলে সামাজিক জীবনযাত্রার পট পরিবর্তন হচ্ছে এবং সমাজ জীবনের কার্যধারাতেও আসছে গতিশীল পরিবর্তন।

প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আজ বিদ্যুৎ সরবরাহ পৌঁছে যাচ্ছে, হাটে গ্রামে গঞ্জে চলছে বিদ্যুৎ চালিত শস্য ও তৈলবীজ মাড়াই কল। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ধান থেকে চাল তৈরির বড় বড় কারখানা গড়ে উঠেছে গ্রামে গঞ্জে। মাঠে-মাঠে ব্যবহৃত হচ্ছে সেচকল, জ্বালানির বিকল্প হিসেবে অনেকক্ষেত্রে চলছে বায়োগ্যাস ও সৌরশক্তির ব্যবহার। গ্রামের তাঁতগুলো বিদ্যুৎ চালিত হচ্ছে। দাঁড়টানা নৌকা যন্ত্রচালিত যানে রূপান্তরিত হচ্ছে। গরুটানা আখ মাড়াই কলে সংযোজিত হচ্ছে ডিজেল ইনজিন। গ্রামগঞ্জের কোল্ড স্টোরেজের সুবাদে মৌসুমী তরিতরকারি এখন সারা বছরব্যাপী বাজারজাত করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত গ্রামেও আজ যোগাযোগের জন্য যন্ত্রচালিত যান ব্যবহৃত হচ্ছে। সেলুলার টেলিফোন এখন গ্রামের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী ব্যবহার করছে তার ব্যবসায়িক কাজে। কাজেই সনাতন প্রযুক্তি থেকে শুরু করে হাইটেক প্রযুক্তি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে আধুনিক উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পসমূহ অতি দ্রুত বাংলাদেশের রফতানি প্রক্রিয়াজাত এলাকা থেকে শুরু করে অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। আধুনিকায়নের সময় বা নতুন শিল্প স্থাপনের সময় হাইটেক আমাদের স্বার্থেই ব্যবহার করতে হচ্ছে, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকার জন্য। এই মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্ববাজারে ভোক্তার দ্রব্য বাছাই ও ব্যবহারের মূল ভিত্তি হচ্ছে সেবাগত উন্নতমান, টেকসই ও কম দাম। যারা এই ক্ষেত্রে কম প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে সৃজনশীলতার মাধ্যমে দ্রব্য ও সেবার সুযোগ বাড়াতে পারবে, উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে পারবে, বিশ্ববাজারে তারাই টিকে থাকবে। এই অবস্থায় আজকের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, বাংলাদেশে প্রযুক্তির বিকাশের লক্ষ্যে নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য প্রকৌশলীদেরকেও গড়ে তুলতে হবে। এই পরিস্থিতিতে ডিগ্রি স্তরে প্রকৌশল শিক্ষার নীতিতে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রকৌশলী তাঁর সৃজনশীলতা, কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা দ্বারা যেন বহির্বিশ্বের প্রকৌশলীদের সঙ্গে অন্তত সমকক্ষ হতে পারেন তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. বর্তমান অবস্থা

বর্তমান পৃথিবী যদিও কৃষি যুগ হয়ে শিল্প যুগ পার হয়ে তথ্যপ্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করেছে, কিন্তু বাংলাদেশ এখনও কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় রয়েছে। ভারত বিগত দশকে কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। তাদের উন্নতি সম্ভব হয়েছে ড. স্বামীনাথনের মূল্যায়ন অনুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পনীতি ও শিক্ষানীতির প্রেক্ষিতে। তাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১–৫৬) থেকে শুরু করে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯২–৯৭) পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষার ব্যয় ও উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ের অনুপাত প্রায় ৫০:৫৩। উল্লেখ্য যে উক্ত পরিসংখ্যানে ১৯৯০–৯১এ বাংলাদেশে প্রতি হাজারে জনসংখ্যা অনুযায়ী স্নাতক

প্রকৌশল ও ডিপ্লোমা প্রকৌশলে ভর্তি সংখ্যা যথাক্রমে ০.০১১৬৫ ও ০.০৩৪৬ জন। এর বিপরীত ভারতে যথাক্রমে ০.০৯৮৮ ও ০.১৬৯৫জন।

সারণি ১০.১ : বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী সংখ্যার প্রবৃদ্ধি

	স্নাতকোত্তর পর্যায়		স্নাতক পর্যায়		পলিটেকনিক পর্যায়	
	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	ভর্তি	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	ভর্তি সংখ্যা	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	ভর্তি সংখ্যা
১৯৪৭–৪৮	০	০	১	১২০	১	১২০
১৯৯০–৯১	১	৩৮৫	৭	১৩৪০	২৩	৩৯৮০

বাংলাদেশে ৯০ দশকের প্রথম দিকে আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি প্রকৌশল বিভাগ খোলা হয়েছে। এ পেশায় নিযুক্ত ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের জন্য আইইবি থেকে এএমআইই সেকশন এ এবং বি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রির সমমানের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার জন্য সরকারের রাজস্ব ব্যয়বরাদ্দ মোট শিক্ষাখাতের ব্যয়বরাদ্দ অনুযায়ী গড়ে প্রায় ২.৪২% এর কাছাকাছি (১৯৮৯–৯০ থেকে ১৯৯৫–৯৬)। মোট উন্নয়ন খাতের ব্যয় বরাদ্দ ধরলে কারিগরি শিক্ষা খাতের ব্যয় প্রায় ০.২৫%।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় বরাদ্দ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ১৯৮৫–৮৬ সালের রাজস্ব খাতে এর ব্যয় বরাদ্দ ছিল মোট রাজস্ব ব্যয়ের ০.২% এবং তা ১৯৯১–৯২ সালে ০.১৩%। উন্নয়ন খাতে ১৯৮৫–৮৬ সালের বরাদ্দ ছিল ০.০৬% এবং ১৯৯১–৯২ সালে ছিল ০.০০৬%। এই অবস্থায় কারিগরি শিক্ষাখাতের ব্যয় বরাদ্দ বর্তমান আধুনিক দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির যুগে মোটেই শোভন নয়। এর ফলে কারিগরি শিক্ষাখাতে গ্রন্থাগার থেকে গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি পর্যন্ত কোন কিছুই হালনাগাদ করা যাচ্ছে না। কারিগরি শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ৭০ এর দশকে যে স্থানে ছিল এখনও প্রায় সে স্তরেই রয়ে গেছে। তার ফলে প্রযুক্তির বিকাশ, পরিচালন, আত্মস্থকরণ, হস্তান্তর ক্ষেত্রে আমদানিকৃত নতুন নতুন আধুনিক প্রযুক্তি বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষ হতে পারছে না। ইতোমধ্যেই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শুরু করে হাইটেক শিল্পের ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে করতে হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ষাটের দশকে রাসায়নিক সারশিল্প ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রকৌশলী ও কারিগরগণ বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিত। আজ বাংলাদেশী প্রকৌশলীদের ইন্দোনেশিয়ায় প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশে এই ক্ষেত্রে পরামর্শদাতার কাজ করছে।

১৯৮৯ সালে World Federation of Engineering Organization (WFEO) এ Committee on Education and Training এর Decade Digest বইয়ের Engineering & Development প্রবন্ধে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহে ২০০০ সালে প্রকৌশলের চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছিল। তাদের প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ২৩৬১ জন প্রকৌশলীর চাহিদা রয়েছে। আর এই সংখ্যা ভারতে প্রতি হাজারে ০.৪৭ জন ও কোরিয়াতে ০.৯ জন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালে ল্যাটিন আমেরিকাতে প্রতি হাজারে দু জন, পশ্চিম ইউরোপে চার জন এবং আমেরিকায় সাত জন প্রকৌশলী ছিল।

প্রফেসর পল কেনেডি তাঁর বইয়ে পূর্ব এশিয়ার নব্য শিল্পায়িত দেশসমূহে দ্রুত উন্নতির প্রথম কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান এবং বলেছেন ৪ কোটি ৩০ লক্ষ লোক অধ্যুষিত দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৮০ সালে যত প্রকৌশল ডিগ্রি সম্পন্ন ব্যক্তি বের করেছে, তা যুক্তরাজ্যে, পশ্চিম জার্মানি ও সুইডেনের সম্মিলিত সংখ্যার সমান। স্বাধীনতা–উত্তর বাংলাদেশে শিল্পখাতে তেমন কোন উন্নতি হয় নি। জাতীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান প্রায় ১০% এর কাছাকাছি।

অতএব, আমাদের শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাতে হলে ব্যাপক ভিত্তিতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রয়োজন হবে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রায় ৮০% অর্থই ব্যয় হয় প্রকৌশলীদের মাধ্যমে। আর শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য প্রচুর দক্ষ প্রকৌশলীর প্রয়োজন। বাংলাদেশে চাহিদা অনুযায়ী প্রকৌশল শিক্ষার সুযোগ অপ্রতুল। ইতোমধ্যেই ব্যাপক বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য সরকার নীতি গ্রহণ করেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাসহ বেশ কয়েকটি বড় শহরে রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (EPZ) এর মাধ্যমে রফতানিমুখী শিল্প স্থাপন করা হচ্ছে। এই ব্যাপক উদ্যোগের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি যোগান দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য দেশে ব্যাপক ভিত্তিতে দক্ষ প্রকৌশলী তৈরি করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। নতুবা বিনিয়োগকারীরা দক্ষ জনশক্তির অভাবে বিনিয়োগের উৎসাহ হারাবে অথবা ভিন্ন দেশ থেকে দক্ষ জনশক্তি আমদানির ওপর জোর দেবে।

৩. **অব্যাহত প্রশিক্ষণ**

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বর্তমান যুগে প্রযুক্তির জীবনচক্র (Life Cycle) প্রতিনিয়তই সঙ্কুচিত হচ্ছে। বর্তমানের কম্পিউটার প্রকৌশলের ক্ষেত্রে এ জীবনচক্র ১.৮ বছর। ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স প্রকৌশলের ক্ষেত্রে চার বছর ও যন্ত্র কৌশলের ক্ষেত্রে সাত বছর। এই প্রেক্ষিতে একজন প্রকৌশলীকে তার চাকরির ৩০–৩৫ বছরের মধ্যে প্রতিটি প্রযুক্তির জীবনসীমা সমাপ্তির পরপরই পুনরায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর জ্ঞানের হালনাগাদের ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে একজন প্রকৌশলীকে তাঁর চাকরি জীবনে ৭–১০ বার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। বাংলাদেশে অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (CET) এবং অব্যাহত পেশাগত উন্নয়ন (CPD) এর সুযোগ খুবই কম। বিভাগীয় পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত প্রশাসনিক প্রশিক্ষণভিত্তিক। ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট AMIE এ A ও B স্তরের মাধ্যমে পেশায় নিয়োজিত কারিগরি জনশক্তির পেশাগত মান নির্ণয়ের ব্যবস্থা করেছে। তারা সীমিত আকারে অব্যাহত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও বিগত দেড়দশক ধরে চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি বুয়েট অব্যাহত শিক্ষা দপ্তর খুলেছে। স্বল্পসংখ্যক প্রকৌশলীকে স্ব–স্ব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তি–বিষয়ে হালনাগাদ রাখতে পারছে। ব্যাপক ভিত্তিক পেশাগত প্রশিক্ষণের অভাবের ফলে কারখানায় উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উৎপাদিকায় অদক্ষতার ছাপ থাকছে। এই প্রেক্ষিতে প্রকৌশলীদের ব্যাপকভাবে অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৌশল ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরও অব্যাহত পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই লক্ষ্যে ইনজিনিয়ারিং স্টাফ কলেজেসহ বুয়েটের অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দপ্তরকে জোরদার করতে হবে।

৪. **শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি**

একবিংশ শতাব্দীতে প্রকৌশলের শিক্ষাক্রম অনেক বদলে যাবে। ইতোমধ্যেই এখানে নতুন নতুন কোর্স সংযোজিত হচ্ছে। ডিজিটাল টেকনোলজিতে প্রতিটি কারখানা ও যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রিত হবে ও হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৌশল শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি আমাদের দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিক্ষেত্রেই হালনাগাদ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প সমস্যা বিষয়াদি সম্পর্কিত গবেষণা জোরদার করতে হবে। একজন প্রকৌশলীকে সনাতনী মধ্যপর্যায় থেকে উন্নত প্রযুক্তিতে উত্তরণের ক্ষেত্রে সংযোজন নির্মাণের দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

বাংলাদেশের একজন প্রকৌশল ছাত্রের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবের চিত্রটি চাকরির প্রাথমিক অবস্থায় তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ছাত্র অবস্থাতেই তাকে মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন। তারজন্য প্রকৌশল ছাত্রদের শিল্পক্ষেত্রে নবিশীর প্রয়োজন। এরজন্য এক জন ছাত্রকে তার ডিগ্রি গ্রহণকালেই অন্তত ৮ থেকে ১২ সপ্তাহ মাঠ পর্যায় অথবা শিল্প কারখানায় কাটানো প্রয়োজন।

বাংলাদেশে প্রকৌশল বিদ্যায়তনগুলো থেকে পাশ করে একজন প্রকৌশলী দেশে, বিদেশে বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনসহ নানা স্থানে চাকরি করে। কিছু সংখ্যক বিদেশী ছাত্রও বাংলাদেশের প্রকৌশল বিদ্যায়তনগুলোতে লেখাপড়া করে। তাই প্রকৌশল শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। এখানে কোর্স কারিকুলামের সার্বক্ষণিক মূল্যায়নের অভাব রয়েছে।

বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রকৌশল বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এখানে মানেরও তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানসম্পন্ন প্রকৌশলীর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই চাহিদা রয়েছে। মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও উপকরণ প্রকৌশল বিদ্যায়তনগুলোতে নিশ্চিত করতে হবে। মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিদেশের পেশাগত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৌশল বিদ্যায়তনগুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। বাংলাদেশেও প্রকৌশল বিদ্যায়তনগুলোকে নিয়মিত স্বীকৃতির ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. প্রকৌশল শিক্ষার সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে প্রকৌশল শিক্ষার কিছুটা সম্প্রসারণ হলেও তার দুর্বলতাসমূহ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রকৌশল শিক্ষার কতিপয় দুর্বলতা নিম্নে চিহ্নিত করা হল :

৫.১. সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটানোর ফলে মানের অবনতি লক্ষ করা যাচ্ছে এবং তার শিক্ষাক্রমে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা প্রতিফলিত হচ্ছে না, তাতে বেকারত্ব ও কর্মসংস্থানের সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

৫.২. বেশির ভাগ প্রকৌশল শিক্ষায়তনগুলোতে অবকাঠামোগত সুবিধা অপ্রতুল।

৫.৩. প্রকৌশল বিদ্যায়তনে শিক্ষকদের পদ ২৫–৩০% খালি হওয়ায় শিক্ষকের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ঢাকার বাইরে প্রকৌশল শিক্ষকদের পদ খালি হলে সে সব পদ সহজে পূরণ হয় না।

৫.৪. অধিকাংশ শিক্ষায়তনে কোন প্রকার গবেষণার সুযোগ নেই।

৫.৫. প্রকৌশল শিক্ষায়তনগুলো অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করছে। তাদের সঙ্গে ইনস্টিটিউট এবং গবেষণা কেন্দ্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ নেই বললেই চলে।

৫.৬. প্রকৌশল শিক্ষার বাজেট বরাদ্দ চাহিদা অনুযায়ী অত্যন্ত অপ্রতুল। বাজেট বহির্ভূত সম্পদ সংগ্রহের ঘাটতি রয়েছে।

৫.৭. শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।

উপরিবর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, বাস্তবধর্মী দক্ষ প্রকৌশল ও কারিগরি জনশক্তি গড়ে তোলা---যারা দেশের উন্নয়নে, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, দারিদ্র্য বিমোচনে এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখবে।

৬. সুপারিশ

৬.১ বর্তমানের প্রযুক্তি ও পরিবর্তিত আর্থসামাজিক পরিবেশ, উন্নয়ন, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ প্রকৌশলী সরবরাহ করার জন্য প্রকৌশল বিদ্যায়তনগুলোতে আসনসংখ্যা বর্ধিত করতে হবে।

৬.২ প্রকৌশল শিক্ষাক্রমের অধিকাংশ বইপুস্তকই ইংরেজিতে রচিত। চাকরি জীবনে প্রকৌশলীদের প্রকল্প প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অন্যান্য লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়। এ জন্য মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই ছাত্রদের ইংরেজির ভিত মজবুত করতে হবে।

৬.৩ দেশের সম্পদ উন্নয়ন ও বিভিন্ন কারিগরি সমস্যার সমাধান ও উচ্চমানসম্পন্ন প্রকৌশলী তৈরির জন্য বুয়েটে গবেষণা ও স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রতি অধিকতর নজর দেওয়া হবে। বিআইটিগুলোতে পর্যায়ক্রমে স্নাতকোত্তর কোর্স শক্তিশালী করা হবে। গবেষণার মূল এলাকাগুলো হবে দেশীয় প্রকৌশল শিল্পের সমস্যা বিষয়ক। পেশায় নিযুক্ত স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রকৌশলীদের জন্য বাড়তি সুযোগ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন।

৬.৪ দেশের বৃহৎ শিল্পগুলোতে প্রকৌশল, রসায়ন, বস্ত্র, পাট, চামড়া, সিরামিক, গ্যাস শিল্পের জন্য উপযুক্ত প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরির জন্য অবিলম্বে বিকাশমান বিষয়ে কোর্স চালুসহ, বিআইটি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নতুন ফ্যাকাল্টি চালু করা বাঞ্ছনীয় এবং শিক্ষার মান উন্নীত করা একান্ত প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে বিআইটিগুলোকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা দরকার।

৬.৫ দেশের সকল প্রকৌশল বিদ্যায়তনের গবেষণাগারগুলোর আধুনিকায়ন প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি অনেক গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা উন্নত প্রযুক্তি সংবলিত যন্ত্রপাতি আনয়ন করছে। এ সকল ক্ষেত্রে

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যৌথ গবেষণার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বুয়েট, বিআইটি এবং গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে এজন্য নিবিড় যোগসূত্র থাকতে হবে।

৬.৬ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার কোর্সগুলোকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির নিয়মিত হালনাগাদসহ শিল্প কারখানা ও কারিগরি সংস্থাসমূহে শিক্ষার্থীদের সহায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাপক অবকাশ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বাধ্যতামূলক শিক্ষানবিশি ও ব্যবহারিক কোর্স অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন। শিল্প কারখানাগুলোতে শিক্ষানবিশি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার।

৬.৭ উপরিউক্ত অবস্থায় প্রকৌশল বিদ্যায়তনের সঙ্গে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নবিশি শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে গবেষণায় দেশের সকল পর্যায়ের চেম্বার অব কমার্স ও চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রির প্রকৌশল শিক্ষায়তনের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

৬.৮ প্রকৌশলের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সময়ে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ওপরও জোর দেওয়া প্রয়োজন।

৬.৯ গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের শিল্প কারখানাসমূহের কারিগরি সমস্যা সমাধানে দেশের প্রকৌশলী, গবেষক ও শিক্ষকদের উপদেষ্টা প্রকৌশলী হিসেবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এর ফলে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

৬.১০ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পর্যায়ে লাগসই প্রযুক্তিনির্ভর প্রকল্প প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে প্রকৌশলীরা যাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে, সেদিকে লক্ষ রেখে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাড়াতে হবে।

৬.১১ বর্তমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জীবনচক্র ছোট হয়ে যাওয়ায় এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হওয়ায় চাকরিতে নিয়োজিত পেশাজীবী প্রকৌশলীদের অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ/অব্যাহত পেশাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা ব্যাপকহারে চালু করা উচিত। এ ক্ষেত্রে ইনজিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং পেশাগত সংগঠন আইইবিকে শক্তিশালীকরণসহ বুয়েটে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা প্রদানের লক্ষ্যে মড্যুলার কোর্স চালু করা উচিত। প্রকৌশল শিক্ষকদের দেশে/বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

৬.১২ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও কারিগরদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের প্রকৌশল বিদ্যায়তন /ইনস্টিটিউটগুলোতে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

৬.১৩ আইইবির মাধ্যমে ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে যে পেশাগত শিক্ষা চালু আছে তার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হালনাগাদ করে তাকে আরও জোরদার করে দেশের প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলে সম্প্রসারিত করতে হবে।

৬.১৪ দেশের প্রচলিত বিভিন্ন স্তরে কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার মূল্যায়ন, মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত পেশাগত/বিশেষজ্ঞ সংস্থার মাধ্যমে মূল্যায়ন ও স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করা দরকার।

৬.১৫ প্রকৌশল ক্ষেত্রে গবেষণা বিষয়ে সরকারের দিকনির্দেশনা প্রদানসহ সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও অর্থায়নের জন্য সংযুক্ত সংস্থা বা দফতর হিসেবে একটি ইনজিনিয়ারিং রিসার্চ কাউন্সিল গঠন করতে হবে।

৬.১৬ বিআইটি, টেক্সটাইল ইনজিনিয়ারিং কলেজ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ব্যবস্থাপনা এবং এগুলোর শিক্ষার মান উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে লেদার টেকনোলজি ইনস্টিটিউটকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে বুয়েটে ও বিদেশে নিয়মিত শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

৬. ১৭ প্রাক্তন ছাত্র সমিতির (এলামনাই) মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষায়তনগুলোর উন্নয়ন, প্রসারণ ও আধুনিকায়নের জন্য অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে চেষ্টা চালাতে হবে।

৬.১৮ বাংলাদেশের প্রকৌশল কারিগরি শিক্ষার ব্যয়বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। এক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ দ্রুত বাড়াতে হবে।

অধ্যায়—১১

চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রথম মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৮৭ সালে ঢাকায় মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল নামে, তারপর ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয়। ময়মনসিংহ লিটন মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয় ১৯২৪ সালে, চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুল ১৯২৮ সালে, সিলেট মেডিকেল স্কুল ১৯৪৮ সালে এবং রাজশাহী মেডিকেল স্কুল ১৯৫২ সালে। এই মেডিকেল স্কুলগুলোতে তখনকার এনট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর চার বৎসর শিক্ষার শেষে এলএমএফ ডিপ্লোমা দেওয়া হত। বাংলাদেশে প্রথম মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৪৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ নামে। আইএসসি পাস করার পর পাঁচ বৎসর অধ্যয়নের শেষে এমবিবিএস ডিগ্রি প্রদান করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ার সর্বপ্রথম মেডিকেল কলেজ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনের দেড় শত বছর পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পর ক্রমান্বয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (১৯৫৭), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (১৯৫৮), মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজ (১৯৬২), ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (১৯৬২), সিলেট মেডিকেল কলেজ (১৯৬২), বরিশাল মেডিকেল কলেজ (১৯৬৮), রংপুর মেডিকেল কলেজ (১৯৭০) স্থাপিত হয়। সাম্প্রতিককালে ১৯৯২ সালে দেশে আরও পাঁচটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় দিনাজপুর, বগুড়া, খুলনা, ফরিদপুর ও কুমিল্লায়। তাছাড়া গত এক দশকের মধ্যে চারটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। এই ১৭টি মেডিকেল কলেজ আঞ্চলিকভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং পরীক্ষা গ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ, ডিগ্রি ও সনদ প্রদানের ব্যাপারে সংযুক্ত। কিন্তু সরকারি মেডিকেল কলেজগুলো অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে, শিক্ষক নিয়োগ, বদলি ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া মেডিকেল শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, মেডিকেল কলেজগুলোর মান নিয়ন্ত্রণ এবং ডিগ্রিসমূহের রেজিস্ট্রেশনের জন্য সমস্ত মেডিকেল কলেজই বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের আওতাভুক্ত। সুতরাং চিকিৎসা শিক্ষার সমস্ত কার্যক্রম বর্তমানে তিন প্রকার কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন।

১৯৬২ সালে সমস্ত মেডিকেল স্কুলের এল এম এফ শিক্ষা ও ডিপ্লোমা দেওয়ার কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয় এই কারণে যে এর পর থেকে গুণগতভাবে আর দুই শ্রেণীর ডাক্তার থাকবে না। কেবল মেডিকেল কলেজগুলো থেকেই স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এমবিবিএস ডাক্তারই হবে।

২ বর্তমান অবস্থা

২১ বর্তমানে প্রচলিত ধারণা এই যে, আমাদের দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা শিক্ষার অবস্থা সন্তোষজনক নয়। তবে একথাও সত্য যে ষাট, সত্তর এমনকি আশির দশকেরও প্রথম দিকে যে সকল শল্যচিকিৎসা কেবল মেডিকেল কলেজগুলো ছাড়া অন্য কোথাও হত না, সে সমস্ত অপারেশন এখন দেশের সমস্ত জেলা হাসপাতাল, এমনকি কিছু থানা হাসপাতালেও হয়ে থাকে। বর্তমানে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউটে, হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে এবং কয়েকটি মেডিকেল কলেজেও যে সমস্ত স্পেশালাইজড বিভাগের উন্নয়ন হয়েছে, যেমন কার্ডিওলজি, গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি, নিউরোমেডিসিন, নেফ্রোলজি ইত্যাদি তাতে অনেক জটিল নিউরোসার্জারি, কার্ডিয়াক সার্জারি, অর্থোপেডিক, এমনকি কিছু কিছু নতুন ও জটিল চক্ষু, কান ও গাইনি ও

অবস্টেট্রিকস–এর অপারেশনও এখন হয়ে থাকে — যা ষাট ও সত্তরের দশকে ছিল না। তাছাড়া অন্যান্য স্বাস্থ্য তথ্যে দেখা যায় শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ জীবিত শিশু জন্মের হার) পঁচিশ বছর আগের ১৪০ থেকে কমে বর্তমানে ৭৭ হয়েছে, প্রসূতি মৃত্যুও সেই অনুপাতে কমে প্রতি হাজার প্রসূতির ক্ষেত্রেও পাঁচ হয়েছে, নবজাতকের মৃত্যুও কমেছে (৪৪:১০০০) এবং গড় আয়ু ১৯৭০–এ ৪৫ বছর থেকে ১৯৯৫–এ ৫৭ বছরে উন্নীত হয়েছে। তবে কিছু গুণগত ও পরিমাণগত বিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও আমরা অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় এখনও অনেক পিছিয়ে আছি।

২.২ স্নাতক ডিগ্রির জন্য বর্তমানে সতেরটি মেডিকেল কলেজ আছে। এর মধ্যে তেরটি সরকারি এবং চারটি বেসরকারি। এর মধ্যে প্রথম সরকারি আটটিতে প্রতি বৎসর গড়ে দেড় শত ছাত্র ভর্তি হয়। বাকি পাঁচটি সরকারি কলেজে এবং বেসরকারি কলেজগুলোতে বছরে পঞ্চাশ জন করে ছাত্র ভর্তি হয়। বর্তমানে দেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সংখ্যা ২৫,৫৮৭ অর্থাৎ এখন ডাক্তার জনসংখ্যা অনুপাত হচ্ছে ১:৪,৫৭২। এই অনুপাত কুদরাত–এ–খুদা কমিশনের রিপোর্টের সময়ের ১:১০,৭০০ এবং ১৯৮৮ এর রিপোর্টের ১:৬,২০০ এর তুলনায় উন্নত।

২.৩ বর্তমানে দেশে শুধুমাত্র আইপিজিএম আর থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ও ডিগ্রিপ্রাপ্ত ডাক্তারের সংখ্যা প্রায় ২,৮৯৬। এই সংখ্যা ১৯৮৮ রিপোর্টে ১,০৫০, যা এখনও খুবই অপ্রতুল। কারণ বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন রকমের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষিতদের মোট সংখ্যা হল ২,৮৯৬। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করা ডাক্তারদের সংখ্যা যোগ করলে এটা তিন হাজারের কিছু বেশি হবে। তাছাড়া মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ১৯৮৮ সালে অনেক বেড়ে যাওয়াতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের চাহিদা আরও বেড়ে গেছে।

২.৪ সামগ্রিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও এখনও দেশের মোট ডাক্তারের সংখ্যা অপ্রতুল। তার মধ্যে শহরের চেয়ে গ্রামের ডাক্তার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। গ্রামের প্রতিরোধযোগ্য ও সংক্রামক রোগের সংখ্যা শহরের চেয়ে অনেক বেশি। এর জন্য দায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অর্থাৎ পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার, সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি জ্ঞানের অভাব এবং পরিত্যক্ত বস্তুর যথার্থ অপসারণ ব্যবস্থার প্রকট অপ্রতুলতা। যেহেতু দেশের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ গ্রামভিত্তিক, সেহেতু স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষায় প্রতিরোধযোগ্য সংক্রামক রোগ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অর্থাৎ কমিউনিটি মেডিসিনের ওপর আরও জোর দিতে হবে। একই কারণে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও পরিবেশ রক্ষার শিক্ষা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়েও দিতে হবে।

২.৫ পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন বিজ্ঞান এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অত্যধিক। তাই স্নাতক শিক্ষাক্রমে এই বিষয় কটির ওপরও বিশেষ জোর দিতে হবে।

২.৬ বর্তমানে মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে মানের অসামঞ্জস্য বিদ্যমান। বিশেষ করে সরকারি নতুন পাঁচটি কলেজের সর্বপ্রকারের সুবিধা ও শিক্ষকদের গুণগত ও পরিমাণগত মান যথেষ্ট উন্নতির অপেক্ষা রাখে। এমনকি পুরনো মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যেও, যথা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সঙ্গে রংপুর, সিলেট বা বরিশাল মেডিকেল কলেজের গুণগত ও পরিমাণগত অনেক পার্থক্য রয়ে গেছে। একইভাবে বেসরকারি কলেজগুলোরও মানের একটি প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন। তাই চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান না করলে চিকিৎসা শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতি সাধন সম্ভব নয়।

২.৭ বর্তমানে সমস্ত মেডিকেল কলেজের সঠিক মান রক্ষার ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত হলেও দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিকভাবে এই কাউন্সিলের ভূমিকা নানা কারণে দুর্বল। চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চাহিদার কারণগুলোর মধ্যে এই দুর্বলতা একটি প্রধান কারণ।

২.৮ চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় এখনও অপ্রতুল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় উন্নত দেশেরও অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিসংখ্যানে বলা হয় প্রতি দশ লক্ষ অধিবাসীর জন্য একজন নিউরোসার্জন দরকার। এই হিসেবে বাংলাদেশে ন্যূনতম ১২০ জন নিউরোসার্জন দরকার। কিন্তু বর্তমানে জুনিয়র সিনিয়র মিলিয়ে আছেন মাত্র ১৫ কি ১৬ জন। অন্যান্য অনেক বিষয়েও প্রায় একই অবস্থা। সুতরাং সমগ্র চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জরুরি কার্যসূচি আরও জোরদার করা দরকার।

২.৯ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরির জন্য বিশেষ তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ আজকাল অতি আধুনিক প্রযুক্তির অত্যন্ত ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। আর্থিক কারণে বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির তথা প্রশিক্ষণের অভাব অত্যন্ত প্রকট। এসব কারণে বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেশে হলেও উচ্চতর ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য উন্নত দেশে প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে।

২.১০ বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে দেশে মৌলিক গবেষণা হয় না বললেই চলে। অর্থসংস্থানের অভাব ছাড়াও স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বা অন্য কোন পর্যায়েও গবেষণার ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া বিশেষজ্ঞের অপ্রতুলতার জন্য তাঁদের ব্যবহারিক ও পেশাগত কার্যে অর্থাৎ রোগীর চিকিৎসাদানে ব্যস্ততার দরুন সুস্থ মন–মানসিকতা গড়ে ওঠে না। দেশের বিভিন্ন রকমের ব্যাধি ও চিকিৎসা সমস্যার প্রাধান্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত গবেষণায় চিকিৎসা শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের উৎসাহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২.১১ আমাদের দেশে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহ্যগতভাবে অন্যান্য চিকিৎসা প্রণালী যেমন হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদী চিকিৎসা প্রচলিত রয়েছে। যেহেতু আমাদের দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এসব চিকিৎসা প্রণালী দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে তাই এসব চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩.১ দেশের সমস্ত অধিবাসীকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনদানের ও কর্মক্ষম রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত মানের চিকিৎসক, সেবক–সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মী ও সকল প্রকারের বিশেষজ্ঞ তৈরি করা।

৩.২ চিকিৎসা পেশা অন্যান্য সকল পেশার চেয়ে স্পর্শকাতর, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট অসুস্থতা তথা জীবন–মৃত্যুর সমস্যার সঙ্গে জড়িত বলে চিকিৎসক, সেবক–সেবিকাসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীকে সংবেদনশীল, বিবেকবান এবং মানুষের সেবায় উদ্বুদ্ধ করা।

৩.৩ দেশের ব্যাধি ও চিকিৎসা সমস্যাবলির মোকাবিলায় উপযুক্ত চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৩.৪ চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল উন্নতির সুফল দেশের জনগণের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সেবক–সেবিকার ও সকল স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসা কৌশলীদের শিক্ষার সম্প্রসারণ ও এদের সবাইকে সামাজিক ও মানব সেবায় অনুপ্রাণিত করা।

৪. চিকিৎসা শিক্ষায় ভর্তি ব্যবস্থা

ক. ভর্তির যোগ্যতা : প্রাক–মেডিকেল শিক্ষাক্রমে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা থাকা পূর্বশর্ত।

খ. এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় ন্যূনপক্ষে সর্বমোট ১৩০০ নম্বর থাকতে হবে। তবে সরকার ইতোমধ্যে উপজাতীয় ও তিন পার্বত্য জেলার অ–উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য কিছু কিছু ছাড় দিয়ে ১২০০ নম্বরের অনুমতি দিয়েছে।

গ. মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিতে হবে।

ঘ. কোন প্রার্থী দুই বছরের বেশি ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না।

ঙ. ভর্তির চূড়ান্ত নির্বাচন নিম্নলিখিতভাবে সর্বোচ্চ ২০০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে হবে :

(১)	মেডিকেল ভর্তির জন্য লিখিত পরীক্ষা	১০০ নম্বর
(২)	এসএসসি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ৪%	
	এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৬%	১০০ নম্বর
	মোট =	২০০ নম্বর

চ. মেডিকেল ভর্তির জন্য লিখিত পরীক্ষা বহুনির্বাচনী প্রশ্নমালার পদ্ধতিতে হবে এবং এই পরীক্ষায় জীববিদ্যা, পদার্থ ও রসায়ন এবং সাধারণ বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

ছ এভাবে প্রাপ্ত চূড়ান্ত ফলাফল ও প্রার্থীর দেওয়া কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে প্রার্থী কোন কলেজে ভর্তি হবে তা নির্ধারণ করা হবে।

৪. **শিক্ষাকাল ও শিক্ষার মাধ্যম**

মেডিকেল কলেজে এখনকার মত পাঁচ বৎসরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিই থাকবে এবং স্নাতকোত্তর এক বৎসরের ইন্টার্নশিপই থাকবে। ইন্টার্নশিপের পরেই বিএমডিসি থেকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হবে। মেডিকেল কলেজের শিক্ষার বর্তমানে যে সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের জার্নাল সমস্ত বিশ্বে প্রকাশিত হয় তার বেশির ভাগই ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং আমাদের ডাক্তারগণ উচ্চ শিক্ষার জন্য এখনও যে সমস্ত দেশে যান সেগুলোর বেশির ভাগই ইংরেজি ভাষার দেশ। সেজন্য এখনও মেডিকেল শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজিই থাকা দরকার।

৫. **শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পরীক্ষা**

ক. প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ — অ্যানাটমি, ফিজিওলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি — এই বিষয়গুলোর ফাইনাল পরীক্ষা দ্বিতীয় বর্ষের শেষে হবে, যাকে বলা হয় প্রথম প্রফেশনাল পরীক্ষা।

খ. তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে — প্যাথলজি ও মাইক্রোবায়োলজি, ফার্মাকোলজি ও থেরাপিউটিকস, কমিউনিটি মেডিসিন, ফরেনসিক মেডিসিন, ইন্টারনাল মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি অবস্টেট্রিকস, চক্ষু ও ইএনটি বিষয়সমূহ পড়ানো হবে।

চতুর্থ বর্ষের শেষে দ্বিতীয় প্রফেশনাল পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষার বিষয়গুলো হবে — প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ফার্মাকোলজি ও থেরাপিউটিকস, ফরেনসিক মেডিসিন এবং কমিউনিটি মেডিসিন।

গ. পঞ্চম বর্ষে পড়ানো হবে ইন্টারনাল মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি অবস্টেট্রিকস, চক্ষু ও ইএনটি এবং এই বিষয়গুলোর ওপরই ফাইনাল প্রফেশনাল পরীক্ষা হবে পঞ্চম বর্ষের শেষে। প্রজনন বিজ্ঞান, পরিবার পরিকল্পনা ও মাতৃ স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

ঘ. তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে দুটি নতুন বিষয় পড়ানো হবে, তবে এই দুটি বিষয়ে আপাতত পরীক্ষা হবে না। এই বিষয় দুটি হবে Behavioural Science and Public Relation এবং Bio Statistics.

ঙ. ইন্টারনাল মেডিসিন, কমিউনিটি মেডিসিন, প্রতিরোধমূলক মেডিসিন, সংক্রামক রোগসমূহের এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর বেশি জোর দিতে হবে। শিশু রোগ ও সাইকিয়াট্রিতেও আগের চেয়ে বেশি জোর দেওয়া দরকার এবং এ দুটি বিষয়ও ইন্টারনাল মেডিসিনেরই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

৬ **ইন্টার্নশিপের এক বছরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে প্রশিক্ষণ দিতে হবে**

ক. ইন্টারনাল মেডিসিন — ছয় মাস (এর মধ্যে এক মাস পেডিয়াট্রিক্স ও দুই সপ্তাহ সাইকিয়াট্রি থাকবে)।

খ. সার্জারি — দুই মাস

গ. অর্থোপেডিক্স ও জরুরি বিভাগ — এক মাস।

ঘ. গাইনি অবস্টেট্রিক্স — দুই মাস।

ঙ. চক্ষু — দুই সপ্তাহ

চ. নাক-কান-গলা — দুই সপ্তাহ।

৭. স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা

৭.১ স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ তৈরি। বর্তমানে স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তারের সংখ্যা প্রায় ৩০০০। কিন্তু দেশের চাহিদার তুলনায় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সংখ্যা এখনও অপ্রতুল।

৭.২ দেশের প্রথম স্নাতকোত্তর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হল আইপিজিএম আর — স্থাপিত হয় ১৯৬৫ সালে। বর্তমানে ১০টি প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা চালু আছে। তবে এখনও সর্বাধিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রদান করা হয় আইপিজিএম আর–এ। এর ৩৮টি বিষয়ে প্রথম দিকে আইপিজিএম আর–এর পরীক্ষা ও পাঠ্যসূচির নিয়ন্ত্রণ এবং ডিগ্রি প্রদানের প্রতিষ্ঠান ছিল বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস।

৭.৩ BCPS (বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস) থেকে দেওয়া স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দুরকমের FCPS (Fellow of the College of Physicians & Surgeons) এবং MCPS (Member of the College of Physicians & Surgeons) এর মধ্য FCPS কে শিক্ষকতার যোগ্যতার মর্যাদা দেওয়া হয়।

৭.৪ কিন্তু বর্তমানে আইপিজিএম আর–এ এমএস, এমডি, এমফিল ও ডিপ্লোমা কোর্স আছে। এসব শিক্ষা কোর্সের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ফ্যাকালটির মাধ্যমে।

৭.৫ সে কারণে এখন কয়েকটি বিষয়ে FCPS (বা MCPS) এবং এমএস, এমডি, এমফিল বা ডিপ্লোমা দুরকমের স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছে। এতে অনেক সময় শিক্ষক বা বিশেষজ্ঞ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের মূল্যায়নে অসুবিধা দেখা গেছে।

৭.৬ অন্যান্য যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হয় সেগুলো নিম্নরূপ :

Institute of Cardiovascular Diseases (ICVD)	MD (Cardiology), MS (Cardio thoracic Surgery)
Rehabilitation Institution and Hospital for Disabled (RIHD)	MS (Orthopaedics)
National Institute of Ophthalmology (NIO)	MS (Ophthalmology)
NIPSOM (National Institute of Preventive & Social Medicine)	M. Phil (Public Health) M.P.H. (Public Health) M.P.H. (Community Medicine) M.P.H. (Health Education) M.P.H. (MCH & F.P.) M.P.H. (Epidemiology) M.P.H. (Occupational & Enviornmental Health) M.P.H (Hospital Administration)
ঢাকা মেডিকেল কলেজ	D.A. (Anaesthesiology) G.G.O. (Gynae & Obs.) MS (Urology) MS (Neurosurgery)
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ	D.A. D.G.O. D.C.H. (Child Health)

৭.৮ স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ তৈরি করার জন্য বিশেষ তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

৭.৯ মেডিকেল কলেজগুলো স্বায়ত্তশাসিত হতে হবে এবং সমস্ত কার্যক্রম একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

৭.১০ সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে একটি ন্যায়সঙ্গত ছাত্রবেতন থাকা উচিত। তবে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই ফি রহিত করা যাবে।

৭.১১ মেডিকেল কলেজের শিক্ষকদের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়স ষাট বছর হওয়া উচিত।

৭.১২ মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষক–ছাত্র অনুপাত যুক্তিসঙ্গত এবং এক রকম হতে হবে।

৭.১৩ আন্তঃমেডিকেল কলেজ Visiting Professorship Programme করলে বিশেষজ্ঞের অভাব কিছুটা পূরণ হবে।

৭.১৪ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরির জন্য বিশেষ তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ আজকাল অতি আধুনিক প্রযুক্তির অত্যন্ত ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। আর্থিক কারণে বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির তথা প্রশিক্ষণের অভাব অত্যন্ত প্রকট। এ সমস্ত কারণে মেডিকেল শিক্ষার বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেশে হলেও উচ্চতর এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য উন্নত দেশে প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে অত্যন্ত ব্যয়বহুল গবেষণা ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে এত দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে যে, আমাদের মত দরিদ্র দেশ তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা দূরে থাক কাছাকাছিও থাকতে পারছে না। সুতরাং উন্নতমানের বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসা শিক্ষাবিদ তৈরির জন্য ব্যয়বহুল প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম দেশে বহুল পরিমাণে আমদানি করতে হবে।

দন্ত চিকিৎসাবিদ্যা

১. ভূমিকা

দন্ত চিকিৎসা সামগ্রিক চিকিৎসা বিদ্যার একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

২. বর্তমান অবস্থা

দন্ত চিকিৎসাবিদ্যার জন্য বর্তমানে ঢাকায় একটি ডেন্টাল কলেজ ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ডিপার্টমেন্ট এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ডিপার্টমেন্ট আছে।

২.১ এই তিন জায়গা থেকে চার বৎসরের কোর্সের পর পরীক্ষা নিয়ে বিডিএস (স্নাতক) ডিগ্রি দেওয়া হয়। এই কোর্সে ভর্তি প্রার্থীকে এইচএসসি পাশ হতে হয়।

২.২ বর্তমানে রেজিস্টার্ড ডেন্টাল সার্জনের সংখ্যা ৯২০।

২.৩ বর্তমানে আইপিজিএম আর–এর ডেন্টাল ডিপার্টমেন্টে একটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। এই কোর্সে উত্তীর্ণ হলে ডিডিএস (ডিপ্লোমা ইন ডেন্টাল সার্জারি) ডিপ্লোমা দেওয়া হয়।

২.৪ উল্লিখিত তিনটি কেন্দ্রে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা নিম্নরূপ :

ঢাকা ডেন্টাল কলেজ	–	৭০
চট্টগ্রাম ডেন্টাল কলেজ	–	২০
রাজশাহী ডেন্টাল কলেজ	–	২০
মোট	=	১১০ জন

৩. সুপারিশ

সাম্প্রতিককালে দন্ত চিকিৎসার অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক প্রযুক্তির ফলে এবং উন্নত দেশে স্পেশালাইজড দন্ত চিকিৎসকও হচ্ছেন। যেমন Orofacial এবং Maxillary Surgery–তে স্পেশালাইজেশন। এখানেও তদ্রূপ আধুনিকীকরণ ও স্পেশালাইজেশন ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেবাবিদ্যা (নার্সিং) শিক্ষা

১. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

১.১ রোগীদের কষ্ট লাঘবের জন্য ও আরামে রাখার জন্য তাদের দৈনন্দিন দেখাশোনার সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সাহায্য ও সংবেদনশীল সেবা দেওয়া।

১.২ ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র সঠিকভাবে কার্যকরণের দায়িত্ব নেওয়া এবং ঔষধ, ইনজেকশন, সার্জিকেল ড্রেসিং ইত্যাদি কার্যকরণ।

১.৩ রোগীদের সমস্ত শারীরিক অবস্থা যেমন জ্বরের পরিমাপ, হৃৎস্পন্দন, রক্তচাপ, শ্বাসের হার, তরল গ্রহণ, নিঃসরণ ইত্যাদির পর্যবেক্ষণ ও বিবরণ রাখার প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

১.৪ অপারেশন থিয়েটার, ICU, ধাত্রীবিদ্যা ও অনুরূপ বিশেষ কার্যের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

২. **বর্তমান অবস্থা**

২.১ বর্তমানে দেশে রেজিস্টার্ড নার্সের সংখ্যা ১৩৮৩০ জন। রোগীর অনুপাতের এই সংখ্যা খুবই কম। যথাশীঘ্র এই সংখ্যা বাড়াতে হবে।

২.২ বর্তমানে দেশে ৩৮টি সরকারি (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন), একটি সামরিক বিভাগে ও পাঁচটি বেসরকারি (কুমুদিনী হাসপাতাল, হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনা বেসরকারি হাসপাতাল, জহুরুল ইসলাম হাসপাতাল, বাজিতপুর ও একটি রাজশাহীতে অবস্থিত) হাসপাতাল নিয়ে সর্বমোট ৪৪টি নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রগুলোতে এসএসসি পাসের পর চার বৎসরের প্রশিক্ষণের শেষে পরীক্ষা নিয়ে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি পরীক্ষা নেওয়া হয়।

২.৩ ঢাকায় একটি নার্সিং কলেজ আছে। এখান থেকে বিএসসি (নার্সিং) এবং বিএসসি (পাবলিক হেলথ নার্সিং) ডিগ্রি দেওয়া হয়।

২.৪ তা ছাড়া আমাদের দেশেরই বিশেষজ্ঞ ট্রেনিং কোর্সে কিছু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আছেন।

২.৫ এ ছাড়াও কিছু স্বল্পমেয়াদি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আছেন।

২.৬ এই সমস্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য এখন আলাদা নার্সিং ডাইরেক্টরেট আছে। সমস্ত ডিপ্লোমা ও ডিগ্রিসমূহের রেজিস্ট্রেশনের জন্য আলাদা নার্সিং কাউন্সিল আছে।

সুপারিশ

১. সেবা শিক্ষার এই সমস্ত কার্যক্রমের প্রাথমিক শিক্ষা হল ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সের। এই কোর্সের প্রশিক্ষণ আরও জোরদার করতে হবে।

(ক) এ প্রশিক্ষণ সময়োপযোগী করতে হবে।

(খ) প্রশিক্ষণে ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর আরও বেশি জোর দিতে হবে।

২. ছাত্রছাত্রী ভর্তি মেধাভিত্তিক হবে এবং ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগে বিজ্ঞান শাখায় এইচএসসি পাস। প্রার্থীর বয়সসীমা অনূর্ধ্ব ২২ বছর পর্যন্ত শিথিল করা যায়।

৩. নার্সিং কলেজে এমএসসি নাসিং কোর্স খোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

৪. প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের ও নার্সিং কলেজের শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিশেষ করে কলেজের শিক্ষকদের উন্নত দেশে প্রেরণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে অবশ্যই কোন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে থাকতে হবে এবং ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। এতে ছাত্রীরা হাসপাতালে সহযোগী সেবিকা হিসেবেও কাজ করতে পারবে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. কলেজ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ভাল গ্রন্থাগার থাকতে হবে যেখানে সমসাময়িক পুস্তকাদি ও জার্নাল পাওয়া যাবে।

৭. শিক্ষার মাধ্যম : যেহেতু নার্সিং কোর্সের সমস্ত পুস্তক ও জার্নাল ইংরেজিতে এবং এসব বই এখনও বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় না সেজন্য চিকিৎসা সেবাবিদ্যায় শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজিই থাকবে।

প্যারামেডিকেল শিক্ষা

১. ভূমিকা

প্যারামেডিকেল শিক্ষাপ্রাপ্তদের স্বাস্থ্য কৌশলী বলা হয়। স্বাস্থ্য কৌশলী ছাড়া কোন হাসপাতাল, ক্লিনিক বা যে কোনও চিকিৎসা কার্যক্রম চলতে পারে না।

বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের নিয়ন্ত্রণে দুটি Institute of Health Technology আছে, একটি ঢাকায় ও অন্যটি রাজশাহীতে। এই দুটি ইনস্টিটিউটে ছটি বিষয়ে তিন বছরের কোর্স আছে। এই কোর্সের পর ডিপ্লোমা ইন হেলথ টেকনোলজি দেওয়া হয়। এই ছয়টি বিষয় হল : ল্যাবরেটরি টেকনোলজি, রেডিওগ্রাফি, ডেন্টাল, ফিজিওথেরাপি, রেডিওথেরাপি টেকনোলজি ও স্যানিটারি ইন্সপেকটরশিপ।

৪.৪ এই ছয়টি বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তদের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

ল্যাবরেটরি কৌশলী	–	১,২৯৫
রেডিওগ্রাফি কৌশলী	–	৬৪২
ডেন্টাল কৌশলী	–	১৭০
ফিজিওথেরাপি কৌশলী	–	৩৫
রেডিওথেরাপি কৌশলী	–	১৩
স্যানিটারি ইন্সপেকটর	–	৪১৩

এই কোর্সে বর্তমানে ন্যূনতম নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া ছাত্র নেওয়া হয়। এখন থেকে এর জন্য এসএসসি পাস হওয়া দরকার। কারণ এখান থেকে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

সুপারিশ

অধুনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধির দরুন এবং যন্ত্রপাতি ও তার ব্যবহারের প্রভূত আধুনিকীকরণের ফলে এই হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট দুটির শিক্ষাক্রমের প্রসার ও আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত করার জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এই দুটি ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ টেকনোলজি ছাড়া গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসহকারী তৈরির জন্য পাঁচটি শিক্ষা কেন্দ্র আছে। এগুলোকে MATS (Medical Assistant Training School) বলা হয়। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে এইচএসসি পাস হতে হয় এবং তিন বৎসরের কোর্স করে পরীক্ষা দিতে হয়। পাস করার পর এদের স্বাস্থ্য সহকারী বলা হয়। এরা এখন সব গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য সহকারী হিসেবে কাজ করে আসছে।

চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়

১. কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন মেডিকেল কলেজগুলোতে এমবিবিএস ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয়। অথচ এ কলেজগুলোর পরস্পরের মধ্যে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি, প্রশাসনিক ইত্যাদি ব্যাপারে মত বিনিময়ের কোন ব্যবস্থা নেই। অতএব, মানের দিক দিয়ে

উপরিউক্ত ডিগ্রির কিছুটা তারতম্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই অনতিবিলম্বে একটি আন্তঃমেডিকেল কলেজ বোর্ড গঠিত হওয়া উচিত।

২. ১৯৮৮ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও বলা হয়েছে যে, দেশের চিকিৎসা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুক্ত। এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের সমস্যা নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত যে, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যাবলি ও শিক্ষার মানের ব্যাপারে তাদের প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেওয়ার সময় ও সুযোগের অভাব দেখা দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে এ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন নেতৃত্ব পাচ্ছে না তেমনি এদের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়ন্ত্রণও অত্যন্ত শিথিল।

এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসা শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতিতে এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কাঠামো পদ্ধতিতে এই শিক্ষার যথোপযুক্ত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। তাই দেশে কৃষি শিক্ষা ও প্রকৌশল শিক্ষার ন্যায় চিকিৎসা শিক্ষার জন্যও পৃথক, স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন।

৩. চিকিৎসা শিক্ষাই একমাত্র বিশিষ্ট শিক্ষা যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত নয়। মেডিকেল কলেজগুলো প্রশাসনিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, শিক্ষক নিয়োগ ও বদলি ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং এমবিবিএস রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার ব্যাপারে বিএমডিসি–এর নিয়ন্ত্রণাধীন। অর্থাৎ মেডিকেল কলেজগুলো তিন কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন।

৪. মেডিকেল কলেজগুলো স্বায়ত্তশাসিত না হওয়াতে নানাভাবে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ বাধাগ্রস্ত হয়। চিকিৎসা শিক্ষায় অধ্যাপকগণ শিক্ষার দায়িত্বের সঙ্গে রোগী চিকিৎসার দায়িত্বের সিংহভাগও বহন করেন অর্থাৎ সার্ভিস হাসপাতালের কাজের চাপে শিক্ষা ও গবেষণায় যথেষ্টভাবে সময় দিতে পারেন না। মেডিকেল কলেজের সঙ্গে অবশ্যই চিকিৎসা শিক্ষার ল্যাবরেটরি হাসপাতাল থাকবে। তবে সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল হিসেবে থাকলে অধ্যাপকদের অধিকতর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

তাই চিকিৎসা শিক্ষার ও গবেষণার আরও সুষ্ঠু বিকাশ লাভের জন্য একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অনেকদিনের দাবি। সুখের বিষয় বর্তমান সরকার আইপিজিএমআরকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা দিয়ে এ দাবির যথার্থতা মেনে নিয়েছে। আমরা এজন্য সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি সরকার অচিরেই এর সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থা নেবে।

অধ্যায়—১২

বিজ্ঞান শিক্ষা

১. **ভূমিকা**

বিজ্ঞানের মূল কাজ হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মগুলো ক্রমাগত শুদ্ধতর রূপে জানা ও তার প্রয়োগে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা। ক্রমাগত নতুন উদ্ভাবন, আবিষ্কার, সংযোজন, সংশোধন ও রূপান্তরের ভেতর দিয়ে বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানের জ্ঞান বিকাশ লাভ করছে। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির মূলে কাজ করছে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, পরিমাপণ, তত্ত্বনির্মাণ, বিশ্লেষণ ও গাণিতিক যুক্তিপ্রয়োগ এবং সমগ্র তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয়সাধন। এখানে উপাত্ত সংগ্রহ, আপাতদৃশ্যমান ও পর্যবেক্ষণসাধ্য ঘটনার জগতকে সম্প্রসারিত করার জন্য যন্ত্র নির্মাণ ও যন্ত্র উদ্ভাবন এমনকি নতুন ভাষা, গণিত ও চিত্রকল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। বিজ্ঞানের এই সজীব গতিশীলতা, পরিবর্তনীয়তা ও সৃজনশীলতা বিজ্ঞান শিক্ষার ধারায় সুনিশ্চিত করতে হবে।

বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারে বিজ্ঞানীদের যে কঠোর শ্রম, সাধনা ও আত্মত্যাগ তার আড়ালে কাজ করে বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা, প্রেরণা ও সৌন্দর্যবুদ্ধি। বিজ্ঞান তাই যান্ত্রিক নয়, মানবিক। বুদ্ধিগত শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত বিজ্ঞানের জ্ঞান অসংখ্য বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির ভাগ করে নেওয়া অভিজ্ঞান। বিজ্ঞান সমগ্র জাতির একটি যৌথ অভিযান, একটি সার্থক আয়োজন। এর জ্ঞান বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ক্রমাগত সঞ্চারিত ও সমন্বিত এক পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক উপলব্ধি সৃষ্টি করে।

২. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

২.১ বর্তমানকালে বিজ্ঞান ভৌগোলিক, জাতীয় ও ভাষাগত সীমানা অতিক্রম করে সর্বজনীন, ব্যাপক এবং গভীর এক কর্মধারারূপে আত্মপ্রকাশ করছে, যা বিশ্বসংস্কৃতির সবগুলো বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত। বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন তারা প্রতিভা বিকাশ, জ্ঞানের সাধনা ও সৃষ্টিশীলতায় আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারে।

২.২ বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষা ও মানবিক শিক্ষার যে পারস্পরিকতা ও পরিপূরকতা তা উপলব্ধি করে একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার অংশরূপে বিজ্ঞান শিক্ষা কাজ করবে।

২.৩ বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য যে শুধু প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগে এক শ্রেণীর মানুষকে শক্তিশালী করে তোলা তা নয়, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা। এর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানের সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। সমাজের কল্যাণে বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমেই এরূপ যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে। বিজ্ঞানের শিক্ষা এমন খাতে প্রবাহিত করতে হবে যেন শিক্ষার্থীর মন এর কল্যাণকর দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে শিক্ষার সব স্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষা উক্ত উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিজ্ঞান শিক্ষার যে অগ্রগতি সম্পাদনে সমর্থ হয়েছে আমরা তার তুলনায় বহু পশ্চাতে পড়ে আছি। এ অবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষাকে ব্যাপকতর এবং অন্যান্য দেশের মানের সমকক্ষ করতে হবে।

৩. বিজ্ঞান শিক্ষার স্তরভাগ, বর্তমান অবস্থা ও সুপারিশ

বিজ্ঞান শিক্ষার চারটি স্তর থাকবে। এগুলো হল : প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তর।

৩.১ প্রাথমিক স্তর : প্রথম ভাগ

এ স্তরে দুটি উপস্তর থাকবে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষা হবে প্রথম প্রাথমিক স্তর। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা হবে দ্বিতীয় প্রাথমিক স্তর।

বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হবে। বস্তুত শিশুরা তাদের অনুসন্ধিৎসা ও পর্যবেক্ষণপ্রবণতায় এক জন প্রকৃত বিজ্ঞানীর সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এই সহজাত বৈজ্ঞানিকসুলভ মানসিকতা ও প্রশ্ন করার স্বাধীনতা বাধাপ্রাপ্ত ও নিরুৎসাহিত হয়ে আসছে। শিশুদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে প্রকৃতির ঘটনামালা ও সহজ নিয়মগুলোর সঙ্গে পরিচিত করে। শিশুর বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু হতে হবে সাহিত্যপাঠের আবহে, শিশুর অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে দৃষ্টান্ত নিয়ে। পরীক্ষা করার ও নতুন উপলব্ধি লাভের আনন্দ যাতে শিশু লাভ করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

শিশুদের বুঝতে দিতে হবে যে বিজ্ঞানের জ্ঞান বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন এবং ক্রমাগত সংশোধন ও রূপান্তরের ভেতর দিয়ে শুদ্ধতর রূপে প্রকাশ করেন। সক্রিয় ও সজীব অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে বিজ্ঞানীরা এই জ্ঞান সৃষ্টি করছেন। বিজ্ঞানের বিকাশের পথ তাই উন্মুক্ত ও অন্তহীন।

শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও প্রশ্ন করার প্রবণতাকে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন। সেই সঙ্গে সঠিক তথ্য প্রদান করে শিক্ষার্থীর ভুল সংশোধন করবে।

এই উদ্ভাবনমূলক বিজ্ঞান শিক্ষা দুটি কারণে শিক্ষার্থীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত উপাত্ত ও তথ্য অপরিবর্তনীয় নয়। শিক্ষার্থী বড় হয়ে যখন তার ছোটবেলার শেখা তথ্য ব্যবহার করতে চাইবে, দেখবে অনেক তথ্যের পরিবর্তন ও সংশোধন ঘটেছে। দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান যে অপরিবর্তনীয় নীরস কিছু তথ্যের সংগ্রহ নয়, প্রকৃতির রহস্যোদ্‌ঘাটনের একটি সৃজনশীল, সক্রিয় ও আনন্দপূর্ণ কর্মধারা—এই সত্যটি যাতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী লাভ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। পাঠের বিষয় নির্বাচন, পাঠ্যবই রচনা ও পাঠদানের পদ্ধতিতে এ নিশ্চয়তা প্রতিফলিত হতে হবে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রকৃতি পাঠ, পরিবেশ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্ব পাবে। দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে, যেমন কৃষিকাজে, গৃহনির্মাণে, কলকারখানায় নানা সামগ্রীর উৎপাদনে, পথঘাট ও বাঁধ নির্মাণে এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে প্রয়োগ চলছে সে দিকে পাঠদানের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে হবে।

প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ঘটনার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিমূর্ত ধারণা প্রদান যথাসম্ভব সীমিত রাখতে হবে। প্রকৃতি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি সম্পর্কে শিশুরা যাতে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে সেজন্য নানা চিত্র প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও নানা সহজ পরীক্ষণের আয়োজন থাকবে।

শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সহজলভ্য ও সরল হবে। বিজ্ঞান শিক্ষক ছাত্রদের সহযোগিতায় এগুলো নির্মাণ করতে পারবেন। এ জন্য যন্ত্রনির্মাণ ও বৈজ্ঞানিক প্রকল্প তৈরি এবং পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের সহায়তাদানকারী বই রচিত হবে। প্রদর্শনমূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যন্ত্রনির্মাণের কাজ নির্দিষ্ট পাঠদানের বাইরে বিজ্ঞান মেলার মাধ্যমে ঘটতে পারে।

বিজ্ঞানের বইয়ে যথাসম্ভব আধুনিকতম আবিষ্কারের ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সহজভাবে উপস্থাপিত হতে হবে। বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানের বিভিন্নক্ষেত্রে যেসব আবিষ্কার চলছে এবং আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ও প্রচেষ্টা চলছে তার প্রতিফলন আকর্ষণীয় বর্ণনায় বইতে থাকবে।

শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানকে অতীতের বা বিদেশের ব্যাপার বলে শুধু জানবে না, নিজস্ব সমাজ ও কালের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে সম্পর্ক এবং ভবিষ্যতে যে সম্ভাবনার দ্বার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্মোচিত করতে পারে সে দিকে শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করবে।

বিজ্ঞানের বিষয়গুলো অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন তথ্যরূপে উপস্থিত না হয়ে একটি সমন্বিত সজীব কর্মকাণ্ডরূপে বিজ্ঞানের বইতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বিজ্ঞানের নানা যন্ত্রপাতির বর্ণনা বিজ্ঞানের বইকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তাই এ ধরনের বর্ণনা পরিহার করতে হবে।

ছোটদের হাতে কলমে প্রযুক্তি কৌশল শেখানো বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য নয়। বরং বিভিন্ন যন্ত্র নির্মাণে বিজ্ঞানের মূল যে নীতি কাজ করছে তার সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করার দিকে শুধু লক্ষ রাখলেই হবে।

৩.২ প্রাথমিক স্তর : দ্বিতীয় ভাগ — ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী

এ উপস্তরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একটি সমন্বিত কোর্স থাকবে। জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা পৃথক পৃথক শৃঙ্খলারূপে এই পর্যায়ে চিহ্নিত হলেও এদের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরিপূরকতা রয়েছে সেই ব্যাপারটি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে।

শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো এ উপস্তরে বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে পরিমাণগতভাবে গাণিতিক পদ্ধতিতে ও কার্যকারণের আলোকে উপস্থাপিত হবে।

অষ্টম শ্রেণীর পর অনেক শিক্ষার্থী বিজ্ঞান শাখার পরিবর্তে মানবিক, সমাজবিজ্ঞান বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য পৃথক হয়ে পড়বে, অনেকেই আবার এই পর্যায়ে শিক্ষা শেষ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। ফলে এ স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাকে এক ধরনের পূর্ণাঙ্গতা ও সার্বিকতা দিতে হবে।

৩.৩ মাধ্যমিক স্তর

মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগের বাইরে অন্য সকল শাখায় সাধারণ বিজ্ঞান আবশ্যিক বিষয়রূপে পড়ানো হবে। এতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রধান বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। বিজ্ঞানের মানবিক ও কল্যাণকর দিক, এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক, বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক, বিজ্ঞানের ইতিহাস ও দর্শন যথাসম্ভব সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে পড়ানো হবে। মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায়।

মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার মান ও ধারা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ধাপে ধাপে উন্নততর শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করতে হবে। এজন্য পাঠ্যসূচি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যবই ও শিক্ষকের মান দ্রুত উন্নত করতে হবে।

উন্নত ও আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞানের পাঠ্যবই রচনার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি নির্বাচন এবং প্রয়োজনবোধে ইংরেজি ভাষায় রচিত অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ পাঠ্যবইয়ের অনুসরণে বাংলায় বিজ্ঞানের পাঠ্যবই লেখা যেতে পারে।

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রতিটি স্তরে, বেতার, টেলিভিশন, অডিও ভিডিও রেকর্ড, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট ইত্যাদি ইলেকট্রনিক মাধ্যম যথাসম্ভব ব্যবহার করতে হবে।

পাঠ্য বইয়ে অসংলগ্ন ধারণা বা তথ্য প্রদানের পরিবর্তে মৌলিক ধারণার ভিত্তিতে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো উপস্থাপিত হবে। মাধ্যমিক স্তরেই গণিতের আধুনিক ধারণা সহজভাবে দৃষ্টান্ত সহকারে উপস্থাপিত হতে পারে।

ক্রমবিস্তারমান জ্ঞানের জগতের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করার ও বিচিত্র বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পাঠ্যবই ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

উদ্ভাবনমূলক ও উপলব্ধিভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যোগ্য শিক্ষক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য মেধাবী ও সৃজনশীল স্নাতকদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের সান্নিধ্যে এনে এবং সর্বক্ষণ আধুনিকতম জ্ঞানে সমৃদ্ধ রাখতে সঞ্জীবনী কোর্স প্রদান করতে হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করার জন্য শিক্ষার্থী যাতে তাৎক্ষণিকভাবে নিজের জীবনে বিজ্ঞান শিক্ষালাভের সুফল দেখতে পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৪ বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় সব জ্ঞান ও উপলব্ধি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও নির্বাচিত পাঠ্যসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি শহরে একটি 'বিজ্ঞান কেন্দ্র' গড়ে তুলতে হবে। এইসব কেন্দ্রে বিভিন্ন পেশাদার সমিতির সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞান ক্লাব ও বৈজ্ঞানিক সংগঠন কাজ করবে। সৌখিন উদ্ভাবকরা স্বাধীনভাবে এই কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করবেন ও পরিকল্পনা করবেন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণ। এছাড়া বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান পাঠাগার ও ওয়ার্কশপ থাকবে।

৩.৫ স্নাতক স্তর

স্নাতক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষা সাধারণভাবে চার বছর মেয়াদি হবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্নতমানের কিছু কলেজ ছাড়া অনেক ডিগ্রি কলেজে এই মুহূর্তে চার বছরের স্নাতক কোর্স প্রদান সম্ভব হবে না বলে, সাময়িকভাবে এইসব কলেজে তিন বছরের স্নাতক কোর্স থাকবে।

তিন বছরের বি এস সি কোর্সে বারটি পত্র থাকবে। এই পর্যায়ে বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত শাখাসমূহের কোর্স থাকবে : *গণিত (জ্যোতির্বিদ্যা একটি পত্রসহ), পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, কম্পিউটারবিজ্ঞান, ভূগোল, ফার্মাকোলজি, পুষ্টিবিজ্ঞান, প্রাণরসায়ন, মনোবিজ্ঞান* ইত্যাদি। প্রতিটি বিষয়ে এক শ নম্বরের তিনটি পত্র থাকবে। তিন বছরের স্নাতক শ্রেণীতে বারটি পত্র নিতে হবে। এর মধ্যে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে থাকবে দু শ নম্বরের গণিত (জ্যোতির্বিদ্যা একটি পত্রসহ), দু শ নম্বরের পদার্থবিদ্যা ও দু শ নম্বরের রসায়নবিদ্যা। বাকি ছয় শ নম্বরের ছয়টি পত্র ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নেওয়া যাবে।

চার বছরের স্নাতক ডিগ্রির বেলায় একটি প্রধান ও দুটি সহায়ক বিষয় থাকবে। মূল বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন দুটি বিষয় সহায়করূপে নেওয়া যাবে। মূল বিষয় ও সহায়ক বিষয়গুলোর নম্বর সমন্বিত করে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অনার্স বা বিশেষ ক্লাস প্রাপ্তি নির্ধারিত হবে।

কোন শিক্ষার্থী যদি চার বছরের কোর্স সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয় এবং অন্তত অর্ধেক কোর্স সম্পন্ন করে, তা হলে তাকে এই মর্মে একটি সনদ দেওয়া যেতে পারে যা নিম্ন স্নাতক বা Lower graduation রূপে গণ্য হবে।

চার বছরে স্নাতক ডিগ্রি প্রান্তিক ডিগ্রিরূপে গণ্য করা হবে। ফলে উচ্চতর স্তরে শিক্ষা দান বা গবেষণার কাজে নিযুক্ত হওয়া ভিন্ন অন্য সকল ক্ষেত্রে এই স্নাতক ডিগ্রি পর্যাপ্ত বলে গণ্য করা হবে।

৩.৬ স্নাতকোত্তর স্তর

বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষক ও ভৌত সুবিধাদিসহ উচ্চমানের নির্বাচিত কলেজেই শুধু স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা যাবে। এজন্য গবেষণাগার, প্রয়োজনীয় বই ও জার্নালসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, গবেষণার অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক থাকতে হবে।

স্নাতকোত্তর ডিগ্রিগুলো হবে এমএসসি, এমফিল ও পিএইচডি। তিন বছরের স্নাতকোত্তর স্তরে শুধু উচ্চতম গ্রেডপ্রাপ্তরাই সুযোগ পাবে। চার বছরের ডিগ্রি প্রাপ্তদের জন্য ন্যূনতম এক বছর লাগবে এমএসসি ডিগ্রি অর্জনে, দু বছর লাগবে এমফিল ডিগ্রি পেতে এবং ন্যূনতম তিন বছর লাগবে পিএইচডি ডিগ্রি পেতে।

তিন বছরের স্নাতকদের দু বছর লাগবে এমএসসি করতে। এমএসসি ডিগ্রি করার পরই শুধু এরা এমফিল বা পিএইচডি কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য গবেষণায় মৌলিক অবদান রাখতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কোর্সওয়ার্ক করতে হবে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ছাত্র হিসেবে উচ্চ মেধাসম্পন্ন সৃজনশীল প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে। এই শিক্ষা যাতে আন্তর্জাতিক মানের হয় সে লক্ষ্যে যোগ্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালিত হতে হবে।

শিক্ষাদানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণায় নিয়োজিত থাকা অপরিহার্য।

দীর্ঘ মেয়াদি ও স্বল্প মেয়াদি জাতীয় সমস্যা সমাধানে এবং উন্নয়নের কৌশলগত অবস্থান নির্ধারণে গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরের শিক্ষা হবে জ্ঞানদান, সুনাগরিক সৃষ্টি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য এবং স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান শিক্ষা হবে নতুন জ্ঞান ও নতুন চেতনা সৃষ্টির ভেতর দিয়ে সামাজিক অগ্রগতির জন্য তোরণ সৃষ্টি।

দেশের উচ্চশিক্ষার ও প্রযুক্তির শিক্ষাকে গবেষণা ও জ্ঞানসৃষ্টির আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য ভৌত কাঠামো সৃষ্টি, উচ্চমানের জনশক্তি গড়ে তোলা, অর্থ বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সৃষ্টি ও উন্নত অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করতে হবে।

বস্তুত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জাতীয় উন্নয়নের জন্য সার্থকভাবে কাজে লাগাতে হলে, মৌলিক গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা, উন্নয়ন গবেষণা, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের যে উদ্ভাবন চক্র তা সম্পন্ন করতে হয়।

তথ্য ও জ্ঞানের বিস্ফোরণ একদিকে যেমন জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে গভীর, জটিল, গূঢ় ও নির্বাচিত করে তুলেছে, ফলে আপাতবিচ্ছিন্ন নানা জ্ঞানের শাখার উদ্ভব ঘটেছে বিশেষজ্ঞের বিষয়রূপে, তেমনি জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তার জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে আন্তঃমিল, পারস্পরিকতা ও পরিপূরকতা দিয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখার এই যে আপাত পরস্পরবিরোধী দুই বৈশিষ্ট্য, যথা একই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও নির্বাচিত হয়ে ওঠা এবং পারস্পরিকতায় পরিপূরক হয়ে ওঠা, তা ধারণ করতে পারে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে প্রত্যেক গবেষক তার নির্বাচিত বিষয় নিয়ে জ্ঞানের সীমান্তে পৌঁছার স্বাধীনতা যেমন পাবে, তেমনি বিভিন্ন শাখার জ্ঞান সম্মিলিতভাবে জ্ঞানের যে বিকাশমান দিগন্ত সৃষ্টি করে , তার প্রভাবকে অনুভব করবে।

সব বিশ্ববিদ্যালয়ই বিভিন্ন বিভাগ ও অনুষদের সমন্বয়ে যথার্থ অর্থে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠবে। বিষয়ভিত্তিক বা অনুষদভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত না হয়ে এতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সুস্থ মিথস্ক্রিয়া যেমন ঘটাতে পারবে, তেমনি একটি ব্যবস্থাপনাগত সুবিধাও সৃষ্টি হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান গভীরভাবে নির্ভরশীল এর গবেষণার মান দ্বারা। তাই, গবেষণার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার পরিবেশ উন্নত এবং গবেষকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

পরীক্ষাগার ও গবেষণাগার উন্নয়নের জন্য ইকুইপমেন্ট বোর্ড পুনঃস্থাপন করতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে যন্ত্র উদ্ভাবন ও উন্নয়ন বস্তুত প্রযুক্তির অগ্রগতি ও শিল্পায়নের মূল ভিত্তিরূপে কাজ করেছে। স্থানীয়ভাবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রনির্মাণ ও উদ্ভাবন বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে গভীর এক মাত্রা সংযোজন করে। এই আয়োজন শুধু স্থানীয় নির্মাণ বস্তুর ব্যবহার ও ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টিকেই উৎসাহিত করে না, স্থানীয় মেধা ও সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করে। অনুন্নত দেশগুলোর পশ্চাদ্‌পদতার অন্যতম প্রধান কারণ যন্ত্রনির্মাণ, উদ্ভাবন ও পরীক্ষামূলক কাজে অনীহা ও অদক্ষতা। তাই, গবেষণার জন্য উন্নত আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয়ভাবে গবেষণাগার গড়ে তুলতে হবে। এই গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি একই স্থানে স্থাপনের প্রয়োজন নেই। শুধু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা হবে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্তিযোগ্য বিশেষজ্ঞের ভিত্তিতে বিভিন্ন যন্ত্র স্থাপিত হবে, যা ব্যবহার করার স্বাধীনতা সবার থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রের পাঠাগারের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে হবে। আধুনিক ইলেকট্রনিক্স মেইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ গবেষণার কাজে ব্যবহারের অগ্রগণ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

গবেষণার অগ্রগতি যাচাই ও গবেষণার ফল জাতীয়ভাবে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিষয়ভিত্তিক জাতীয় গবেষণা জার্নাল প্রকাশ করতে হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সাহায্য প্রয়োজন হবে। বিদেশী ঋণ ও সাহায্য গ্রহণের একটি নির্দিষ্ট অংশ বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জন্য পূর্বনির্ধারিত থাকবে। শিক্ষক ও গবেষক নিয়োগের ক্ষেত্রে গবেষণায় অভিজ্ঞতা, গবেষণা নির্ভর উচ্চ ডিগ্রি, যথা এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্তদের অধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, পাঠ্যবিষয়ের দ্রুত পরিবর্তন, পরীক্ষণযন্ত্র ও গবেষণাগারে নতুন যন্ত্রের ব্যবহার ও গবেষণায় নতুন কৌশলের উদ্ভব এবং সর্বোপরি তথ্য বিস্ফোরণের ফলে শিক্ষাপ্রদান একটি জটিল ও কৌশলগতভাবে বিশেষ পর্যায়ের কর্ম হয়ে উঠেছে। ফলে আধুনিক শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যবহার ও

তথ্য নেটওয়ার্কের যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য গবেষণার অভিজ্ঞতা ছাড়াও শিক্ষাদানের কৌশল ও দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য হয়ে উঠছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খণ্ডকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা প্রয়োজন। এ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকবে বক্তৃতা, টিউটোরিয়াল, সেমিনার, ল্যাবরেটরি, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, ছাত্রবৃত্তি, ভাষা ল্যাবরেটরি ব্যবহারের কৌশল ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অথবা বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব আয়োজনে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।

৫. বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণাকে দেশের উন্নয়ন ও শিল্পায়নের সঙ্গে সার্থকভাবে সম্পর্কিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পগবেষণার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে গবেষকগণ পরস্পরকে সহযোগিতা দিতে পারেন এবং দুর্লভ ও উচ্চমূল্যের বিশেষ যন্ত্রপাতি যৌথভাবে কাজে লাগাতে পারেন। এজন্য যৌথ গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ, মতামত ও তথ্য বিনিময় এবং বিশেষজ্ঞদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যায়—১৩

কারবার (বিজনেস) শিক্ষা

১. **ভূমিকা**

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশের সীমিত বস্তুগত সম্পদ, জনসংখ্যার বিপুলতা এবং প্রকট বেকার সমস্যার প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উৎস হিসেবে উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ, পরিচালনা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কারবার শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের অসংখ্য কারবার প্রতিষ্ঠান যথা, সাধারণ ব্যবসায়, ব্যাংকিং, বীমা, আমদানি–রফতানি, উৎপাদন, সেবামূলক সহায়ক প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন স্তরের বিশাল কর্মীবাহিনীর উপযুক্ত জ্ঞান আহরণ প্রয়োজন। দেশজ উৎপাদনে নিয়োজিত বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়ন বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত ও কারিগরি জ্ঞান ছাড়াও কারবার পরিবেশ–ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, বাজারজাতকরণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন হয়। এ জ্ঞানের শাখার বিস্তৃতি শুধু শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমিত নয়। এর প্রয়োজন বা গুরুত্ব প্রায় সব শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। শত শত বছর ধরে বিচিত্রমুখী শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার প্রয়াসে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যসমূহে ব্যবস্থাপনা রীতি–নীতি ও কলা–কৌশলের উন্নয়ন ঘটেছে। শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের শাখাসমূহের সমন্বিত ব্যবস্থাকে কারবার (বিজনেস) শিক্ষা বলা হয়। এছাড়া কারবার শিক্ষা যথাযথভাবে সমাপ্ত করতে পারলে চাকরির বিকল্প হিসেবে ব্যবসাকে আত্মকর্মসংস্থানের জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বর্তমান বিশ্বে বাজার অর্থনীতির প্রচলন, বিশ্ববিস্তৃত পণ্যের বাজার এবং তীব্র প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও তার সহায়ক কার্যাবলি প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তাই পৃথিবীর সকল দেশেই কারবার শিক্ষার গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. **বর্তমান অবস্থা**

২.১ কারবার শিক্ষা মাধ্যমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। নিম্নে তিনটি স্তরের প্রবহমান অবস্থা ও সমস্যাবলি উল্লেখ করা হল :

২.১.১ মাধ্যমিক স্তর

নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে (১) ব্যবসায় পরিচিতি ১০০ এবং (২) হিসাব বিজ্ঞান ১০০ নম্বর বাধ্যতামূলক। ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অর্থনীতি, কম্পিউটার শিক্ষা, পরিসংখ্যান, উদ্যোগ–বিজ্ঞান, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেডিং, বাণিজ্যিক ভূগোল, আরবি/সংস্কৃত/পালি এই বিষয়গুলোর যে কোন একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়তে পারে। মাদ্রাসা শিক্ষা শাখায়ও তেমনি দাখিল স্তরে হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবসায় পরিচিতি নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে বাধ্যতামূলক। ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে কম্পিউটার শিক্ষা, বাণিজ্যিক ভূগোল ও অর্থনীতি বর্তমানে চালু আছে।

২১.২ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর

ব্যবসায় শিক্ষা ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ এবং হিসাব বিজ্ঞান এ দুটি বিষয়ে ৪০০ নম্বরের কোর্স বাধ্যতামূলক। তদুপরি নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক হিসেবে (১) ব্যবসায়-উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা (২) অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল (৩) অর্থায়ন, উৎপাদন ও বিপণন (৪) কম্পিউটার বিজ্ঞান (৫) পরিসংখ্যান (৬) কৃষি বিজ্ঞান (৭) সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয় থেকে যে কোন একটি নৈর্বাচনিক ও একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার আলিম স্তরে — (১) ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ (২) হিসাব বিজ্ঞান এই দুটি বিষয় বাধ্যতামূলক। এছাড়া (১) অর্থায়ন, উৎপাদন ও বিপণন (২) অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল (৩) গণিত ও পরিসংখ্যান (৪) কম্পিউটার বিজ্ঞান (৫) সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা (৬) ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা এ বিষয়গুলো থেকে যে কোন একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়তে পারবে।

২১.৩ উচ্চতর কারবার শিক্ষা

বাংলাদেশে উচ্চতর কারবার বিষয়ক শিক্ষার প্রোগ্রাম বলতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রোগ্রাম বোঝায়। বর্তমানে উচ্চতর কারবার শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণিত ডিগ্রি প্রোগ্রাম রয়েছে :

(ক)	বিকম (পাস)	:	দু বছর মেয়াদি
(খ)	বিকম (অনার্স)	:	তিন বছর মেয়াদি (কোর্স ও সনাতন পদ্ধতি)
(গ)	বিবিএ	:	চার বছর মেয়াদি
(ঘ)	বিবিএ (অনার্স)	:	চার বছর মেয়াদি
(ঙ)	এমবিএম	:	এক বছর মেয়াদি
(চ)	এমকম	:	দু /এক বছর মেয়াদি (অনার্স কোর্সের ছাত্রদের জন্য এক বছর এবং পাস গ্র্যাজুয়েটদের জন্য দু বছর মেয়াদি)
(ছ)	এমবিএ	:	দেড় বছর মেয়াদি
(জ)	এমবিএ	:	এক বছর মেয়াদি
(ঝ)	এমবিএ	:	দু বছর মেয়াদি
(ট)	পিএইচডি	:	তিন বছর মেয়াদি

এসব প্রোগ্রাম দেশের বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় (যথা : ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর ও ইসলামী), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিচালনা করছে। বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে স্নাতক প্রোগ্রামের মেয়াদ, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এবং ডিগ্রির নামের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সাম্প্রতিককালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার পর বি কম (পাস), বি কম (অনার্স), এমকম (প্রিলি) এবং এম কম (ফাইনাল) প্রোগ্রামসমূহ পরিচালনার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলোকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স পদ্ধতির বি কম (অনার্স) বিলুপ্তির পথে। অতি সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ও ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চার বছর মেয়াদি বিবিএ কোর্স প্রচলন করেছে। অন্যদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছর মেয়াদি বিবিএ ডিগ্রি প্রোগ্রাম রয়েছে। বিবিএ প্রোগ্রামে যাদের পারফরম্যান্স অত্যন্ত ভাল তাদের অনার্স দেওয়ার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ইতোমধ্যে দেশের বিকম (পাস) ডিগ্রির মানের মধ্যে সমতা আনয়নের জন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০০ নম্বরের ১০টি কোর্সের মধ্যে ব্যবসায় শিক্ষার প্রধান চারটি বিষয় এবং আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ অন্তর্গত করার সুপারিশ করা হয়। বিকম (অনার্স) কোসগুলোকে Background Course, Basic Tools Course এবং Specialised Course হিসেবে বিভক্ত করে বিভাগীয় পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করা হয়। মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম, এম ফিল প্রোগ্রামের কোর্সগুলো পুনর্বিন্যাস করার সুপারিশ করা হয়। পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত বিকম (অনার্স) এবং এম কম পর্যায়ে নতুন কিছু কোর্স অন্তর্ভুক্তি হয়। এম কম ডিগ্রি পর্যায়ে দুই মাস মেয়াদি ইন্টার্নিশিপ কর্মসূচি প্রচলন ও উচ্চতর বাণিজ্য বিষয়ে ডিগ্রি প্রোগ্রাম কোর্স পদ্ধতি প্রচলনের সুপারিশ করা

হয়। বর্তমানে প্রচলিত ডিগ্রির নাম পরিবর্তন করে বিবিএ, এমবিএ নামকরণের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি, গবেষণার উন্নয়নের কতগুলো সুনির্দিষ্ট সুপারিশও করা হয়। এসব সুপারিশের কিছু কিছু বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হলেও অধিকাংশ সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয় নি।

বর্তমান ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটদের গুণগত মান যুগোপযোগী ও যথার্থ নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন ডিগ্রি প্রোগ্রামের পাঠ্যসূচি উন্নতমানের হলেও প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ না করার ফলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান তাত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এর ফলে বাস্তবতার সঙ্গে শিক্ষার ব্যবধান সৃষ্টি হয়। তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবজ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধা না থাকায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষার কার্যকারিতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। কারবার (Business) শিক্ষার ব্যবহার ডিগ্রি কর্মসূচির নামের মধ্যে পার্থক্য, সনাতন ও কোর্স পদ্ধতির সহ–অবস্থান এবং ডিগ্রি প্রোগ্রামের মেয়াদের তারতম্য এবং যুগোপযোগী বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রচলন এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতির অভাবকেই নির্দেশ করে। এ অবস্থায় কারবার শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসার যেটুকু হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে অপরিকল্পিতভাবে অর্জিত হয়েছে।

বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কারবার বিষয়ক শিক্ষার বিন্যাসের এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্সের বিন্যাস ও ধারবাহিকতায় অসামঞ্জস্য বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উচ্চতর কারবার বা বিজনেস বিষয়ক শিক্ষায় আগ্রহী ছাত্র/ছাত্রীদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গণিত বিষয়টি পড়া আবশ্যক, কিন্তু বর্তমান পাঠ্যসূচির কাঠামোতেও কোর্সটি পড়াবার ব্যবস্থা নেই। বি কম (পাস) ও অনার্স এবং এম কম (প্রিলি) কোর্সগুলোর বিন্যাসকরণে নানাবিধ অসঙ্গতি বিদ্যমান। বিবিএ প্রাপ্ত কিছু গ্র্যাজুয়েট শ্রমের বাজারে প্রবেশ করেছে। এর ফলে ব্যবসা বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগদাতাদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে।

বিগত দুই দশকে কারবার শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে বেশ কয়েকবার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

২.২ কারবার শিক্ষার সমস্যাবলি

কারবার শিক্ষা ব্যবস্থায় বিচিত্রমুখী সমস্যা বিদ্যমান থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। কারবার বিষয়ক শিক্ষায় যে সমস্ত সমস্যা বিদ্যমান সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

২.২.১ বিভিন্ন স্তরের কারবার বিষয়ক শিক্ষার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট নয়। এ কারণে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচির মধ্যে যথেষ্ট অসামঞ্জস্য বিদ্যমান।

২.২.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রধানত দ্বিমুখী কারবার বিষয়ক শিক্ষা বর্তমান থাকায় উচ্চশিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়।

২.২.৩ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিষয়বস্তু এক থাকলেও ডিগ্রির সময়কাল, নামকরণ ও কোর্স সংখ্যার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। এতে ডিগ্রি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দেয়।

২.২.৪ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কারবার শিক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যেও বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। এর ফলে ডিগ্রির সমতা বিধান অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়ীভূত হয়।

২.২.৫ কলেজের শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে তাঁদের শিক্ষণ ক্ষমতার সম্প্রসারণ অত্যন্ত পরিমিত।

২.২.৬ অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কারবার বিষয়ক শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদির অভাব রয়েছে।

২.২.৭ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্র–শিক্ষক অনুপাত অত্যন্ত উচ্চ।

২.২.৮ দেশজ শিল্প ও ব্যবসাভিত্তিক পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তক রচিত না হওয়ার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থার ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না।

২.২.৯ কলেজ স্তরে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণের অভাবে নকলের প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।

২.২.১০ বেসরকারি কলেজগুলোর ব্যবস্থাপনায় কিছু কিছু অশুভ তৎপরতার কারণে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় শিক্ষা–কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

২.২.১১ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারবার বিষয়ক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তি ফি ও অন্যান্য ফি এবং পরীক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে নানাবিধ অস্পষ্টতা বিদ্যমান।

২.২.১২ প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার বিনিয়োগের সফলতার ওপর কারবার বিষয়ক শিক্ষার প্রভাব থাকলেও জাতীয় পর্যায়ে এই শিক্ষা ফলপ্রসূতা বৃদ্ধির জন্য অগ্রগণ্য হতে পারে নি।

৩. কারবার শিক্ষার লক্ষ্য

৩.১ মাধ্যমিক স্তর – ১

৩.১.১ কারবার শিক্ষা ও জগৎ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া ;

৩.১.২ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর নিম্নস্তরের দক্ষ কর্মী তৈরির সহায়তা করা ;

৩.১.৩ আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করা ;

৩.১.৪ শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা।

৩.২ মাধ্যমিক স্তর – ২

৩.২.১ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর নিম্নস্তরের দক্ষ কর্মী সৃষ্টিতে সহায়তা করা ;

৩.২.২ আত্মকর্মসংস্থান/উদ্যোক্তা হতে সহায়তা করা ;

৩.২.৩ উচ্চশিক্ষা লাভের উপযুক্ততা সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

৩.৩ স্নাতক স্তর

৩.৩.১ প্রতিষ্ঠানের আকারভেদে সাংগঠনিক স্তরের নিম্ন বা মাঝারি পর্যায়ে কর্মকর্তা/নির্বাহী/ব্যবস্থাপক/ হিসাব কর্মকর্তা/সরকারি কর্মকর্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা ;

৩.৩.২ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা ;

৩.৩.৩ একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রার্থীকে প্রস্তুত করা ;

৩.৩.৪ শিক্ষার্থীকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে উপযোগী করে গড়ে তোলা।

৩.৪ স্নাতকোত্তর স্তর

৩.৪.১ স্নাতকোত্তর স্তরকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায় : এমবিএ এবং পিএইচডি। এমবিএ প্রোগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য হবে শিক্ষক, প্রশিক্ষক, পরামর্শক ও গবেষক তৈরিতে সহায়তা করা ;

৩.৪.২ পিএইচডি কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হবে এমবিএ স্তরে শিক্ষাদান ও গবেষণা তত্ত্বাবধানের জন্য শিক্ষকদের নৈপুণ্য বৃদ্ধি করা এবং স্বাবলম্বী গবেষক হিসেবে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা।

৪. শিক্ষা ব্যবস্থার আন্তরকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশমালা

৪.১ সাধারণ সুপারিশমালা

৪.১.১ মেধার যথাযথ লালন, সৃজনশীলতার বিকাশ ও মানবিক মূল্যবোধ স্ফুরণের লক্ষ্যে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দূর করতে হবে।

৪.১.২ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে নকল রোধ করতে হবে।

৪.১.৩ দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের জনবলের চাহিদার ভিত্তিতে কারবার শিক্ষার সম্প্রসারণ, পরিমার্জন ও সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৪.১.৪ কারবার বিষয়ক শিক্ষার সকল স্তরে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত রীতি, পদ্ধতি ও সম্ভাব্য উন্নয়ন–চাহিদার আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করতে হবে।

৪.১.৫ কারবার শিক্ষা–কর্মসূচি প্রধানত উদ্যোক্তা, আত্মকর্মসংস্থান, নির্বাহী ব্যবস্থাপক, হিসাব কর্মকর্তা, বাজারজাতকরণ নির্বাহী, ফিন্যান্স নির্বাহী, সহায়ক কর্মী, শিক্ষক ও গবেষক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রানুগ পরিচালিত হতে হবে।

৪.১.৬ কারবার বিষয়ক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

৪.১.৭ বর্তমান বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার অন্যতম পূর্বশর্তদ্বয়ের যথা, পণ্য উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস ও পণ্যের গুণগত উৎকর্ষ সাধনের প্রতি সবিশেষ নজর রেখে শিক্ষার সর্বস্তরে আধুনিক প্রযুক্তি পরিচিতি এবং কম্পিউটার ব্যবহারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.১.৮ কারবার শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

৪.১.৯ কারবার শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিল্প, বাণিজ্য, সেবা, কৃষি ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪.১.১০ এ ব্যাপারে মাধ্যমিক স্তর থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'বিজনেস ক্লাব' গঠনের উৎসাহ দিতে হবে।

৪.১.১১ ছাত্র–শিক্ষকদের সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে শিক্ষার সকল স্তরে গ্রুপ গঠন ও গ্রুপের মাধ্যমে আলোচনা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

৪.১.১২ শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টিকারী নোট/গাইড বুক/সহায়িকার ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকল্পে পাঠদানের পরিসর যথাসম্ভব পাঠ্যপুস্তক এবং গ্রহণযোগ্য পুস্তকের ওপর সীমিত রাখতে হবে।

৪.২ বিশেষ সুপারিশমালা

৪.২ মাধ্যমিক স্তর–১ এর জন্য সুপারিশমালা

৪.২.১ মাধ্যমিক স্তর থেকে কারবার শিক্ষা শুরু করতে হবে।

৪.২.২ মাধ্যমিক স্তরে কারবার পরিচিতি, হিসাব শাস্ত্র, বিপণন, কম্পিউটারের ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে।

৪.২.৩ মাধ্যমিক পর্যায়ে কারবার বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের জন্য কারবার প্রশাসন বিষয়ে ন্যূনপক্ষে স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষক নিয়োগদান আবশ্যিক হতে হবে।

৪.২.৪ মাধ্যমিক স্তরে কারবার বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিশ্বের বিভিন্নদেশে দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাঠদান ক্ষমতা অর্জনের জন্য অন্তত পাঁচ বছর অন্তর প্রত্যেক শিক্ষকের এক অথবা দু মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৪.২.৫ মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারগুলোর জন্য কারবার বিষয়ে প্রকাশিত গ্রন্থাদি প্রতিবছর ক্রয় করতে হবে।

৪.২.৬ মাধ্যমিক স্তরে কারবার বিষয়ে পাঠদানের ফলপ্রসূতা বৃদ্ধির জন্য বছরের প্রথমদিকে শিক্ষকদের কাছ থেকে পাঠ–পরিকল্পনা তৈরি করে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪.২.৭ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটারের সম্ভাব্য ব্যবহার সম্বন্ধে পরিচিতিমূলক প্রায়োগিক জ্ঞানদান করতে হবে।

৪.৩ মাধ্যমিক স্তর – ২ এর জন্য সুপারিশমালা

৪.৩.১ মাধ্যমিক ২য় স্তরে কারবার বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থায় সমতা আনয়নের লক্ষ্যে সাধারণ কোর্সগুলো যথা: বাংলা, ইংরেজি, বাণিজ্যনীতি, হিসাববিজ্ঞান আবশ্যিক করা এবং মাত্র চারটি বিষয় বিশেষ–বিষয় হিসেবে রাখতে হবে।

৪.৩.২ মাধ্যমিক দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষাব্যবস্থায় নম্বর বণ্টন ও পরীক্ষা পদ্ধতি একরকম করতে হবে।

৪.৩.৩ মাধ্যমিক দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ সম্বন্ধে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বছরে অন্তত একবার শিক্ষার্থীদের নিকটস্থ কারখানা বা কারবার প্রতিষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৩.৪ এ স্তরের শিক্ষার্থীগণকে কম্পিউটার ব্যবহারের বিভিন্ন দিক এবং হাতে–কলমে কারবার বিষয়ক বিচিত্রমুখী শাখায় প্রযোজ্য কতিপয় প্যাকেজ ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৩.৫ এ স্তরে কম্পিউটার শিক্ষার ফলপ্রসূতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি কম্পিউটার ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন এবং শিক্ষাদান কার্য সম্পাদনের জন্য কম্পিউটারের জ্ঞানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত শিক্ষক বাঞ্ছনীয়।

৪.৩.৬ এ স্তরে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য ছুটিসহ ফেলোশিপের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৩.৭ শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে ধরে রাখার জন্য গ্রন্থাগারগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে হবে।

৪.৪ উচ্চতর শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশমালা

৪.৪.১ বর্তমান কারবার বিষয়ক শিক্ষায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নামকরণের মধ্যে ভিন্নতার পরিবর্তে সমস্তরে সমরূপ শিক্ষা এক নামে অভিহিত করতে হবে।

৪.৪.২ স্নাতক স্তরে ডিগ্রির নাম বিবিএ রাখা এবং স্নাতকোত্তর স্তরে ডিগ্রির নাম যথাক্রমে এমবিএ এবং পিএইচডি রাখতে হবে।

৪.৪.৩ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কারবার বিষয়ে ডিগ্রি অনুক্রমসমূহের মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার কাল, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম পদ্ধতির তারতম্য দূর করা বিধেয়। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৪.৩.১ বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক (B B A) এবং এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর (M BA) অনুক্রম রাখতে হবে।

৪.৪.৩.২ কলেজসমূহের শিক্ষকের অপর্যাপ্ততা ও আর্থসামাজিক অবস্থার আলোকে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পরিবর্তন সাপেক্ষে তিন বছর মেয়াদি বিবিএ অনুক্রম এবং দুই বছর মেয়াদি এমবিএ অনুক্রম প্রচলন করা বিধেয়। পাঁচ বছরের মধ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়াদের শিক্ষা বৈষম্য দূরীকরণার্থে কলেজসমূহে চার বছর মেয়াদি বিবিএ অনুক্রম এবং এক বছর মেয়াদি এমবিএ অনুক্রম চালু করতে হবে।

৪.৪.৩.৩ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ এবং এমবিএ কোর্স সংখ্যা অভিন্ন হওয়া বিধেয় এবং বিজ্ঞান, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান শাখার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ডিগ্রি কোর্স সংখ্যার মধ্যে সমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কোর্স সংখ্যা অভিন্ন করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৪.৪.৩.৪ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বিবিএ এবং এমবিএ অনুক্রম সেমিস্টার ছয় মাস মেয়াদি পদ্ধতি প্রচলন করতে হবে। প্রতি সেমিস্টার অন্তে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে হবে।

৪.৪.৩.৫ বিবিএ কোর্সের মধ্যে ৪০% সাধারণ কোর্স (যথা গণিত, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ভাষা ও প্রচলিত প্যাকেজেস, বাংলাদেশের কারবার পরিচিতি, অর্থনীতি, যোগাযোগ, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, বাজারজাতকরণ ও ফিন্যান্স) এবং ৬০% বিশেষ কোর্স (যথা বাজারজাতকরণ, ব্যাংকিং, ফিন্যান্স, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, শিল্প সম্পর্ক, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক কারবার, ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান ও অপারেশন রিসার্চ ইত্যাদি) থাকতে হবে।

৪.৪.৩.৬ এমবিএ কোর্সেও ২০% মৌলিক বিষয় (যথা: ব্যবস্থাপনীয় নীতি ও পদ্ধতি, কারবার গবেষণা) এবং ৮০% বিশেষ কোর্স (যথা ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং, বীমা, শিল্প সম্পর্ক, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি) থাকা বিধেয়। যারা বিবিএ ব্যতীত অন্য ধারা থেকে এমবিএ পড়বে, তাদের জন্য বিবিএ–এর মূল পত্রসমূহ আবশ্যিক বিষয় হিসেবে প্রথম বর্ষে অধ্যয়ন করতে হবে।

৪.৪.৩.৭ বিবিএ এবং এমবিএ পরীক্ষা ব্যবস্থায় প্রতি পত্রের ফলোন্নয়ন পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। তবে, ফলোন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে পরীক্ষা দেওয়ার বিধান রাখতে হবে।

৪.৪.৩.৮ বিবিএ ও এমবিএ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪.৪.৩.৯ উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পাঠ–বিরতি বাধা হিসেবে রাখা যাবে না।

৪.৪.৩.১০ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন ছাত্র যাতে দীর্ঘদিন ছাত্রত্ব বজায় রাখতে না পারে এবং পাঠ বিরতি বা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া বা যে কোন কারণে পরীক্ষা দিতে সমর্থ না হওয়া বা ফলোন্নয়ন পরীক্ষা দেওয়া যাতে প্রার্থীর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ রুদ্ধ করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে বিবিএ অনুক্রমে মোট এক বছর অতিরিক্ত পড়ার সুযোগ দেওয়া এবং এমবিএ প্রোগ্রামে অতিরিক্ত মোট এক বছর সময় দেওয়া যেতে পারে। এ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী কোর্স সমাপন করতে না পারলে তাকে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার বা অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া যায়।

৪.৪.৩.১১ বিবিএ বা এমবিএ অনুক্রমের সফলভাবে অন্তত ২৫% কোর্স সমাপ্তকারী শিক্ষার্থী পাঠ–বিরতি বা অন্য কোন কারণে প্রদত্ত প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ কোর্স সমাপ্ত করতে সমর্থ না হলে বরং অন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে ঐ প্রতিষ্ঠানে তাদের অর্জিত ক্রেডিট ঘণ্টা এবং প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট স্থানান্তরযোগ্য হতে হবে।

৪.৪.৪ যে সমস্ত শিক্ষার্থী বিবিএ ডিগ্রি লাভ করে নি অর্থাৎ বিজ্ঞান, কলা, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেছে, কিন্তু এমবিএ ডিগ্রি অনুক্রমে ভর্তি ইচ্ছুক তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.৪.৫ চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থী বা সনাতন পদ্ধতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীর জন্য দুই বছর মেয়াদি এমবিএ অনুক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। এ সমস্ত শিক্ষার্থী এক বছর কারবার বিষয়ক মৌলিক বিষয়ে অধ্যয়ন করবে এবং বিবিএ ধারা থেকে আগত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশেষ এমবিএ প্রোগ্রাম অধ্যয়ন করবে।

৪.৪.৬ বিবিএতে মোট আটটি সেমিস্টার কোর্সের সংখ্যা ৩৮ থেকে ৪০ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রতি সেমিস্টার ১৬ সপ্তাহব্যাপী করা বিধেয় এবং প্রতি সপ্তাহে প্রতি কোর্সে এক ঘণ্টা মেয়াদি তিনটি বক্তৃতা/আলোচনা থাকা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থায় ক্রেডিট সংখ্যা ১১৪ থেকে ১২০ হতে হবে।

৫.০ শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার উপকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ

৫.১ এমবিএ প্রোগ্রামে লেকচার পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে কেস–স্টাডি ও আলোচনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা উচিত। সপ্তাহে এ উদ্দেশ্যে একটি ক্লাস আলোচনার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। প্রকল্প পরিদর্শনের ব্যবস্থার সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষা সহায়ক ব্যবহার করতে হবে।

৫.২ বিবিএ ও এমবিএ কোর্সে ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের জন্য অডিওভিজুয়াল সহায়কসমূহ ব্যবহার করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে উপরিউক্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তৈরি করতে হবে।

৫.৩ শিক্ষা পরিকল্পনা ও পরীক্ষা গ্রহণের সময়সূচি কোর্স শুরু করার পূর্বে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

৫.৪ ইন–কোর্স, টিউটোরিয়াল, শ্রেণীকক্ষ পরীক্ষা নেওয়ার ১০ দিনের মধ্যে ছাত্রদের নম্বর জানাতে হবে।

৫.৫ ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের লক্ষ্যে শিক্ষক ছাত্র বর্তমান অনুপাত কমিয়ে ১ : ১৫ তে আনতে হবে।

৫.৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক বিভাগে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন করা প্রয়োজন।

৫.৭ গ্র্যাজুয়েটদের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক–প্রশিক্ষণের বর্তমান সুযোগ–সুবিধা নিতান্তই অপ্রতুল। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হল :

৫.৭.১ বিজনেস এডুকেশন ইনস্টিটিউট

কারবার শিক্ষা ফলপ্রসূ করার জন্য এ শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে শিক্ষকদের আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণদান করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে কারবার শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এ ব্যাপারে কারবার শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একাধিক বিজনেস শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।

৫.৭.২ তরুণ শিক্ষকদের উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য প্রচলিত সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

৫.৭.৩ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৫.৭.৪ অপেক্ষাকৃত প্রবীণ শিক্ষক বিশেষ করে যে সব শিক্ষক পাঁচ থেকে সাত বছর পূর্বে বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করার লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৫.৭.৫ বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষকদের শিল্প, ব্যাংক, বীমা, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সমস্যা নিয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.৭.৬ প্রত্যেক বিভাগে নিজস্ব উদ্যোগে শিক্ষকদের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের ওপর মতবিনিময় ও চর্চার জন্য মাসিক সেমিনারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৭.৭ দেশের কারবার বিষয়ে পিএইচডি কর্মসূচি আরও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। দেশে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ছাত্রদের উৎসাহ প্রদানের জন্য মাসিক বৃত্তির পরিমাণ ও আনুষঙ্গিক সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শিক্ষকদের পিএইচডি সংক্রান্ত গবেষণার কাজ পরিচালনার উৎসাহ প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রেষণামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.৭.৮ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসম্পন্ন অতিথি বক্তাদের মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির তারতম্য

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিশেষ কোর্সের বেলায় ভিন্ন ভিন্নকোর্স প্রদান কাঙ্ক্ষিত। তবে একটি ডিগ্রির জন্য কোর্সের সংখ্যা ও মেয়াদ অভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। মূল কোর্স ঠিক রেখে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ কোর্স প্রদান করতে পারে। কোর্স প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিষয়ে সুযোগ্য শিক্ষক ও আঞ্চলিক সুযোগ–সুবিধা থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোর্স প্রদান নীতিগতভাবে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এতে একদিকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজস্ব স্বকীয়তা অর্জন করতে পারে, অন্যদিকে ছাত্ররাও নিজেদের পছন্দমাফিক বিশেষ কোর্সে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পাবে।

৭. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কারিকুলাম কমিটিগুলো শুধু নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ নিয়ে গঠিত। এই কমিটিতে শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্বাহীদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ নেই। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপক এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হতে হবে।

৮. কারবার বিষয়ক শিক্ষাখাতে জাতীয় সম্পদ বণ্টন

দেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে শিল্প ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ ব্যবস্থাপক। শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কারবার বিষয়ক শিক্ষায় সাধারণ বিষয়সমূহ প্রধানত চারটি বিষয়ে (যথা ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স) নৈপুণ্য সৃষ্টির প্রয়াস নিতে পারে। স্বাধীনতা উত্তরকালে কারবার বিষয়ক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হলেও এখনও এ বিষয়ে সুযোগ্য গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। শিক্ষাদানের জন্য আনুষঙ্গিক সুযোগ–সুবিধাও সম্পদের অভাবে সেই অনুপাতে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। জাতীয় পর্যায়ে সম্পদ বণ্টনে কারবার বিষয়ক শিক্ষাখাত এখনও অগ্রগণ্যতা পায় নি। এতে বিষয়ের সুষ্ঠু শিক্ষাদান বিঘ্নিত হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে কারবার বিষয়ক শিক্ষার গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পরিকল্পনায় ও সম্পদ বণ্টনে এ খাতকে অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য করা আবশ্যক।

অধ্যায়—১৪

কৃষি শিক্ষা

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। তাই, আর্থসামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কৃষির উন্নয়ন ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কৃষি একটি ফলিত বিজ্ঞান। কৃষি বলতে বোঝায় দেশের শস্য, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও বনসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা। উচ্চতর কৃষি শিক্ষা বলতে কৃষি, ভেটেরিনারি, পশুপালন, কৃষি প্রকৌশল, কৃষি অর্থনীতি, মাৎস্যবিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টরাল পর্যায়ে অধ্যয়ন ও উচ্চতর গবেষণা বোঝায়।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১. দেশের পরিবেশগত শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ সাধন।

২.২ জাতীয় উন্নয়নে কৃষিনির্ভর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

২.৩ বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা কৃষি সম্পদের যথাযথ বিকাশ।

২.৪ পেশা ও বিজ্ঞান হিসেবে জাতীয় জীবনে কৃষির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রসার।

২.৫ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে দেশের স্থলজ ও জলজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

২.৬ কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ।

২.৭ দেশের মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।

২.৮ কৃষিকে আর্থসামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে উপলব্ধি করার জন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও সচেতনতা সৃষ্টি।

২.৯ কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি।

২.১০ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, অপুষ্টি দূরীকরণ ও দারিদ্র্যবিমোচন।

২.১১ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ।

৩. বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে কৃষি শিক্ষা একটি নৈর্বাচনিক বিষয় এবং এগারটি কৃষি ইনস্টিটিউটে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ছয়টি অনুষদের অধীনে (কৃষি, ভেটেরিনারি, পশুপালন, কৃষি প্রকৌশল, কৃষি অর্থনীতি ও মাৎস্যবিজ্ঞান) স্নাতক পর্যায়ে চার বছর মেয়াদি কোর্স, তিন সেমিস্টার মেয়াদি এম এস কোর্স এবং পিএইচডি পর্যায়ে তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত চারটি কৃষি কলেজে (১. বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২, পটুয়াখালি কৃষি কলেজ, পটুয়াখালি, ৩. হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজ,

দিনাজপুর ও ৪. রাজশাহী কৃষি কলেজ, রাজশাহী) কৃষিতে স্নাতক পর্যায়ের কোর্স প্রদান করা হয়। প্রকল্প গবেষণা পরিচালনার জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সিস্টেম, সম্প্রসারণ ও কৃষক প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং কর্মকর্তা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে। ১৯৬১–৬২ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষাদান চালু হওয়ার পর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১২১৬৩ জনকে স্নাতক ডিগ্রি এবং ৩৫৫৪ জনকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং ৫৪ জনকে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়া গাজীপুরের সালনায় অবস্থিত Institute of Postgraduate Studies in Agriculture [IPSA] ডক্টরাল পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা প্রদান করে আসছে। এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি এ প্রতিষ্ঠানকে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত করার কথা ঘোষণা করেছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন বিভাগ ও কাষ্ঠ প্রযুক্তি (Forestry & Wood Technology)বিভাগ, মৎস্য ও সামুদ্রিক সম্পদ প্রযুক্তি (Fisheries and Marine Technology) বিভাগ, কৃষি প্রযুক্তি (Agro technology)বিভাগ, জৈব প্রযুক্তি (Bio Technology) বিভাগ থেকে স্নাতক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এখানে ডিগ্রি কার্যক্রমগুলো কোর্স পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ চালু রয়েছে। এতে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে শিক্ষাদান করা হয়। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বনবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া সিলেট ও চট্টগ্রামের দুটি ভেটেরিনারি কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমে পশুসম্পদ উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

৪. জাতীয় শিক্ষায় কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব

জাতীয় শিক্ষায় কৃষি শিক্ষার গুরুত্বের কথা সব সময় অনুধাবন করা হয়েছে। এস এম শরীফের নেতৃত্বে শরীফ কমিশনে পাঁচ বছর মেয়াদি ম্যাট্রিক–উত্তর স্নাতক কোর্স, তিন বছর মেয়াদি এল ভি এস কোর্স চালু রাখা, দুই বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ও দুই বছর মেয়াদি ডক্টরাল কোর্স ছাড়াও প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিচালনার সুপারিশ করা হয়। তাছাড়া এ কমিশনের রিপোর্টে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাসহ সেখানে কৃষি, পশুপালন, কৃষি অর্থনীতি, কৃষি প্রকৌশল ও মৌল বিজ্ঞান অনুষদ খোলার সুপারিশ করা হয়।

১৯৫৯ সালের 'খাদ্য ও কৃষি কমিশন রিপোর্টে' কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় নতুন বিষয় খোলা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ কর্মসংযোগ গড়ে তোলার জন্য সুপারিশ করা হয়। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৯ সালের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি, ১৯৮৮ সালের মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও ১৯৯০ সালের কৃষি শিক্ষা বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট ইত্যাদিতে কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নের জন্য নানাবিধ প্রস্তাব ও সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। এসব সুপারিশের কিছু কিছু খণ্ডিত অংশ বাস্তবায়ন করা হলেও সার্বিকভাবে কৃষি শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন ঘটে নি। অথচ কৃষি শিক্ষার উন্নয়নের সঙ্গে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন যেমন জড়িত তেমনি দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, দারিদ্র্যবিমোচন ইত্যাদিও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। তাই একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কৃষি বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন, গবেষণা ও উন্নয়ন কত জরুরি।

৫ উচ্চতর কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমান্তরালে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ সার্বিক কৃষি পরিবেশের ব্যাপক অবক্ষয় ও নিয়মিত বন নিধনের ফলে কোন কোন অঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত, রাসায়নিক সার–কীটনাশকাদির যদৃচ্ছ প্রয়োগহেতু প্রাকৃতিক ও জৈব উৎপাদনের আশঙ্কাজনক ঘাটতি জাতীয় উন্নয়নের পথে আজ যে মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, তাকে পরিকল্পিতভাবে মোকাবেলা করার জন্য সবার আগে যা সবচেয়ে জরুরি তা হল : উচ্চতর কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মধ্যে কার্যকর সংযোগ প্রতিষ্ঠা এবং সমস্যাকেন্দ্রিক ও অঞ্চলভিত্তিক উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থবহ উপায়ে এই বিপুল সমস্যার মোকাবেলা করা।

৬. **উচ্চতর কৃষি শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ**

৬.১ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজগুলোতে চার বছর মেয়াদি স্নাতক পর্যায়ে কোর্স পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।

৬.২ স্নাতক পর্যায়ের সকল শিক্ষাক্রমে যুক্তিযুক্ত উপায়ে সংশ্লিষ্ট বাধ্যতামূলক বিষয়, ঐচ্ছিক বিষয়, মাঠ ও গ্রামীণ কর্ম-অভিজ্ঞতা, সমাজবিজ্ঞান, ভাষা ও মৌল বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখা হবে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার অনুপাত হবে ৫০ : ৫০।

৬.৩ কোর্স পদ্ধতি নির্দিষ্ট সময়সীমায় আবদ্ধ বলে এর সার্বিক সাফল্য শিক্ষক বিশেষের জ্ঞান, দক্ষতা, আন্তরিকতা ও নিবেদিতপ্রাণতার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এ কারণে দক্ষ ও মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিসহ তাঁদের উৎসাহ বিধানের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং তাঁদের জন্য উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ জ্ঞানের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে।

৬.৪ কোর্স পদ্ধতিতে উচ্চতর কৃষি শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত হবে ১ : ১৫।

৬.৫ শিক্ষকদের কর্ম-পরিকৃতির মূল্যায়ন প্রথা চালু করতে হবে।

৬.৬ উচ্চতর কৃষি শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় প্রথম ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হবে বিজ্ঞান বিভাগে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীববিদ্যাসহ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, তবে কৃষিবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিদ্যা ও গণিতসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা শুধু কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদে ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

৬.৭ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বর্তমানে কৃষি বিজ্ঞানে যে পাঠ দেওয়া হয় তা একজন শিক্ষার্থীর স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য পর্যাপ্ত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ভেটেরিনারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, পশুসম্পদ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের স্নাতক পর্যায়ের কোর্সে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে।

৬.৮ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগ, সম্প্রসারণ কেন্দ্র ও স্নাতক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের জ্ঞান ও কর্মনৈপুণ্য আধুনিকায়ন তথা পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে অব্যাহত শিক্ষা ও পুনঃ শিক্ষা কোর্স সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬.৯ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ডিভি এম এর ক্ষেত্রে দুই সেমিস্টারের জন্য এবং অন্যান্য ডিগ্রির ক্ষেত্রে এক সেমিস্টারের জন্য ইন্টার্নশিপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.১০ কোর্স চলাকালীন সময়ে কোর্স চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে এবং কোন বিশেষ ডিগ্রি কোর্স সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরে দুই থেকে চার সপ্তাহব্যাপী সমন্বিত পেশাভিত্তিক শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.১১ স্নাতক পর্যায়ে যথাসম্ভব মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করা হবে এবং এই লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক গ্রন্থাদি রচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে বাংলা একাডেমী ভূমিকা রাখতে পারে।

৬.১২ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সকল ছাত্রছাত্রীকে অন্তত দুই ক্রেডিট আওয়ার-এর জন্য ইংরেজি ভাষা শিখতে হবে।

৬.১৩ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন সেমিস্টার ব্যাপী কোর্স পদ্ধতিতে এম এস কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং অন্যূন তিন বছর মেয়াদি ডক্টরাল কার্যক্রমে গবেষণা ছাড়াও কোর্স-প্রথা প্রবর্তন করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের ডক্টরাল গবেষণা সমস্যা-সমাধানমূলক বিষয়ে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এ ব্যাপারে দেশের সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্য ও ভৌত সুবিধাবলি ব্যবহার করতে হবে।

৬.১৪ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজসমূহের ভৌত ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি সম্প্রসারণ করতে হবে।

৬.১৫ কৃষি কলেজগুলোকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের Constituent College এ উন্নীত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের উদ্যোগ নিতে হবে।

৬.১৬ দেশের কৃষিপরিবেশগত বৈশিষ্ট্যাবলি বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চতর কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬.১৭ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বনবিজ্ঞান অনুষদ খুলে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স এবং গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.১৮ কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষা স্নাতক পর্যায়ে সবার জন্য বাধ্যতামূলক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ঐচ্ছিক করতে হবে।

৬.১৯ দেশের আর্থসামাজিক ও মাঠচাহিদার নিরিখে উচ্চতর কৃষিশিক্ষা কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল ও যুগোপযোগী করতে হবে।

৬.২০ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও জাতীয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাসহ উন্নয়ন চাহিদার সঙ্গে উচ্চতর কৃষি শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার জন্য প্রচলিত সংশ্লিষ্ট কোর্সসমূহের পাশাপাশি নতুন নতুন কোর্স সংযোজনের ব্যবস্থা করতে হবে। (যেমন– পরিবেশ বিজ্ঞান, জৈবপ্রযুক্তি, জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং, সম্পদ অর্থনীতি, জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা, ভূমিস্বত্ব ও ব্যবস্থাপনা, পুষ্টিবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতি)।

৬.২১ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর গবেষণাসমূহে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সুবিধাবলি নিশ্চিত করা হবে এবং কম্পিউটার শিক্ষা সুবিধা প্রসারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬.২২ পাঠ্যসূচি প্রণয়নে সমস্যা–সমাধানমূলক বিষয়াদি যাতে সহজেই প্রাধান্য পেতে পারে, এ কারণে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সংস্কারের ব্যবস্থাকে নমনীয় করতে হবে।

৬.২৩ উচ্চতর কৃষিশিক্ষার মান ও সমরূপতা বজার রাখার জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি সমন্বয়, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে।

৬.২৪ উচ্চতর কৃষি শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধিসহ স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা সহকারী ও শিক্ষণ সহকারী পদে নিয়োগের প্রথা চালু করতে হবে।

৬.২৫ উচ্চতর কৃষি শিক্ষা ও গবেষণায় সরকারি অনুদান বাড়াতে হবে।

৭. কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত সুপারিশ

উচ্চতর কৃষি শিক্ষা যেহেতু গবেষণা ও সম্প্রসারণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত তাই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ব্যবস্থাকে বেগবান করার জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭.১ প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা পদ্ধতিকে জাতীয় কৃষি গবেষণা পদ্ধতির অংশরূপে গণ্য করতে হবে।

৭.২ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের গবেষণায় মৌলিক, কর্ম–কৌশলগত, ফলিত ও অভিযোজনমূলক বিষয়াদি সমভাবে প্রাধান্য দিতে হবে।

৭.৩ এই লক্ষ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অপরাপর কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নিবিড় কর্মসংযোগ গড়ে তুলতে হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একটি করে উপকেন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থাপন করতে হবে।

৭.৪ কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠাকল্পে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষজ্ঞ বিনিময় প্রথা চালু করতে হবে।

৭.৫ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার সরকারি কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য কৃষি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত

করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এর ফলে তথ্য প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া বেগবান হবে যা কৃষি শিক্ষা ও গবেষণাকে সমস্যা সমাধানমূলক ও অঞ্চলভিত্তিকরূপে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

৭.৬ প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য ইন্টারনেটসহ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অত্যাধুনিক তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৭. গবেষণা কার্যক্রমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কৃষি, বনায়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জনস্বাস্থ্য, জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার, জৈব জ্বালানি, জৈব বর্জ্যের চক্রায়ন ও নন–কনভেনশনাল দ্রব্যাদির পরিকল্পিত ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রাধিকার দানসহ বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধানের পরিবর্তে আন্তঃবিষয়ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭.৮ সমন্বিত খামার ব্যবস্থা ও পরিবেশ উন্নয়ন, শস্য বহুমুখীকরণ, গবাদি পশু ও হাঁসমুরগির উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নত ব্যবস্থাপনা, মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের কলাকৌশল, দেশীয় কৃষি প্রযুক্তির উন্নতি সাধন, পশুখাদ্য ও মৎস্যখাদ্যের উৎপাদন প্রযুক্তি, শস্যের রোগদমনে জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার, ভূমিস্বত্ব ও ভূমি ব্যবহার, পোস্ট হার্ভেস্ট টেকনোলজি, গ্রামীণ পুষ্টি উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এগিয়ে আসা দরকার।

৭.৯ গবেষণায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকসমূহের ওপর যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

৭.১০ কৃষি বিষয়ক গবেষণায় জৈবপ্রযুক্তি, টিস্যু কালচার, জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং, ভ্রূণ হস্তান্তর প্রযুক্তি ট্রেসার টেকনিক ইত্যাকার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সংবলিত গবেষণাগার সুবিধা গড়ে তুলতে হবে।

৭.১১ মাটি, পানি ও নবায়নযোগ্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিশ্চিত করে কৃষির বর্ধিত উৎপাদন ধারা বজায় রাখতে হবে এবং কৃষি পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার দ্বারা একে লাভজনক করে তোলার অনুকূলে গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।

৭.১২ গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উৎপাদন ও আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং এর অনুকূলে প্রয়োজনীয় পুঁজি, উপকরণ, সম্প্রসারণ ও বিপণন–সংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৭.১৩ আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও আন্তঃদেশী উদ্যোগে পরিচালিত প্রজনন ও উৎপাদনমূলক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

৭.১৪ বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষি রফতানি নীতি বিশ্লেষণ ও রফতানি–উপযোগী প্রযুক্তি উন্নয়ন, কৃষিপণ্য আমদানি–রফতানির যৌক্তিকীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আর্থসামাজিক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৭.১৫ কৃষি তথ্যের অপর্যাপ্ততা নিরসনকল্পে পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত কৃষি শুমারি, পারিবারিক আয়ব্যয় জরিপ, পুষ্টি সংক্রান্ত জরিপ ইত্যাদি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানীদের সম্পৃক্ত রাখতে হবে।

অধ্যায়—১৫

ললিতকলা শিক্ষা

১. **ভূমিকা**

১.১ ললিতকলা শিক্ষা সৌন্দর্যবোধ ও সৃষ্টিশীলতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে আপন ঐতিহ্য বিষয়ে সচেতন করে। আপন সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আয়ত্ত করার ব্যবস্থা নিশ্চিত হলে বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালি সংস্কৃতির স্থান সম্পর্কে শিক্ষার্থী সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারবে। তাই যথাযথ শিক্ষার ভেতর দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি গৌরববোধ জাগিয়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

১.২ ললিতকলার শিক্ষা চিত্তকে সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করে। সংগীত, চিত্রকলা, কারুশিল্প ও নানাবিধ হাতের কাজ, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি বিষয়ে সুষ্ঠু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের সৌন্দর্যবোধকে উদ্দীপ্ত এবং বিকশিত করবে। সৌন্দর্যবোধ দিয়ে চালিত হলে ছাত্রছাত্রীরা পোশাক-পরিচ্ছদে, আচরণে, ব্যবহারে সুরুচিসম্পন্ন এবং শুদ্ধ উচ্চারণে, বাচনভঙ্গিতে, উপস্থাপনায় পরিশীলিত সৌন্দর্যবোধে নিজেদের উন্নীত করে সুশৃঙ্খল ও পরিমিতিবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এমনি সব সুকুমার কলাচর্চা শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীকে সুনীতির প্রতি, আদর্শ মূল্যবোধের প্রতি আগ্রহী করে সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টির প্রেরণা দেবে। ললিতকলার শিক্ষা তাই জাতীয় শিক্ষাক্রমের একটি আবশ্যিক তথা অপরিহার্য অঙ্গ। প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত এর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি যথাযথভাবে বিন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন।

১.৩ ললিতকলা শিক্ষার সাহায্যে মানসিক বিকাশের এই ধারাটিকে শিক্ষাক্রমে শুধু অপ্রধান বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন নয়। ললিতকলা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়। তবে স্মরণ রাখতে হবে, কোন শিক্ষার্থী সব শাখার শিল্পকলায় আগ্রহী হতে বা একই রকম মানের দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।

১.৪ শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই অনেকগুলো বিষয়ে সংস্কৃতিচর্চার ব্যবস্থা থাকলে ছাত্রছাত্রীরা ক্রমে আপন মানস-প্রবণতা অনুযায়ী স্বকীয় পথটির সন্ধান পাবে। তখন তারা বিকল্প বিষয় নির্বাচনের সুযোগ অনায়াসে গ্রহণ করতে পারবে, ললিতকলার যে কোন একটি বিষয়কে সম্মানজনক পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে।

২. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

২.১ ললিতকলা শিক্ষা শিশু বয়স থেকেই শিক্ষার্থীকে ধীরে ধীরে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। তাই ললিতকলা শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

২.২ দেশের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নাটক, নৃত্য, যাত্রা, স্থাপত্যকলা, লোকশিল্প, লোকসংস্কৃতি ও দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে জাতীয় সংস্কৃতির ধারাটি বুঝতে এবং সে ধারায় নিজকে বিকশিত করতে সহায়তা করা।

২.৩ নিজের দেশ, মানুষ, প্রকৃতি, আবহাওয়া পরিবেশ যথা গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি, নদী-নালা, পশু-পাখি, পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও সচেতনতা অর্জন।

২.৪. বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং নিজের দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনা করে নিজের অবস্থানকে নির্ণয় করতে পারা।

২.৫. শিক্ষার্থী যেসব বিষয়ে নিজের উপলব্ধিকে শাণিত করে উন্নত ও পরিশীলিত জীবন যাপনে সক্ষম হবে তা হল :

ক. সুন্দর ও অসুন্দরের তুলনা করে সৌন্দর্যবোধের ধারণা প্রদান ;

খ. প্রতিদিনের আবশ্যিক কাজকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে তা সমাধা করার অভ্যাস ও মানসিকতা গঠন ;

গ. ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাপনকে সুন্দর, সাবলীল ও নান্দনিকভাবে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলায় অভ্যস্ত করা ;

ঘ. শুদ্ধ উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি ও উপস্থাপনায় পরিশীলিত রূপ অর্জন করা ;

ঙ. সুন্দর ও সুরুচিসম্পন্ন পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহারে সচেতনতা ও পরিমিতিবোধ অর্জন ;

চ. আচরণে, ব্যবহারে শান্তি–সম্প্রীতি ও মমত্ববোধ অর্জন।

২.৬. ললিতকলার বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা ও চর্চার প্রাথমিক নিয়মকানুন, কলাকৌশল এবং তা প্রয়োগ করার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন।

২.৭. যেসব শিক্ষার্থী ললিতকলার কোন একটি বিষয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করবে অর্থাৎ এক জন ভবিষ্যৎ সংগীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি, নাট্যশিল্পী, নৃত্যশিল্পী ও কারুশিল্পী হিসেবে নিজকে তৈরি করার জন্য যথাযথ শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা পাবে।

৩. ললিতকলা শিক্ষার বিষয়-বিভাজন, স্তরবিন্যাস ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

৩.১ বিষয়–বিভাজন

ক. নৃত্যকলা

খ. সংগীত (গীত ও বাদ্য)

গ. নাট্যকলা (অভিনয়, আবৃত্তি ও নাটক মঞ্চায়ন)

ঘ. কারুশিল্প ও হাতের কাজ (বিভিন্ন মাধ্যমের কারুশিল্প, সূচীশিল্প ও পোশাক নকশা)

ঙ. চারুকলা (চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য)

৩.২ স্তরবিন্যাস

পাঠদানের সুবিধার্থে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে।

ক. প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী	প্রথম স্তর
খ. চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী	দ্বিতীয় স্তর
গ. ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী	তৃতীয় স্তর

শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা বিবেচনা করে উপরিউক্ত তিনটি স্তরে ললিতকলার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরি করে শিক্ষাদান করতে হবে।

ললিতকলার উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন তিনটি বিষয় প্রথম স্তরের জন্য অবশ্য শিক্ষণীয় এবং যে কোন দুটি বিষয় দ্বিতীয় স্তরের জন্য এবং যে কোন একটি তৃতীয় স্তরের জন্য অবশ্য শিক্ষণীয়।

৩.৩ মূল্যায়ন–পদ্ধতি

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ললিতকলা বিষয়ে পাঠ–উন্নয়নে ও বাৎসরিক মূল্যায়নে সনাতন পরীক্ষা পদ্ধতি থাকবে না, তবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে। এই গ্রেড বা মূল্যায়ন নিম্নবর্ণিত দুটি পর্যায়ে সমাধা হবে।

৩.৪ সারা বছরের পাঠ্যসূচি নিয়মিতভাবে সমাধা করার জন্য এবং বছরশেষে পাঠ্যসূচি শেষ করার পর পরীক্ষার জন্য পৃথক গ্রেড দেওয়া হবে।

৪. মাধ্যমিক স্তরে ললিতকলা

৪.১ নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের এই চার বছরকে ললিতকলার শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে দুভাগে ভাগ করা যায়।

ক. নবম ও দশম শ্রেণী — মাধ্যমিক প্রথম ভাগ।

খ. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী — মাধ্যমিক দ্বিতীয় ভাগ।

৪.২ এই স্তরেও শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা বিবেচনা করে উপরিউক্ত দুটি ভাগে যথাযথ পাঠ্যসূচি তৈরি করে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

৪.৩ মাধ্যমিক স্তরে ললিতকলা : ঐচ্ছিক বিষয়

শিক্ষার্থীরা ললিতকলার উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি বিষয় ঐচ্ছিক হিসেবে বেছে নিতে পারবে। তবে শিক্ষার্থীর এমন একটি বিষয় নেওয়া বাঞ্ছনীয়, যে বিষয়ে সে উচ্চতর শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে। কর্মক্ষেত্রে এ বিদ্যাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার পরিকল্পনাও বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাবে।

৫. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য অবশ্যকরণীয় বিষয়

৫.১ স্কুল পর্যায়ে প্রতি বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে একাডেমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্তরভিত্তিক সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও উৎসবের ব্যবস্থা করতে হবে। ললিতকলার বিষয়গুলোর ভিত্তিতেই প্রতিযোগিতা হবে। প্রতি বছর প্রদর্শনী ও মেলার ব্যবস্থা করতে হবে। সেখানে থাকবে শিক্ষার্থীদের আঁকা চিত্র, হাতের কাজ, সূচীশিল্প, তৈরি পোশাক ইত্যাদি। সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও অভিনয় প্রতিযোগিতা হবে, নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থা থাকবে। উৎসবশেষে পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।

৬. ললিতকলা শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে :

৬.১ শিক্ষার উপযোগী উপকরণাদির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

৬.২ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ।

উপযুক্ত শিক্ষকের জন্য প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ললিতকলার উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরি করে এক বছরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। ললিতকলার বিষয়গুলো শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। ললিতকলার উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ললিতকলা শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগদান করে ললিতকলা শিক্ষাকে সহজতর ও গ্রহণীয় করে তুলতে হবে।

৬.৩ ললিতকলায় পাঠদানের উপযুক্ত কক্ষ ও পরিবেশ সংস্থান

সুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনী, সুসমঞ্জস গৃহপরিকল্পনা, পরিকল্পিত পুষ্পোদ্যান, সুরুচিপূর্ণ সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্র ইত্যাদি বিদ্যালয়ের সঙ্গে জাদুঘর, চিত্রশালা, সংগীতপাঠাগার বা সংগ্রহশালা এবং পরিকল্পিত 'সৌন্দর্য কোণ'–এর ব্যবস্থা ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য প্রয়োজন। উপরিউক্ত বিষয়ে যথাযথভাবে ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ঘর বা স্থান, অর্থের সংস্থান ও উপযুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি বিবেচ্য। যেখানে যেভাবে সম্ভব সে ভাবেই ললিতকলা চর্চার জন্য পরিকল্পিত 'সৌন্দর্য কোণ' –এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬.৪ ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সময়ে জাতীয় জাদুঘর, চারু ও কারুকলা প্রদর্শনী, আর্টগ্যালারি, সংগীতানুষ্ঠান, নাট্যশালা ও নানারকম মেলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা থাকবে। একইভাবে অন্তত একবার পুরাকীর্তি নিদর্শনখ্যাত অঞ্চল, ঐতিহাসিক এলাকা ও দর্শনীয় স্থানসমূহ ভ্রমণের ব্যবস্থা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের থাকবে।

৬.৫ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সংস্কৃতির মূলধারার সঙ্গে লোকসংস্কৃতি ও বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

৭. ক্লাস বরাদ্দ ও সময় বণ্টন

ক. ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তৃতীয় স্তরের জন্য সপ্তাহে একটি ক্লাস। ক্লাসের সময় — কমপক্ষে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

খ. চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী দ্বিতীয় স্তরের জন্য সপ্তাহে দুটি ক্লাস। ক্লাসের সময় — কমপক্ষে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

গ. প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী প্রথম স্তরের জন্য সপ্তাহে তিনটি ক্লাস। ক্লাসের সময় — কমপক্ষে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। প্রথম স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা, গণিত, ইংরেজি ইত্যাদি সাধারণ বিষয় পড়াবার সময় একই সঙ্গে ছবি আঁকার ক্লাস নেওয়া যায়। ছবি আঁকার মাধ্যমে অন্যান্য বিষয় পাঠদানের ব্যবস্থা করলে একই সঙ্গে দুটি বিষয় শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে। একইভাবে গান, আবৃত্তি ও অভিনয়ের মাধ্যমেও সাধারণ বিষয়ের পাঠদান সম্ভব।

৮. অন্যান্য সুপারিশ

ললিতকলাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলোর সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকেও গুরুত্ব দিতে হবে :

৮.১ ললিতকলার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে কোন শিক্ষার্থী অষ্টম, নবম বা দশম শ্রেণী থেকে লেখাপড়া বন্ধ করে দিলেও প্রয়োজনে সেই শিক্ষার্থী চারুকলা, কারুশিল্প ও হাতের কাজ, সংগীত, নাটক, নৃত্যকলা ইত্যাদির যে কোনটিকে তার পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে।

৮.২ সরকারি উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে জাতীয় চিত্রশালা, জাদুঘর, সংগীত ও নৃত্য একাডেমী, পাঠাগার ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা এবং পর্যায়ক্রমে উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠান জেলা ও গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে।

৮.৩ সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি শহরে ও গ্রাম পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ চিত্রকলা ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী, সংগীত,নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৮.৪ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ললিতকলার বিভিন্ন শাখায় গবেষণামূলক ও সাধারণ পরিচিতিমূলক নানা ধরনের বইপুস্তক প্রকাশ, পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীর প্রকাশ করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিদেশ থেকে অনুরূপ বইপুস্তকের আমদানি ও সহজলভ্যতার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৫ প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যসূচি প্রণয়নে যেমন — বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, সমাজপাঠ ইত্যাদি বইয়ের পাঠে ললিতকলা সম্পর্কিত রচনা, পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পকর্ম ও শিল্পব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করে ললিতকলা চর্চার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৮.৬ দেশে ললিতকলা বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ ও চর্চার জন্য যেসব উপকরণ ও সরঞ্জাম সহজলভ্য নয়, যেমন চলচ্চিত্র প্রজেকটর, এপিডায়াস্কোপ, ওভারহেড প্রজেকটর, ভিডিও প্রজেকটর, রেকর্ডার ও ক্যামেরা, যাবতীয় কম্পিউটার, উন্নতমানের বাদ্যযন্ত্র, রং তুলি কালি, কাগজ–ক্যানভাস, পাথর, সিমেন্ট, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ও নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য সহজলভ্য করতে হবে।

৯. উচ্চতর পর্যায়ে ললিতকলা শিক্ষা

৯.১ বর্তমান অবস্থা

ললিতকলার উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ ও ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থায় তা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। চারুকলা বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে চার বছরের সম্মান কোর্স ও দু বছরের মাস্টার্স কোর্স রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগে রয়েছে চারুকলার কয়েকটি বিষয় এবং নাট্যকলায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে রয়েছে নাট্যকলা ও সংগীত এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে নাট্যকলা বিভাগ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলায় স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রামের সরকারি আর্ট কলেজ ও খুলনা আর্ট কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে স্নাতক পর্যন্ত ললিতকলা শিক্ষার সুযোগ রয়েছে।

১০. সুপারিশ

১০.১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের মত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযুক্ত চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে ললিতকলার বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করা যেতে পারে। বিকল্পে স্নাতক ও সম্মান পর্যায়ে চার বছরের কোর্স এবং মাস্টার্সে দুই বছরের কোর্স চালু করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ললিতকলা বিষয়ক বিভাগ খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০.২ উচ্চতর পর্যায়ে ললিতকলা শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত করার নীতি নির্ধারণ করা যায়। ললিতকলায় এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অধ্যায়—১৬

আইন শিক্ষা

১. ভূমিকা

দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ও দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টির জন্য আইন শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। দেশে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্যও আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আইন শিক্ষার দুটি দিক রয়েছে—পেশাগত ও ব্যবহারিক, দেশে প্রচলিত আইন শিক্ষায় এ দুটি দিকের কোনটারই সুষ্ঠু বিকাশ লক্ষ করা যাচ্ছে না। আইন শিক্ষার মান যেমন নানা কারণে নিম্নমুখী হচ্ছে তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এর কল্যাণকর ফলাফল সব সময় লক্ষ করা যাচ্ছে না। তাই আইন শিক্ষার সার্বিক পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা আইন সম্পর্কে যেন আরও আগ্রহী, সচেতন এবং এর কল্যাণকর দিক সম্পর্কে জ্ঞাত হয় সে বিষয়েও আইন শিক্ষাকে অধিকতর প্রয়োগমুখী করতে হবে। তাই দেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রচলিত আইন শিক্ষার আশু সংস্কার সাধন করতে হবে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১ আইন শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে আইন ও অধিকার সচেতন করে তোলা।

২.২ সুদক্ষ শিক্ষক, আইনজীবী, আইনবিদ ও বিচারক তৈরি করা।

২.৩ এমন উচ্চ যোগ্যতা, উন্নত চরিত্র, ধীশক্তি ও জ্ঞান–সম্পন্ন ব্যক্তি সৃষ্টি করা যাঁরা—

২.৩.১ আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের আদর্শ সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবেন।

২.৩.২ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবেন।

২.৩.৩ পেশাগত দক্ষতা ও নৈতিকতার আদর্শ স্থাপন করবেন।

২.৩.৪ আইন ও বিচার পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নতি সাধন করতে পারবেন।

২.৩.৫ আমাদের পরিবর্তনশীল সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে আইনশিক্ষা ও তার ব্যবহারিক অনুশীলনের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবেন।

৩. বর্তমান অবস্থা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আইন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে এবং আইন শিক্ষার মানের আশঙ্কাজনক অবনতি ঘটছে। আইন কলেজগুলোতে আইন শিক্ষা দেওয়ার প্রচলিত ব্যবস্থা অসন্তোষজনক। প্রায় কলেজগুলোতে উপযুক্ত পরিবেশ, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, কলেজের নিজস্ব ভবন, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য ভৌত সুবিধা, যোগ্যতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, ছাত্র ভর্তির ন্যূনতম মান রক্ষার জন্য নিয়মকানুনের অভাব এবং প্রচলিত পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি এই অবনতির জন্য মূলত দায়ী।

৪. সুপারিশ

৪.১. আমাদের জীবনে আইনের আওতার ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণের কারণে দু বছর মেয়াদি এলএলবি কোর্স দ্বারা আইন শিক্ষায় প্রয়োজনীয় বুৎপত্তি অর্জন সম্ভব নয়। আইন শিক্ষার মানোন্নয়নকল্পে এলএলবি কোর্সের মেয়াদ দু বছরের পরিবর্তে তিন বছর হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনার্স কোর্সের চার বছরের মেয়াদকে যথাযথ মনে করা যায়।

৪.২ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির জন্য মেধাই প্রধান মাপকাঠি। আইন কলেজগুলোতে মেধার বিচার করে ভর্তি করা হয় না বলে নিম্নমানের ছাত্রছাত্রী আইন কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়। ফলে শিক্ষার মানের অবনতি হয়। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে এসএসসি, এইচএসসি ও ডিগ্রি পরীক্ষায় যে কোন দুটিতে কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ থাকা উচিত। এই যোগ্যতা মহিলাদের জন্য শিথিলযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির প্রচলিত মান ও নিয়ম সন্তোষজনক।

৪.৩. বর্তমান আইন শিক্ষার ব্যবহারিক ও প্রয়োগমুখী দিকের ওপর তেমন গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। আইন শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে যথাযথ পরিচয়বিধানও এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কলেজগুলোতে এলএলবি কোর্সটিকে দু ভাগে বিভক্ত করা উচিত। প্রথম অংশের মেয়াদ দু বছর এবং দ্বিতীয় অংশের মেয়াদ এক বছরের হবে এবং প্রতি অংশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণ করবে। প্রথম দু বছর আইনের ইতিহাস, মৌলিক বিষয়সমূহ ও সূত্রপাঠে ব্যয়িত হবে। তৃতীয় বর্ষে দলিল প্রণয়ন, সওয়াল জওয়াব, আর্জি–মুসাবিদা, মামলা পরিচালনা বিধি ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে। এছাড়া মামলার ইতিহাস লেখা, মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করা, পেশাগত নৈতিকতা ও দায়িত্ব পালন এবং আইনবিষয়ক রচনা ও গবেষণা এবং মুট কোর্ট এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্সের চতুর্থ বছরে ব্যবহারিক বিষয়সমূহে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৪.৪. পাঠ্যসূচি ও পরীক্ষা পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করে তোলা প্রয়োজন। কৃতিস্বত্ব আইন, আন্তদেশ আইন, আইনের ইতিহাস, প্রশাসনিক আইন, প্রচলিত আইনের পাঠ্যসূচিতে টিউটোরিয়াল, সামাজিক, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা চালু করা প্রয়োজন। পরীক্ষা পদ্ধতি সমস্যা–সমাধানমূলক হওয়া বিধেয়। আইন শিক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য পাশের নম্বর ৪৫ হওয়া এবং তৃতীয় শ্রেণীর ডিগ্রি না থাকা বাঞ্ছনীয়। আইন শিক্ষার জন্য ইংরেজি ভাষার বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা করে কলেজে এলএলবি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্সে ইংরেজি ভাষার ওপর একটি পূর্ণপত্র চালু করা প্রয়োজন।

৪.৫ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপারে আইন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছে। ফলে আইন ও বিচার পদ্ধতির সংস্কার, উন্নতি ও বিকাশের জন্য এবং বাংলাদেশের আইনের বিভিন্ন শাখায় তেমন উচ্চতর গবেষণা চোখে পড়ে না। তাই আইনের উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এলএলবি অনার্স, এলএল এম/এম ফিল ও পিএইচ ডি ডিগ্রি করার সুযোগ নেই, সেখানে তা অবিলম্বে করা উচিত।

৪.৬. আইন শিক্ষায় মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ হবে দু বছরের। মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স দু ভাগে বিভক্ত হবে। প্রথম অংশ হবে কোর্স কার্যক্রম এবং দ্বিতীয় অংশ হবে কোর্স কার্যক্রম বা থিসিস কার্যক্রম। যারা প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় অংশেই কোর্স কার্যক্রমে যোগদান করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের এলএল এম ডিগ্রি প্রদান করা হবে। যারা প্রথম অংশে কোর্স কার্যক্রম ও দ্বিতীয় অংশে থিসিস কার্যক্রমে যোগদান করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের এম ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হবে। পিএইচ ডি ডিগ্রির ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৪.৭ উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ লিগ্যাল ইনস্টিটিউট নামে একটি স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের দেশে ও বিদেশে গবেষণার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৮ আইন শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য আইন কলেজগুলোর ভৌত সুবিধা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৯ প্রয়োজনীয় শিক্ষক, ভবন, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ছাড়াই যত্রতত্র আইন কলেজ গড়ে উঠেছে এবং স্বীকৃতি পেয়েছে। নিম্নমানের আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা ও চালু রাখা যাতে সম্ভব না হয় সেই লক্ষ্যে আইন কলেজ

অনুমোদনের ব্যাপারে কলেজভবন, গ্রন্থাগার, শিক্ষক নিয়োগ, কলেজের প্রশাসন, পরিচালন, গভর্নিং বডি গঠন ইত্যাদির ব্যাপারে সাধারণ কলেজসমূহের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তাদি আইন কলেজের ক্ষেত্রেও কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

৪.১০ বর্তমানে আইন কলেজসমূহে খণ্ডকালীন শিক্ষক ও খণ্ডকালীন ছাত্রছাত্রী এবং সান্ধ্যকালীন কোর্স ও ক্লাস সব মিলিয়ে যে খণ্ডকালীন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান দরকার। তাই, নিয়ম ও নীতি হিসেবে পর্যায়ক্রমে আইন কলেজগুলোতে এলএলবি কোর্সকে পূর্ণকালীন দিবা কোর্সে রূপান্তরিত করা দরকার। ব্যতিক্রম হিসেবে, প্রয়োজনীয় শর্ত সাপেক্ষে কিছু প্রতিষ্ঠিত কলেজে নৈশ বা সান্ধ্যকালীন ব্যবস্থা থাকতে পারে।

৪.১১ আইন কলেজগুলোতে মোট শিক্ষকের অন্তত দুই–তৃতীয়াংশ নিয়মিত ও পূর্ণকালীন এবং অনধিক এক–তৃতীয়াংশ খণ্ডকালীন নিয়োগের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এ শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ কলেজগুলোতে প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। খণ্ডকালীন শিক্ষকগণ লব্ধ–প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবীদের মধ্য থেকে নিয়োগ করতে হবে।

৪.১২ উপযুক্ত আইন শিক্ষাদানের জন্য যথোপযুক্ত অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থাও থাকা উচিত। অন্যান্য পেশাগত শিক্ষার ন্যায় আইন শিক্ষার জন্যও দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত প্রতিটি বৃহত্তর জেলায় একটি করে সরকারি মডেল আইন কলেজ স্থাপন করতে হবে এবং বেসরকারি আইন কলেজগুলোতে অন্যান্য সাহায্য মঞ্জুর করা উচিত।

৪.১৩ আইনের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে দেশের সকল নাগরিকই দেশের সকল আইন সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন এবং আইনের ব্যাপারে অজ্ঞতাকে সাফাই হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। তাই দেশের অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠী যাতে আইন–সচেতন হতে পারে এবং আইন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে পারে সেজন্য মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পর্যায়ে অন্যান্য ঐচ্ছিক বিষয়ের ন্যায় আইনকেও একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক ইত্যাদি সব গ্রুপে প্রবর্তন করা যায়।

অধ্যায় —১৭

নারী শিক্ষা

১. ভূমিকা

দেশ ও সমাজ উন্নয়নের মূল ভিত্তি শিক্ষা। সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক নানা কারণে এ দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত থাকছে। এর মধ্যে দরিদ্র মানুষ যেমন বিশেষভাবে বঞ্চিত তেমনি তুলনামূলকভাবে সর্বস্তরে ব্যাপক সংখ্যক নারীও এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে সর্বদা নারীকে ঘিরে রাখা হয়েছে। পরিবারের মঙ্গল, শিশুযত্ন ও ঘরকন্নার কাজে নারীর শিক্ষা সীমাবদ্ধ রেখে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের জাতীয় উন্নয়নে নিষ্ক্রিয় রাখার পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রবণতা দূর করতে হবে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীও অসামান্য অবদান রাখে। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নারী আত্মনির্ভরশীল হতে এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হয়ে ওঠে। জাতীয় উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি নারী সংগঠনগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১. নারীশিক্ষার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

২.২. দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

২.৩. আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

২.৪. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

২.৫. মানবসম্পদ উন্নয়ন।

২.৬. দারিদ্র্য বিমোচন করে সমাজকে উন্নতির ধারায় প্রবাহিতকরণ।

২.৭. সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবার গঠন।

২.৮. জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির সংকোচন।

২.৯. যৌতুক ও নারী নির্যাতন নিরোধ।

২.১০. নারী ও পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৩. নারীর মানবাধিকার ও সংবিধান

১৯৭২ সালে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। বাংলাদেশে এই সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার বিধান করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতেও আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত মেয়েদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে।

৪. জাতীয় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম

গত কয়েক দশকে সারা বিশ্বে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থা ও নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, সাত বছর পর্যন্ত শিক্ষার হার ৩২.৪। এর মধ্যে ছেলে ও মেয়ের আনুপাতিক শিক্ষার হার ৩৮.৯ : ২৫.৫। কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্রসন্তানকে স্কুলে পাঠাতে মাতাপিতা বেশি আগ্রহী। কারণ তারা মনে করে বৃদ্ধ বয়সে পুত্রসন্তান তাদের রোজগার করে খাওয়াবে। গ্রামাঞ্চলে পরিবারের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ কন্যাসন্তানের জন্য বরাদ্দ থাকে। তবু মেয়েদের স্কুলে যাবার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। তবে ঝরে পড়া সংখ্যায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি। ১৯৯৪-এর পরিসংখ্যানমতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার শতকরা ২৫ ভাগ। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শতকরা ২৫ জন ছাত্রী এবং শতকরা ১৪ জন শিক্ষিকা। কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ কম। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীকে বিশেষ লক্ষ্য জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সর্বশেষ পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় পরিকল্পনায় (১৯৯১-২০০০), খসড়া অংশগ্রহণমূলক পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (১৯৯৫-২০১০) এবং পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) নারীর সর্ববিধ উন্নতি এবং বিশেষভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে তার অগ্রগতির ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৫. নিরক্ষরতা দূর করে নারী শিক্ষার পথে যেসব বাধা আছে তা প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে প্রচার করা দরকার। সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে কমিউনিটি ওয়ার্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কি পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষার আদান প্রদান হচ্ছে, সমাজের লোকজন এই শিক্ষা বিষয়ে কতটুকু অবদান রাখছে, অভিভাবকগণ সন্তানের শিক্ষার জন্য কি পরিবেশ ও দৃষ্টান্ত রাখছেন—এসব শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে যুক্ত হতে হবে।

৬. সুপারিশ

নারীশিক্ষা বিষয়ে বিবেচনা করতে গেলেই সংখ্যার ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাই আরও অধিক সংখ্যায় মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনা আবশ্যক এবং সেই লক্ষ্যে যথার্থ অবকাঠামো ও স্কুলে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাও জরুরি। শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি এবং নারীর সমানাধিকারের প্রতিষ্ঠায় তার প্রতি প্রচলিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের বিষয়টিও গুরুত্বসহকারে বিবেচনার দাবি রাখে। সেই লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তিনটি স্তরে ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

৬.১ প্রাথমিক শিক্ষা

৬.১.১ স্কুলে শিক্ষকদের ব্যবহারে ছেলে ও মেয়ের প্রতি প্রথম থেকেই সমতার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। এই বয়সে মেয়েদের মধ্যে হীনমন্যতা সার্বিকভাবে দূর করতে হবে এবং ছেলেদের উঁচু মনোভাব দূর করতে হবে।

৬.১.২ ছেলেমেয়ে উভয়ই সমান এবং উভয়কেই সমাজ, পরিবার ও জীবনে সমান অংশীদার হিসেবে পরিপূরক ভূমিকা পালন করে উভয়ের বিকাশ সমানভাবে হওয়ার ক্ষেত্রে পিতামাতা ও শিক্ষকদের সহযোগিতা করতে হবে।

৬.১.৩ প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেয়েদের ঝরে পড়া বন্ধ করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং স্কুলের পরিবেশকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

৬.১.৪ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে আরও অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীর রচনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়াও পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ের নারী-আন্দোলনের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়বস্তু সংযোজন করতে হবে। এই সকল নারী ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের

সাধারণ নারীর জীবনসংগ্রাম ও সাফল্যের কথা তুলে ধরে দেশগঠনের ক্ষেত্রে নারীর অবদানের বিষয়টির প্রতি এই পর্যায়ে ছেলে ও মেয়েদের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত।

৬.১.৫ প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে শুধু মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করার সরকারি সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন এবং সেই লক্ষ্যে যতদিন পর্যন্ত মহিলা শিক্ষকের সরকারি কোটা পূরণ না হবে ততদিন পর্যন্ত শুধু মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৬.১.৬ নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টি করা, মেয়েদের আসা যাওয়ার সুবিধার্থে গ্রামে প্রয়োজনবোধে প্রতি এক মাইলের কম দূরত্বে অন্তত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার এবং ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে খেলাধুলায় সমান সুযোগ–সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৬.২. মাধ্যমিক শিক্ষা

৬.২.১ এ পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সব বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমান সুযোগদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নাহলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মেয়েরা অঙ্ক বা বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় আর ছেলেরা সেলাই বা গার্হস্থ্য শিক্ষার প্রতি মোটেই আকৃষ্ট হয় না। সমান সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ের সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন ছেলেমেয়েদের জন্য একই পাঠ্যসূচি গ্রহণ করা। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যবিষয়ে নারীপুরুষ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে কোন ভিন্নতা বা বৈষম্য রাখা চলবে না।

৬.২.২ মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায় থেকেই নাগরিক জীবনের আরও কিছু বিষয় পাঠ্যসূচিতে আনা আবশ্যক। গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সমনাগরিকত্ব বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাক্রম তৈরি করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর প্রবন্ধ যেমন, নারীদের ভোটাধিকারের আন্দোলন, শিশুদের অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের সচেতন করবে।

৬.২.৩ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা দরকার। বর্তমানে মেয়েদের জন্য মাত্র একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে। পরবর্তীতে কোন ছাত্রী যদি উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী না হয় বা তারপক্ষে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ সম্ভব না হয় তাহলে সে যাতে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেই সুযোগ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে রাখতে হবে।

৬.২.৪ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম হওয়াতে ছাত্রীদের সুবিধার জন্য যাতায়াত ও হোস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.২.৫ কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলেরা মেয়েদের বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের আচরণ মেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে যাওয়ার একটি প্রধান কারণ। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সম্পর্ক সহজতর করার শিক্ষাদানের মধ্য দিয়েই তা রোধ করা সম্ভবপর হবে। নারী ও যৌন জ্ঞান সম্পর্কে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া দরকার। এতে নারী–নির্যাতনের প্রবণতা কমবে বলে আশা করা যায়।

৬.২.৬ মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা, শিশু অধিকার সনদ, সিডো, নাইরোবি ফরওয়ার্ড লুকিং স্ট্র্যাটেজি, বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন, স্থানীয় সরকার পরিষদ, জাতীয় সরকারের ভূমিকা, মৌলিক অধিকার, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিসমূহ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.২.৭ বিজ্ঞান শিক্ষায় মেয়েদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মেয়েদের স্কুলে অধিকতর গবেষণাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।

৬.৩. উচ্চ শিক্ষা

৬.৩.১ স্নাতক পর্যায়ে তত্ত্বশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীবাদ সম্পর্কে শিক্ষাদান আবশ্যক। আজকের দিনে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি যে কোন পাঠের ক্ষেত্রেই নারী–আন্দোলন–বিশ্লেষণ একটি মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে বিবেচ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমেন্স স্টাডিজ নামে আলাদা বিভাগ করা যেতে পারে।

৬.৩.২ প্রকৌশল, কৃষি ও চিকিৎসা এবং মাদ্রাসা স্নাতক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানববিদ্যা সম্বন্ধে একটি কোর্স বাধ্যতামূলক করা দরকার। এই কোর্সে অবশ্য জেন্ডার বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৬.৩.৩ নারীশিক্ষার হার বাড়াতে হবে এবং সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও সিডোর সনদের বাস্তবায়নের নির্দেশনা অনুযায়ী নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করতে হবে। প্রাইভেট সেক্টরকে এক্ষেত্রে অনুদান দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬.৩.৪ শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে সকল নীতিনির্ধারণী ও সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে মন্ত্রণালয় থেকে উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬.৩.৫ ঝরে পড়া ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে।

৬.৩.৬ মেয়েদের জন্য বর্তমানে প্রচলিত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা করার জন্য দরিদ্র ও অসহায় ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

অধ্যায়—১৮

বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড শিক্ষা

১. বিশেষ শিক্ষা

১.১ যে সব শিশু শারীরিক ও মানসিক সমস্যার জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ করতে পারে না তাদের জন্য প্রয়োজন বিশেষ শিক্ষা, দক্ষ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যা। বিশেষ শিশুদের আওতায় পড়ে শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী ও এপিলেপটিক। প্রতিবন্ধিত্বের মাত্রা অনুসারে এদের মৃদু প্রতিবন্ধী, মাঝারি প্রতিবন্ধী ও গুরুতর প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

১.২ বিশেষ শিক্ষার বিভিন্ন ব্যবস্থা

প্রতিবন্ধিত্বের মাত্রা এবং প্রাপ্ত সুযোগ–সুবিধার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম দেখা যায়।

১.২.১ সমন্বিত কার্যক্রম : সমন্বিত কার্যক্রমে বিশেষ শিশুদের নিয়মিত শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকগণই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। স্বল্প ও মাঝারি মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশুরা এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে পারে। এ ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞের তেমন প্রয়োজন হয় না।

বিশেষ শিক্ষক : সমন্বিত কার্যক্রমে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষক পরামর্শ ও নির্দেশনা দিতে পারেন এবং শ্রেণী শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষার প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।

ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক : বিশেষ শিক্ষক এক স্কুল থেকে আর এক স্কুলে উপস্থিত হয়ে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও নির্দেশনা দিতে পারেন এবং বিশেষ শিশুদের শিক্ষা দিতে পারেন।

রিসোর্স শিক্ষক : রিসোর্স শিক্ষক একাই একটি স্কুলে বিশেষজ্ঞদের সব কাজ করেন। নিয়মিত শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকদের সহায়তা করেন। প্রয়োজনে বিশেষ শিশুদের শিক্ষা দেন।

১.২.২ স্বাভাবিক শিশুদের বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষাশ্রেণী : বিশেষ শিক্ষকদের পরিচালনায় মৃদু ও মাঝারি মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশুরা এই বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বিশেষ শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং সংগীত, ছবি আঁকা ও শরীরচর্চা ক্লাসে স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে ক্লাস করে।

১.২.৩ বিশেষ বিদ্যালয় : এ ধরনের স্কুলে বিশেষ শিশুরা আলাদাভাবে সারাদিন প্রশিক্ষণ পায়। এসব স্কুলে বিশেষ সরঞ্জাম ও পরিচর্যার ব্যবস্থা থাকে।

১.২.৪ আবাসিক বিদ্যালয় : এ ধরনের ব্যবস্থায় নিজের বাসস্থান থেকে দূরে স্কুলের ছাত্রাবাসে থেকে বিশেষ শিশুরা শিক্ষালাভ করে।

১.৩ বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা কত তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। জাতিসংঘের হিসাব অনুসারে মোট জনসংখ্যার ১০% প্রতিবন্ধী। জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা দাঁড়ায়

১,২০,০০,০০০। সমাজে প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবের দরুন এদের বেশির ভাগই সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রধান ধারার বাইরে পরিবার ও সমাজের গলগ্রহ হয়ে নির্লিপ্ত ও অনুৎপাদনশীল জীবন যাপন করে। অথচ উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পেলে এদের অনেকেই সমাজের গলগ্রহ না হয়ে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

১.৪ বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছে এ রকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে মোট ৭৪টি।

১.৫ দৃষ্টিহীনদের জন্য সরকারি ব্যবস্থা

বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগ পরিচালিত ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল জেলায় দৃষ্টিহীনদের জন্য পাঁচটি প্রাথমিক স্কুল চালু রয়েছে। এদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বই লেখা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের আওতায় ৬৪টি মাধ্যমিক স্কুলে সমন্বিত কর্মসূচি চালু রয়েছে।

১.৬ দৃষ্টিহীনদের জন্য বেসরকারি ব্যবস্থা

বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা দৃষ্টিহীনদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে এ্যাসিসট্যান্স ফর দি ব্লাইন্ড চিলড্রেন, ব্যাপটিস্ট সংঘ অন্ধ বালিকা বিদ্যালয়, বাংলাদেশ দৃষ্টিহীন ফাউন্ডেশন, জাতীয় অন্ধ ফেডারেশন, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল, দি স্যালভেশান আর্মি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া CIDA, ILO -এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকার টঙ্গিতে শেলটারড ওয়ার্কশপ স্থাপিত হয়েছে দৃষ্টিহীনদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য। বাংলাদেশ ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দি ব্লাইন্ড মিরপুর এলাকায় অন্ধদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

১.৭ বধিরদের জন্য সরকারি ব্যবস্থা

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনায় একটি করে বধির স্কুল রয়েছে। চাঁদপুর, ফরিদপুর ও সিলেটে তিনটি স্কুল রয়েছে। ঢাকা মহানগরীর মোহাম্মদপুর ও ঢাকার অদূরে টঙ্গিতে হিয়ারিং সেন্টারে বধিরতার মাত্রা নির্ধারণ, উপযুক্ত চিকিৎসা, শ্রবণ সাহায্যকারী যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামত করার ব্যবস্থা রয়েছে।

১.৮ বধিরদের জন্য বেসরকারি ব্যবস্থা

বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ঢাকা, ময়মনসিংহ, বগুড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে বধির ছেলেমেয়েদের জন্য চারটি বিদ্যালয় তৈরি করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় বধির সংস্থা, হাইকেয়ার, সোসাইটি ফর দি এসিসট্যান্স টু হিয়ারিং স্পেয়ারড চিলড্রেন, রোটারি ক্লাব এসব সংস্থাও বধিরদের জন্য কাজ করছে।

১.৯ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি ব্যবস্থা

ঢাকার পঙ্গু পুনর্বাসন ও চিকিৎসা কেন্দ্রে অস্ত্রোপচার, ফিজিওথেরাপি, কৃত্রিম অঙ্গ তৈরির ব্যবস্থা রয়েছে।

১.১০ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বেসরকারি ব্যবস্থা

বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার, উইমেন্স ভলান্টারি এসোসিয়েশন এবং পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে।

১.১১ মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবস্থা

ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্পেশাল এডুকেশন, সোসাইটি ফর দি কেয়ার এন্ড এডুকেশন অব মেন্টালি রিটারডেড, বাংলাদেশে এসসিইএমআরবি, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেছে।

১.১২ সুপারিশ

১.১২.১ বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য সনাক্তকরণ ও জরিপ চালাতে হবে।

১.১২.২ জাতিসংঘের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের দ্রুত উন্নতি হয়। অল্প ব্যয়ে এ ব্যবস্থা চালু করা যায়।

১.১২.৩ সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের অধীনে যে ৬৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে সেগুলোর উন্নতি করা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থা শ্রবণ, বচন, মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য চালু করা বাঞ্ছনীয়। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে অল্প ব্যয়ে এ ব্যবস্থা চালু করা যায়।

১.১২.৪ দৃষ্টি, শ্রবণ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম খোলা প্রয়োজন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অল্প ব্যয়ে এ ব্যবস্থা চালু করা যায়।

১.১২.৫ প্রতিবন্ধীদের জন্য যে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু রয়েছে সেগুলোর অনতিবিলম্বে উন্নতি প্রয়োজন।

১.১২.৬ প্রতিবন্ধীদের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন।

১.১২.৭ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।

১.১২.৮ প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষাক্রমে প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

১.১২.৯ প্রতিবন্ধিত্বের কারণে এক বা একাধিক বিষয় অধ্যয়নে অসমর্থ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিকল্প শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে।

১.১২.১০ চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্য প্রতিবন্ধীদের সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে। ১০% আসন প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে।

১.১২.১১ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১.১২.১২ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য কার্যক্রম সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের আওতায় না রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনতে হবে।

১.১২.১৩ সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে প্রস্তাবিত সমন্বিত শিক্ষা চালু করার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে বিশেষ শিক্ষা এবং প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এতে সাধারণ শ্রেণীতে শিক্ষকের পক্ষে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করা সহজতর হবে।

১.১২.১৪ সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় স্কুলগুলোতে অন্তত একজন বিশেষ শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

২. স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা

২.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে অবহেলিত অংশ স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা। শিক্ষিত জাতি গঠনে সাধারণ শিক্ষার মতো স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ দুটোকে বাদ দিলে সাধারণ শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ বলা যাবে না।

২.২ প্রয়োজনীয়তা

শিশুকাল থেকে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া হলে প্রথমত তারা তাদের শরীর ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ রাখার দিকে মনোযোগী হবে। দ্বিতীয়ত তারা নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শিখতে শুরু

করবে। সময়ানুবর্তিতা শারীরিক শিক্ষার অন্যতম পাঠ। তৃতীয়ত শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ শুরু হবে। এক পর্যায়ে তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে বরেণ্য খেলোয়াড়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি শরীরচর্চা ও খেলাধুলার পর্যাপ্ত সুযোগ–সুবিধা থাকে তাহলে বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। মাদক দ্রব্যের মত ভয়াল অভিশাপ শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারে না যদি তারা উপযুক্ত খেলাধুলার পরিবেশ পায়।

২.৩ বর্তমান অবস্থা

দেশের বর্তমান শারীরিক শিক্ষার চিত্র খুবই করুণ। শহরের অধিকাংশ স্কুল কলেজে খেলার মাঠ নেই, তাই খেলাধুলা বা শরীরচর্চার কোন সুযোগ নেই। আর গ্রামের স্কুল কলেজগুলোতে মাঠ থাকলেও শরীরচর্চা শিক্ষক ও উপকরণ নেই। ফলে শহর গ্রাম কোথাও শারীরিক শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে না। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শরীরচর্চা বা পিটি করার নিয়ম থাকলেও ছাত্রছাত্রীরা সেটাকে অপরিহার্য মনে করে না। যেহেতু শারীরিক শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষা বা পাশ করার সম্পর্ক নেই তাই ছেলেমেয়েরা এটাকে শিক্ষার বিষয় হিসেবে মনে করে না।

২.৪ সুপারিশ

২.৪.১ শরীরচর্চা ও খেলাধুলার অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনায় এ বিষয়টিকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্যসূচিতে আবশ্যিক ঘোষণা করা দরকার। এ জন্য প্রতি শ্রেণীতে নম্বর বরাদ্দ থাকবে এবং তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে পারদর্শিতা নিরূপণ করতে হবে।

২.৪.২ প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয়স ও সামর্থ্য বিবেচনা করে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যসূচিকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করতে হবে।

২.৪.৩ শরীরচর্চা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক শিক্ষা দিতে হবে।

২.৪.৪ নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের সময় খেলার মাঠ থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২.৪.৫ স্বল্পমূল্যে স্কুল কলেজে শারীরিক শিক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে।

২.৪.৬ দেশে প্রচলিত অন্যান্য খেলার সঙ্গে ব্রতচারী নৃত্য, কাবাডি, দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট এসব দেশীয় খেলার প্রচলন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে করতে হবে।

২.৪.৭ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষা ক্ষেত্রে মেধা অনুযায়ী বৃত্তির প্রচলন করতে হবে।

২.৪.৮ খেলাধুলার প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

২.৪.৯ শারীরিক শিক্ষার ওপর উচ্চতর ডিগ্রি প্রাপ্তি ও চাকরির সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

২.৪.১০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষা

৩.১ ভূমিকা

ঔপনিবেশিক শাসন আমলে বাঙালি সমরবিমুখ জাতি এ ধুয়া তুলে প্রতিরক্ষা কার্যক্রম থেকে বাংলাদেশের জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর দুর্বলতা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রণীত ভারতীয় টেরিটরিয়াল ফোর্সেস এ্যাক্ট, ১৯২০ এর অধীনে ব্রিটিশ ভারতে রিজার্ভ ফোর্স ও শিক্ষায়তনে সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উন্নত দেশগুলোতে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এই ব্যবস্থার ইতিবাচক দিক হচ্ছে শান্তিকালীন সময়ে প্রতিরক্ষা ব্যয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে দেশের উন্নয়নমূলক কাজে গুরুত্ব দেওয়া যায়। অপরদিকে আপৎকালীন সময়ে অতি দ্রুত প্রতিরক্ষা বাহিনীকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সম্প্রসারণ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামরিক শিক্ষার

প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। তাছাড়া সামরিক শিক্ষার একটা নৈতিক দিকও রয়েছে। এই শিক্ষার ফলে মানুষের জীবনে শৃঙ্খলাবোধ জন্মে, মানুষ ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে গোষ্ঠী তথা সমাজের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখতে শেখে, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও দেশপ্রেম জন্মে, আইনের শাসনের প্রতি মানুষ হয় শ্রদ্ধাশীল, সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে কয়েকটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয় এবং ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে স্বল্পসংখ্যক ছাত্রের জন্য জেসিসি (জুনিয়র ক্যাডেট কোর) এবং ইউ ও টি সি'র মাধ্যমে সামরিক শিক্ষার সুযোগ ছিল। ১৯৭৮ সালে জে সি সি এবং ইউ ও টি সি'র সমন্বয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্যে বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩.২ ক্যাডেট কোরের মূল লক্ষ্য

ক. যুব সমাজের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন, নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ, যুব সমাজকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ;

খ. দেশের কাজে ত্যাগের মনোভাব গঠন ও নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা ;

গ. বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সারির প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা ;

ঘ. দেশের উন্নয়ন কাজে ও দুর্যোগের দিনে সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবী সৃষ্টি করা ;

ঙ. দেশগড়া, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ছাত্র যুব সমাজের দায়িত্ব ও চেতনাবোধ সৃষ্টি এবং সে লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৩.২.১ বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোর মাধ্যমিক পর্যায়ে কেবলমাত্র ছাত্রদের এবং উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের সামরিক শিক্ষা প্রদান করছে। এই কোরে সেনা, নৌ, বিমান তিনটি শাখা রয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোর বর্তমানে পাঁচটি সেনা রেজিমেন্ট, একটি নৌ ও একটি বিমান উইং সমন্বয়ে প্রতি বছর মাত্র ১৫,০০০ ছাত্রছাত্রীদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ছাত্রছাত্রীবৃন্দ পর পর মাত্র দুবছরের জন্য বি এন সি সি'র সদস্য বা ক্যাডেট থাকতে পারে। ক্যাডেটবৃন্দ বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া, ক্যাডেটরা স্থানীয় পর্যায়ে এ্যাডভেঞ্চার ট্রেনিং কোর্সে যোগ দেয়। ক্যাডেটবৃন্দ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন দুর্যোগকালে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দুঃস্থ জনগণের পাশে এসে দাঁড়ায়।

মাধ্যমিক পর্যায়ে বর্তমানে ১৭৪টি স্কুলে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ৪৬১৫ জন ছাত্রের জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্থ উচ্চমাধ্যমিক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি পর্যায়ের ২৯৫টি কলেজের ৮৫৭৯ জন পুরুষ ক্যাডেট এবং ৪৬টি মহিলা কলেজের ২৬৭২ জন মহিলা ক্যাডেট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮৭৩ জন পুরুষ ও মহিলা ক্যাডেটের জন্য সামরিক শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া ডিগ্রি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডেটবৃন্দ জুনিয়র ও সিনিয়র সমর বিজ্ঞান পাঠ গ্রহণ ও সার্টিফিকেট কোর্স এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সামরিক বিজ্ঞান কোর্স চালু করা হচ্ছে।

৩.৩ সুপারিশ

৩.৩.১ যেহেতু বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে, সেজন্য বি এন সি সি'র অধীন ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর বর্তমান ব্যবস্থা রহিত করতে হবে।

৩.৩.২ বর্তমানে সমাজ জীবনে বিভিন্ন অবক্ষয় রোধকল্পে ও বিভিন্ন মানবিক গুণের পরিস্ফুটন ও পরিবর্ধনের জন্য ডিগ্রি বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে দেশের সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এন সি সি শাখা খোলা প্রয়োজন এবং বাধ্যতামূলকভাবে ছাত্রছাত্রীদের সপ্তাহকাল প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৩.৩.৩ সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আজকের যুব সমাজকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নাগরিককে একবিংশ শতাব্দীতে জীবনের বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

৩.৩.৪ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক বিজ্ঞান বিষয়কে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে খুলতে হবে।

৩.৩.৫ দেশের আপৎকালীন সময়ে সমগ্র জাতিকে সামরিক শক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশের তরুণতরুণীকে প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষার পর অলস সময়ে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ শিবিরে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

স্কাউট ও গার্ল গাইড বিষয়ক শিক্ষা

৪. স্কাউট

৪.১ ভূমিকা

উপমহাদেশে স্কাউট আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয় ১৯২০ সালে। ভারত বিভক্ত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান বয় স্কাউট সমিতির মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বয় স্কাউটের যাত্রা শুরু হয় এবং দেশের বিদ্যালয়সমূহে স্কাউট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অতঃপর মহান মুক্তিযুদ্ধের ফলে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বয়স্কাউট সমিতি আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৭৪ সালে ওয়ার্ল্ড অরগানাইজেশন অব দি স্কাউট মুভমেন্ট কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে উক্ত সমিতি 'বাংলাদেশ স্কাউটস' নামে অভিহিত হয়।

৪.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. দেশের শিশু, কিশোর–কিশোরী, তরুণ–তরুণীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল, সৎ, চরিত্রবান, কর্মোদ্যমী, সেবাপরায়ণ, স্বাস্থ্যসচেতন, সর্বোপরি আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ;

খ. স্কাউট কর্মসূচি অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটিয়ে তরুণদের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল, আত্মসচেতন ও পরোপকারী হিসেবে গড়ে ওঠার গুণাবলি অর্জনে সহায়তা দান করা।

৪.৩ বর্তমান অবস্থা

দেশের চারটি মেট্রোপলিটন এলাকাসহ ৬৪টি জেলা ও ৪৬০টি থানায় অবস্থিত বিদ্যালয় ও কতিপয় মাদ্‌রাসায় স্কাউট কার্যক্রম সম্প্রসারিত। তাছাড়া দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসায় কাব স্কাউটিং এবং সর্বস্তরে গার্ল–ইন–স্কাউটিং প্রচলন করা হয়েছে। স্কাউট আন্দোলনের মূলত তিনটি পর্যায় রয়েছে : কাব–প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬–১০ বছর বয়সী শিশু কিশোরদের ; স্কাউট–মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্‌রাসার ১১–১৬ বছর বয়সী তরুণদের ; রোভার–কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭–২৫ বছর বয়সী যুবকদের। বর্তমানে সর্বমোট পরিসংখ্যান ৬,০২,৯৯০। ২০০২ সালের মধ্যে দেশব্যাপী সকল স্তরের স্কাউট সদস্য সংখ্যা ১০ লাখে উন্নীত করার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.৪ সুপারিশ

৪.৪.১ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল ও মাদ্‌রাসায় কাব, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল ও দাখিল মাদ্‌রাসায় স্কাউট এবং কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় (১১শ শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর) এবং আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসায় রোভার দল গঠন করতে হবে।

৪.৪.২ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে স্কাউটিংকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫. গার্ল গাইড

৫.১ ভূমিকা

গার্ল গাইড আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয় ১৯০১ সালে এবং এই উপমহাদেশে এই আন্দোলন শুরু হয় ১৯১১ সালে। ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান গার্ল গাইড সমিতির মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে

গার্ল গাইডের যাত্রা শুরু হয়। এরপর মহান মুক্তিযুদ্ধের ফলে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ গার্ল গাইড সমিতি আত্মপ্রকাশ করে। দেশের অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য গাইড প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

৫.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. দেশের শিশু কিশোরী, তরুণীদের পর্যায়ক্রমে গার্ল গাইড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল, সৎ, চরিত্রবান, কর্মোদ্যমী, সেবাপরায়ণ, স্বাস্থ্যসচেতন, সর্বোপরি আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ;

খ. গার্ল গাইড আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটিয়ে তরুণীদের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল, আত্মসচেতন ও পরোপকারী হিসেবে গড়ে ওঠার গুণাবলি অর্জনে সহায়তা দান করা।

দেশের চারটি মেট্রোপলিটন এলাকাসহ ৬৪টি জেলা ও ৪৬০টি থানায় অবস্থিত বালিকা বিদ্যালয়ে গার্ল গাইড কার্যক্রম সম্প্রসারিত। গার্ল গাইড আন্দোলনের মূলত তিনটি পর্যায় রয়েছে : ৫ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত হলদে পাখি, যার সংখ্যা ৭,০০০। ১১ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত গার্লস গাইড, যার সংখ্যা প্রায় ৩৫,০০০ এবং ১৭ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত রেঞ্জার, যার সংখ্যা প্রায় ৩,৫০০।

৫.৩ সুপারিশ

৫.৩.১ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত হলদে পাখি, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত গার্ল গাইড এবং একাদশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রেঞ্জার দল গঠন করতে হবে।

৫.৩.২ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গার্ল গাইডকে শিক্ষাক্রমে ছাত্রীদের জন্য একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫.৩.৩ দেশে বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে গার্ল গাইড বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে।

অধ্যায়—১৯

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

১. ভূমিকা

১.১ গ্রন্থাগার হল সভ্যতার দর্পণ। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার যেমন একটি দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশগত মাননির্ধারণের অন্যতম সূচক, তেমনি গ্রন্থাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ। প্রকৃত অর্থে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ ও এর গুণগত মান ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রাণ স্পন্দনের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। মোট কথা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা দেশের নাগরিকদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষা গ্রহণে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান এই তথ্য বিস্ফোরণের যুগে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত জ্ঞান ও তথ্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি। আজ তথ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদের মতই একটি অত্যাবশ্যক সম্পদ ও শক্তি হিসেবে বিবেচ্য। সকল সম্প্রদায়ের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য জ্ঞান ও তথ্য সম্পদ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য সেবা সৃষ্টি ও বিতরণ ব্যবস্থায় সবাই যাতে যথাযথ পরিবেশে সর্বোচ্চ সেবার সুযোগ পায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য সহজলভ্য করার দায়িত্ব হল দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রগুলোর—এ প্রত্যয়কে ভিত্তি করে দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

১.২ বর্তমানে দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং তাদের গৃহীত নীতি, পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও বিভাগও তথ্য কেন্দ্রগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সেক্টর হচ্ছে শিক্ষায়তনিক গ্রন্থাগার (শিক্ষা মন্ত্রণালয়), জাতীয় ও গণগ্রন্থাগার (সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়)। এর পরের অবস্থান হল স্বাস্থ্য, কৃষি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সেক্টর। এছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে আছে কিছু প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও বিশেষধর্মী গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র।

২. সুপারিশ

প্রাথমিক শিক্ষায় গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র

বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রশাসনাধীন অধিদপ্তরের পরিচালনায় প্রাথমিক স্কুল, পিটিআই, নেপ ও অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারসহ সকল গ্রন্থাগার উন্নয়ন করা জরুরি এবং যেসব প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার নেই সেসব প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। তবে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন বর্তমানে সাধ্যাতীত। কিন্তু সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার থাকা বাঞ্ছনীয়।

২.১ অবিলম্বে গণগ্রন্থাগারের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই পরিবেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য দেশের প্রত্যেকটি থানা সদরে একটি গণগ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই পরিবেশন করা এ গ্রন্থাগারের অন্যতম দায়িত্ব হবে।

২.২ প্রত্যেক ইউনিয়নের এক বা একাধিক নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ভ্রাম্যমাণ বইয়ের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে হবে। থানা গ্রন্থাগার থেকে বই প্রেরণ করা হবে এবং এ কেন্দ্রে এখান থেকে এলাকাভুক্ত প্রাথমিক

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

স্কুলের শিক্ষকগণ নিজেদের স্কুলের চাহিদা অনুযায়ী বই সংগ্রহ করবেন এবং ব্যবহারান্তে এখানেই ফেরত দেবেন। অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী প্রাথমিক স্কুলে থানা গ্রন্থাগার থেকে সরাসরি বই পরিবেশন চলবে।

২.৩ থানা শিক্ষা অফিসারের সভাপতিত্বে অন্যূন পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি পুস্তক পরিবেশন কমিটি এ ব্যবস্থার তদারকি করবেন।

২.৪ থানা গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যয়ভার বহন করবে সরকার। পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহও হবে সরকারের দায়িত্ব। প্রাথমিক স্কুলে পরিবেশনের জন্য বই কেনা এবং পরিবেশনের আনুষঙ্গিক ব্যয়ভারের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ যোগাবে যৌথভাবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় পৌরসভা।

২.৫ আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হবে দেশের প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন।

২.৬ পিটিআই, নেপ এবং অধিদপ্তরসমূহের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলোর আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২.৭ গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন কাঠামো যুগোপযোগী করতে হবে এবং তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩. মাধ্যমিক শিক্ষায় গ্রন্থাগার

মাধ্যমিক শিক্ষা হল উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব। শিক্ষার্থীদের গ্রন্থ ও তথ্য ব্যবহার শিক্ষা বা পাঠাভ্যাস এ স্তরেই গড়ে ওঠে। এসব মনে রেখেই মাধ্যমিক স্তরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করতে হবে।

৩.১ প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুলে গ্রন্থাগারের আয়তন এমন হবে যাতে মোট শিক্ষার্থীর ৫% একত্রে পাঠকক্ষ ব্যবহারের সুবিধা পায়।

৩.২ শিক্ষার্থীরা এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ অথবা স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত একটি ফি/অর্থ গ্রন্থাগার ফি বাবদ প্রদান করবে।

৩.৩ সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক মঞ্জুরি দিতে হবে।

৪. সাধারণ কলেজ গ্রন্থাগার

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত বিশ্বে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তেমন পার্থক্য করা হয় না। শিক্ষা কর্মসূচিই হল প্রধান বিষয়। এ সত্য স্বীকার করে প্রতি কলেজেই আধুনিক মানের গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে।

৫. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগার

৫.১ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগারকে তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সহযোগিতা ও ল্যান, অনলাইন সেবার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৫.২ গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য গ্রন্থ ও সাময়িকী ক্রয়ের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে।

৫.৩ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করে গ্রন্থাগার স্থাপনের শর্ত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬. গণগ্রন্থাগার

গণগ্রন্থাগারকে বলা হয় জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। কারণ এটা গণসচেতনতা সৃষ্টি, জাতীয় সংস্কৃতি বিতরণ ও বিকাশ এবং সরকারি পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত ও উন্নয়ন কর্মসূচি গণমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে সাহায্য করে।

৬.১ সবগুলো বিভাগীয় শহর, জেলা এবং প্রত্যেক থানা ও ইউনিয়নে পর্যায়ক্রমে গণগ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে।

৬.২ স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ শহরগুলোতে নগর গ্রন্থাগার ও পৌর গ্রন্থাগার স্থাপন করবে।

৬.৩ গণগ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য অন্যান্য দেশের মত গণগ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৬.৪ গণগ্রন্থাগার ও স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার সেবা সৃষ্টিতে প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান করবে।

৬.৫ বেসরকারি পর্যায়ে গ্রন্থাগার স্থাপন উৎসাহিত করা হবে। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর যাতে সকল পর্যায়ে গণগ্রন্থাগার স্থাপনে সহযোগিতা করতে পারে এজন্য অধিদপ্তরকে লোকবল ও অর্থ দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে।

৭. জাতীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় আর্কাইভস

এ দুটি প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতার ধারক ও বাহক এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে তথ্যের যোগসূত্র স্থাপন ও প্রধান গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন করা।

৭.১ জাতীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় আর্কাইভসের কার্যক্রমের গুরুত্ব বিবেচনা করে এদের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে হবে। জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ শাখা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭.২ প্রতিষ্ঠান দুটিতে তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

৮. অন্যান্য গবেষণা এবং বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র

পূর্বে বর্ণিত গ্রন্থাগারগুলো ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও বিশেষ গ্রন্থাগারগুলো সমস্যায় ভারাক্রান্ত। কারণ এসব গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় জনবল ও বেতন কাঠামো, বাজেট ও ভৌত সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন সমতা নেই।

৮.১ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের ব্যান্সডক, (২) স্বাস্থ্য বিভাগের জাতীয় স্বাস্থ্য গ্রন্থাগার ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার, (৩) কৃষি বিভাগের সার্ক গ্রন্থাগার, (৪) বি সি এস আই আর–এর সদর গ্রন্থাগার, (৫) সেনাবিভাগের সদর গ্রন্থাগার, (৬) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় গ্রন্থাগার, (৭) বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার এবং (৮) ইসলামিক ফাউন্ডেশন সদর দপ্তরের গ্রন্থাগারকে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রের মর্যাদা পাবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন মসজিদ পাঠাগার কর্মসূচিকে জোরদার করতে হবে।

৮.২ উপরিউক্ত গ্রন্থাগারগুলোর মান পূর্বে উল্লেখিত (শিক্ষা সেক্টর) ক মানের এবং অন্যান্য তথ্যকেন্দ্র ও গ্রন্থাগারগুলোর মান হবে যথাক্রমে খ ও গ মানের। এসব গ্রন্থাগার কম্পিউটারাইজড করা হবে এবং বাজেটে গ্রন্থ ও সাময়িকী খাতে যথাযথ বরাদ্দ রাখতে হবে।

৯. নীতি, পরিকল্পনা ও সমন্বয়গত সমস্যার সমাধান ও উন্নয়ন

একটি আধুনিক জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর পরিচালনায় সমন্বয়, নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, মান নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপদেশ ও পরামর্শের জন্য একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা স্থাপন করা আবশ্যক। এ সংস্থার নীতিমালা অনুসরণ করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো নিজ নিজ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবে। কাউন্সিলের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হবে—

৯.১ নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা দান করা।

৯.২ বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের মান নির্ধারণে সহযোগিতা দান করা।

৯.৩ গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম গ্রহণ এবং পেশার মান উন্নয়নে একটি আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র পরিচালনা করা।

৯.৪ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ সংগঠন করা।

৯.৫ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগে পরামর্শ দান করা।

৯.৬ আন্তর্গ্রন্থাগার নেটিং ওয়ার্কিং ও রিসোর্স শেয়ারিং এ সহযোগিতা দান এবং ইউনিয়ন ক্যাটালগ ও গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়নে সহায়তা করা।

১০. **মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের দায়িত্ব**

১০.১ নিজ নিজ প্রশাসনাধীন গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন ও নতুন স্থাপনায় কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

১০.২ গৃহীত নীতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপন, উন্নয়ন এবং প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করা।

১০.৩ নিজ নিজ সেক্টরে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর মধ্যে তথ্য সম্পদ শেয়ারিং-এর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

১০.৪ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর পরিচালনার জন্য কাউন্সিলের মান অনুযায়ী অর্থায়ন, লোকবল নিয়োগ, ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টিসহ আবশ্যকীয় উপাদানগুলোর ব্যবস্থা করা।

১০.৫ গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে কাউন্সিলের সকল কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা।

১১. **কাঠামোগত সংস্কার**

যে সব মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তরের আওতায় মাঠ পর্যায়ে (গণগ্রন্থাগার বাদে, তাদের চেইন অব কমান্ড রয়েছে) অসংখ্য গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র রয়েছে (যেমন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন) এসব ক্ষেত্রে করণীয় হল—

১১.১ গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবাকার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে একজন যুগ্ম-সচিব (গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা)-কে দায়িত্ব প্রদান করা।

১১.২ অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরে একজন পরিচালক (গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা) ও আবশ্যক সহযোগী কর্মকর্তার সমন্বয়ে পৃথক শাখা গঠন করা।

১১.৩ মাঠ পর্যায়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের সংখ্যা বেশি হলে অঞ্চল/জেলা পর্যায়ে পরিদর্শক বিশেষজ্ঞ (গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা) নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করা।

অধ্যায়—২০

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

১. ভূমিকা

১.১ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পেছনে এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। এ কার্যক্রমের যাবতীয় যোগান যেমন ভৌত সুবিধা, শিখন–সামগ্রী, শিক্ষক, সময় ইত্যাদি— ব্যবস্থার পর এর নির্ধারিত উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তা যাচাই হয়। অর্থাৎ শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের কতটুকু বাঞ্ছিত পরিবর্তন হল তা যাচাই করা প্রয়োজন হয়। শিক্ষা ও মূল্যায়নের সঙ্গে কতকগুলো পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন —

ক. পরীক্ষা : যে কোন বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অথবা সাফল্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি।

খ. অভীক্ষা : শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য পরিমাপের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত একগুচ্ছ প্রশ্ন বা কাজ।

গ. কৃতিত্ব–অভীক্ষা : বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত শিক্ষণীয় বিষয়ে তার জ্ঞান, দক্ষতা, কর্মসম্পাদন কুশলতা বোঝার ক্ষমতা যাচাইয়ের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া।

ঙ. পরিমাপ : একজন শিক্ষার্থীর কোন বৈশিষ্ট্য কি মাত্রায় আছে তার পরিমাণগত বিবরণী পাওয়ার প্রক্রিয়া।

চ. মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সবদিক, অর্থাৎ স্বাস্থ্য, আচার–আচরণ, প্রকাশভঙ্গি, মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহকরণ কৌশল এবং বিশ্লেষিত ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া।

মূল্যায়ন শব্দটিকে ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, একজন শিক্ষক যখন কোন একদল শিক্ষার্থীর সাফল্য পরীক্ষা করেন তখন তিনি বলতে পারেন যে, তিনি শিক্ষার্থীর সাফল্য মূল্যায়ন করছেন। মূল্যায়ন হল একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার সাহায্যে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থী কতটা সফল হয়েছে তা নিরূপিত হয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিমাণগত ও গুণগত দিক ছাড়া আরও রয়েছে আচরণের বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কিত মূল্যবিচার। আর পরীক্ষা হল মূল্যায়নের একটি কৌশল এবং অভীক্ষা হল পরীক্ষার একটি হাতিয়ার।

শিক্ষার্থীর আচরণের যে দিকগুলো তার সার্বিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে শিক্ষাবিদগণ চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হল :

ক. জ্ঞান–অর্জন সম্পর্কিত

খ. অনুভূতি সম্পর্কিত

গ. মনোপেশিজ সম্পর্কিত

উপরিউক্ত তিন প্রকার আচরণের মধ্যে আমাদের দেশের স্কুল ও কলেজের প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমটি মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর অন্য দুটি দিকও যাচাই করতে হবে।

সুপারিশ

২. প্রাথমিক স্তর

২.১ স্কুল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকতে পারে। বিশেষ করে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু থাকতে পারে।

২.২ শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য প্রতি বৎসর সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ ছাড়া প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কমপক্ষে শতকরা ৩০ জন বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে যা বর্তমানে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণী শেষে চালু আছে। বৃত্তি পরীক্ষা হবে পঞ্চম শ্রেণীর শেষে। অষ্টম শ্রেণীর শেষে পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

২.৩ প্রাথমিক স্তরের কোন শ্রেণীতেই শিক্ষক সমিতি বা অন্য কোন সমিতি কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নপত্র চলবে না। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষই এসব প্রণয়ন করবে এবং স্কুলগুলোকে সেখান থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

২.৪ যে সকল শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণীর শেষে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে না বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের একটি কোর্স সমাপ্তির সনদপত্র প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীর অন্তঃপরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল উক্ত সনদপত্রে লিপিবদ্ধ করবে। উক্ত সনদপত্র শিক্ষার্থীর জন্মতারিখ উল্লেখ করতে হবে। এ সনদপত্র শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফল হিসেবে গণ্য করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্তঃ ও বহিঃমূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

২.৫ পরীক্ষার্থীকে অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষায় আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৩. মাধ্যমিক স্তর

৩.১ দশম শ্রেণীর শেষে একটি পাবলিক পরীক্ষা থাকবে যার নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রথম পর্ব। মাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে। কোন শিক্ষার্থী দশম শ্রেণীর শেষে প্রথম পর্ব পরীক্ষায় যেসব বিষয়ে অকৃতকার্য হবে এগুলো দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় দিতে পারবে। দুই পরীক্ষার ফলাফল একত্র করে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে। কেউ দশম শ্রেণীর শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রথম পর্বের পর পড়াশুনা চালাতে না পারলে তাকে বোর্ড থেকে নম্বরপত্র দেওয়া হবে এবং স্কুল থেকে স্কুল ত্যাগের সনদ দেওয়া হবে।

৩.২ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষায় এক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরীক্ষার্থীকে ঐ বিষয়ে আর মাত্র একবার পরবর্তী পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পরিবর্তন হলে পুরাতন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী উক্ত প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। তাদের জন্য কোন অন্তর্বর্তীকালীন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাবে না। অনুরূপ সুযোগ অন্যান্য স্তরের পাবলিক পরীক্ষায়ও দিতে হবে।

৩.৩ কোন পরীক্ষার্থী একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয়ের জন্য প্রথম মূল পরীক্ষা এবং পরবর্তী পরীক্ষায় (যে পরীক্ষায় একটি বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে) প্রাপ্ত গ্রেড একত্র করে চূড়ান্ত গ্রেড নির্ণয় করা হবে।

৩.৪ পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে। পরীক্ষায় কোন মেধা তালিকা থাকবে না। গ্রেড নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জিপিএ (GPA) পদ্ধতি চালু করা হবে। কোন বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী ৪০% এর নিচে নম্বর পেলে তাকে অকৃতকার্য বলে গণ্য করা হবে। গ্রেড নির্ণয়ের মান নিম্নরূপ হবে।

A+ = ৯০% তার উর্ধ্বে

A = ৮০% এর উর্ধ্বে ৯০%এর নিচে

B = ৭০% উর্ধ্বে ৮০%এর নিচে

C = ৫৫% এর উর্ধ্বে ৭০%এর নিচে

D = ৪০% এর উর্ধ্বে ৫৫%এর নিচে

৩.৫ মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্তঃপরীক্ষায় শতকরা ২০ ভাগ মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে। বহিঃপরীক্ষা ৮০% এর মধ্যে রচনামূলক ৩০% সংক্ষিপ্ত উত্তরপ্রশ্ন ৩০% এবং নৈর্ব্যক্তিক ২০%। অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষায় আলাদাভাবে পাশ করতে হবে। অন্তঃপরীক্ষার নম্বর বহিঃপরীক্ষার নম্বরের আনুপাতিক হার বা তার কাছাকাছি হতে হবে। অন্যথায় অন্তঃপরীক্ষায় কেবল পাশ নম্বর পাবে। তবে বিষয়ভিত্তিক গ্রেড নির্ণয় করা হবে। পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন মেধা তালিকা থাকবে না।

৪. পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক ও প্রশ্ন পরিমার্জনাকারী

৪.১ প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও প্রশ্ন পরিমার্জনাকারীদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২ পরীক্ষকদের নিকট থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাতা পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। যথাসময়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যর্থতার জন্য শাস্তির বিধান রাখতে হবে। উত্তরপত্রের সম্মানী যুগোপযোগী করতে হবে।

৫. জাতীয় পরীক্ষা গবেষণা পরিষদ

৫.১ কেন্দ্রীয়ভাবে আদর্শ মানসম্পন্ন এবং শ্রেণী–উপযোগী প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে। এরূপ আদর্শ মানসম্পন্ন প্রশ্ন প্রণয়নের লক্ষ্যে গবেষণা ও পরীক্ষা–নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য '*জাতীয় পরীক্ষা গবেষণা পরিষদ*' নামে একটি প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে এবং এর প্রধান হবেন জাতীয় পর্যায়ের একজন চাকরিরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ বা বিশেষজ্ঞ। প্রতিষ্ঠানটি হতে হবে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত। এ প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয়ভাবে আদর্শ মানসম্পন্ন, প্রাসঙ্গিক শ্রেণী–উপযোগী মডেল প্রশ্ন প্রণয়ন করবে এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রতিষ্ঠানের খরচ বহন করবে।

৫.২ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কেন্দ্র থানা সদরের নিচের পর্যায়ে হবে না।

৬. আন্তঃবোর্ড বদলি

৬.১ ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে দেশে শিক্ষা বোর্ডের সংখ্যা আরও বাড়ানো যেতে পারে এবং বোর্ডগুলোর দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য এক বোর্ড থেকে অন্য বোর্ডে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার উত্তরপত্রের অন্তঃ ও বহিঃমূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭.১ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা থেকে ভিন্নধর্মী। সেজন্য এর মূল্যায়ন পদ্ধতিও ভিন্নতর হওয়া আবশ্যক। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় হাতে কলমে শিক্ষার যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি এর তত্ত্বীয় বিষয়ের পাঠদান প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতার একান্ত প্রয়োজন আছে। ছাত্রছাত্রী যদি কোন বিষয়ের পাঠদান প্রক্রিয়ায় কিছু ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে তাহলে পরবর্তী ক্লাসসমূহের পাঠ তার কাছে অনেকাংশে অবোধ্য থাকবে। এ কারণে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এ বিষয়টি বিবেচনা করে কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রের বর্তমান পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ পদ্ধতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানে যে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু রয়েছে তা ক্রেডিট ও কোর্স পদ্ধতির সংমিশ্রণ এবং এর সিলেবাসসমূহ ক্রেডিট পদ্ধতিতে তৈরি। ছয়মাসের একটি সেমিস্টারে ৫/৭টি বিষয়ে ২০ থেকে ২৪ ক্রেডিটের একটি কোর্স অধ্যয়ন করে সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী সেমিস্টারে পড়ার সুযোগ পেতে হয়। প্রথম থেকে চতুর্থ পর্ব পর্যন্ত দুইয়ের অধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলেও ছাত্রছাত্রীকে সেমিস্টারের সকল বিষয় পুনরায় পরীক্ষা দিতে হয়। ক্রেডিট পদ্ধতিতে এ নিয়ম সঠিক নয়। তবে পঞ্চম পর্বে (প্রথম পাবলিক পরীক্ষা) যে কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হলে ষষ্ঠ পর্বের (দ্বিতীয় পাবলিক পরীক্ষা) সঙ্গে বা পরবর্তী পঞ্চম/ষষ্ঠ পর্বে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার সুযোগ পায়।

বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থায় এবং প্রায় বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীদের পছন্দানুযায়ী ক্রেডিট আওয়ার প্রদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তবে অদূর ভবিষ্যতে পছন্দানুযায়ী ক্রেডিট আওয়ার গ্রহণ এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ–সংবলিত একটি নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবর্তন করতে হবে।

৮. গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং সেন্টার

৮.১ প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত কোন স্তরেই শিক্ষার্থীদের জন্য কোন গাইড বই, নোট বই রাখা চলবে না। প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করতে হবে।

৯. প্রশিক্ষণ

৯.১ শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের পূর্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সঠিক পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন যথাযথ শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ এবং এগুলোর যথাযথ ব্যবহার। একজন যোগ্য শিক্ষকের অবশ্যই বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। বিষয়ের ওপর অতি সাম্প্রতিক তথ্য সম্পর্কেও তাকে অবহিত হতে হবে। কারণ, ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তারই তার একমাত্র কাজ নয়, তাদের মধ্যে বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করাই তাঁর মূল দায়িত্ব। এ কারণেই শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ অবশ্যই থাকা দরকার। প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই জ্ঞানের নবায়ন ও প্রসারণ ঘটানো সম্ভব। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ হবে বহুমাত্রিক। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শিক্ষাদান পদ্ধতি ও মূল্যায়নের।

৯.২ শিক্ষক–ছাত্র অনুপাত

সাম্প্রতিক সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়—সমাজের সর্বত্র যেমন অস্থিরতা বিরাজমান, ছাত্রদের মধ্যেও এই অস্থিরতা রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিধি–বিধানের নিয়ন্ত্রণে তাদের নিয়ে আসা অথবা শ্রেণীকক্ষে তাদের মনোনিবেশ করানো আজকাল দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক–ছাত্রের অনুপাত আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। বিশাল শ্রেণীকক্ষে এ কারণে শিক্ষকদের সম্মুখে শতাধিক ছাত্রের উপস্থিতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে কি গভীর সমস্যার সৃষ্টি করে তা সহজেই অনুমেয়। এজন্যই পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে ঘটে অনিবার্য বিপর্যয়। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক–ছাত্র অনুপাত একটি যুক্তিযুক্ত সীমার মধ্যে থাকতে হবে যা প্রাথমিক স্তরের জন্য ১:৩৫ এবং মাধ্যমিক স্তরের জন্য ১:৪০ এর বেশি হবে না।

অধ্যায়—২১

ছাত্রকল্যাণ ও নির্দেশনা

১. নির্দেশনা

১.১ ভূমিকা

অনেক সময়ে বিভিন্ন কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান বহুবিধ সমস্যার আবর্তে শিক্ষার্থী বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ফলে অনেকের জীবন বিনষ্ট হয়, সেই সঙ্গে নিভে যায় অনেক অভিভাবকের আশার আলো। এর বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটি হল শিক্ষাজীবনে উপযুক্ত পথনির্দেশ ও পরামর্শদানের অভাব। তাই ছাত্রনির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি কার্যকরভাবে প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। তা করা হলে বিদ্যালয়ে পড়ালেখার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সহজতর হবে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে। ফলে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসচেতনতা বাড়বে, সে নিজকে চিনবে, জানবে এবং নিজের সার্বিক উন্নতির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। পরিণামে শিক্ষার্থী তার স্বকীয় মেধা, আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী পেশা বেছে নিয়ে সহজাত প্রবণতা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হবে। যারা আগামী প্রজন্মের অভিভাবক তারা এর ফলে উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে গণতান্ত্রিক আদর্শের সান্নিধ্য লাভ করতে সমর্থ হবে।

২. সুপারিশ

২.১ শিক্ষার্থীর সামগ্রিক কল্যাণের জন্য নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রবর্তন করতে হবে।

২.২ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত এবং অন্য যে কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি বা কার্যক্রম চালু করতে হবে।

২.৩ যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি বিদ্যমান আছে সেগুলো আরও জোরদার করতে হবে।

৩. ছাত্রকল্যাণ

শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করতে হলে শিক্ষায়তনে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যা ছাত্রছাত্রীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পক্ষে এবং তার শিক্ষাজীবনে গতিশীলতার পক্ষে সহায়ক হয়। তাই লক্ষ্য হবে ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়নে উৎসাহিত করা, অধ্যয়ন কার্যক্রমে সুষ্ঠুভাবে অংশগ্রহণের উপযোগী শারীরিক ক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করা, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা এবং পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যক্রমের যথাযথ সুযোগ সৃষ্টি করে তার বিকাশ ঘটানো।

৪. সুপারিশ

৪.১ বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার ব্যবস্থা আছে। যতদিন সম্ভব এই ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। যদি সম্ভব না হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২ মাধ্যমিক স্তরের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে হবে।

৪.৩ কর্তৃপক্ষের সাহায্য, নাগরিকদের দান এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের অনুদান নিয়ে প্রতি শিক্ষায়তনে ছাত্রকল্যাণ তহবিল গঠন করবে হবে। এ তহবিল থেকে শিক্ষায়তন কর্তৃপক্ষ অভাবগ্রস্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

৪.৪ গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪.৫ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুলে পুষ্টিকর টিফিন দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের টিফিন বাবদ বর্তমানে যেসব বিদ্যালয়ে চাঁদা দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে সেখানে এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকতে পারে। তবে যেসব বিদ্যালয়ে এ ব্যবস্থা নেই সেসব বিদ্যালয়ে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৪.৬ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যাতে পুষ্টিকর খাদ্য পেতে পারে সেজন্য ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্য ক্যাফেটরিয়া স্থাপন করতে হবে।

৪.৭ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হেলথ সার্ভিসের ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ থাকা দরকার। তাই প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা কেন্দ্র থাকতে হবে।

৪.৮ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যায়ামাগার থাকতে হবে।

৪.৯ উচ্চশিক্ষালাভের সুবিধার্থে গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.১০ ছাত্রদের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে ছাত্ররাজনীতির একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এদেশের ছাত্রসমাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতির নামে যে উচ্ছৃঙ্খলতা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য চলছে তাতে শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। ছাত্ররাজনীতি দলীয়করণের ফলে ছাত্ররা রাজনীতির নামে যে কোন ইস্যুতে জড়িত হয়ে পড়ে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থার সৃষ্টি করে। শিক্ষাক্ষেত্রের এ জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও ছাত্রদের সার্বিক কল্যাণের জন্য রাজনৈতিক দল, ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক ও অভিভাবকদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে সম্মেলনের মাধ্যমে অবিলম্বে ছাত্রদের রাজনীতিতে জড়িত থাকার বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার। এ ব্যাপারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি একটি গোল টেবিল বৈঠকও ডাকতে পারেন।

৫. ছাত্রছাত্রী ভর্তি

৫.১ বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে ভর্তির যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এই ফলাফল কিভাবে বিবেচনায় আনা হবে তা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ঠিক করবে।

৫.২ ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাসের ধারণক্ষমতার বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। কখনও ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

৫.৩ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের যে সকল শিক্ষায়তনের প্রারম্ভিক শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে কোড পদ্ধতি অবলম্বন করে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

অধ্যায়—২২

শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

১. ভূমিকা

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে, শিক্ষা ও শিক্ষকের মান উন্নয়ন এবং শিক্ষকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকতা এমন একটি পেশা যার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি প্রয়োজন। আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও উন্নত মান অর্জনের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নকল্পে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষকদের যে গুরুদায়িত্ব রয়েছে তা সুসম্পন্ন করতে হলে শিক্ষকের শুধু প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট হবে না, পাশাপাশি তাঁদের শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠদানে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সুষ্ঠু শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত গুণাবলির অধিকারী হওয়া উচিত। যোগ্য ব্যক্তিরা যাতে শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী হন তার জন্য তাঁদের কাজের নিরাপত্তা ও মানসিক সন্তুষ্টির ব্যবস্থাও করতে হবে।

২. বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন স্তরে যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে তা খুবই গতানুগতিক, যান্ত্রিক, অসম্পূর্ণ, সার্টিফিকেটসর্বস্ব এবং চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি যুগোপযোগী নয় এবং বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের অব্যাহত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণে তত্ত্বীয় বিদ্যাই প্রাধান্য বিস্তার করে আছে এবং তা মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে যাচাই করার পুরানো প্রথা বহাল রয়েছে। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ খুবই অবহেলিত হচ্ছে এবং নানা বাধা ও সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার ফলে প্রশিক্ষণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এ ব্যবহারিক শিক্ষার অংশটি প্রায় অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। এতে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এ ছাড়া প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করার পথেও রয়েছে পরিবেশগত বাধা ও উপযুক্ত সুযোগ–সুবিধার অভাব। অতএব, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার ও প্রসার যেমন প্রয়োজন তেমনি এর প্রয়োগের সুযোগসুবিধাও নিশ্চিত করা উচিত।

৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণের বর্তমান ব্যবস্থা

(১) বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য এবং শিক্ষক–প্রশিক্ষক তৈরির জন্য সারাদেশে ১০টি সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজ রয়েছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর) রয়েছে। উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মের জন্য ১০টি ট্রেনিং কলেজেই বিএড ডিগ্রি প্রদান করা হয় এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ (পুরুষ) ও রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজে এমএড ডিগ্রিও প্রদান করা হয়। টিচার্স ট্রেনিং কলেজে মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য আছে তিন সপ্তাহব্যাপী কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স এবং HSTTI–তে কলেজ শিক্ষকদের জন্য আছে ৫৬ দিনের কর্মকালীন উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্স। বর্তমানে দেশে পাঁচটি

বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া ১৯৮৫ সাল থেকে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দেশব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণের ডিগ্রি প্রদান করে আসছে।

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বর্তমানে দেশে ৫৩টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) রয়েছে। এগুলোতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আগামীতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমান শিক্ষক প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়।

৪. সুপারিশ

৪.১ শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক অথবা আঞ্চলিক ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা প্রশিক্ষণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিকশিত ও সমৃদ্ধ করার অব্যাহত প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে।

৪.২ প্রশিক্ষকদের পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে।

৪.৩ প্রশিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশে ও বিদেশে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪.৪ টিটি কলেজ ও পিটিআই-এ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ প্রচলিত এক বছর বহাল থাকবে।

৪.৫ প্রশিক্ষণহীন কর্মরত তরুণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

৪.৬ প্রশিক্ষণকালে কমপক্ষে তিনমাস ব্যবহারিক পাঠদানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যায়তনসমূহের সহযোগিতা লাভের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৭ প্রশিক্ষণে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

৪.৮ ব্যবহারিক পাঠদানের জন্য যে দুটি বিষয় নির্বাচন করতে হয় সে দুটি বিষয় ছাত্রজীবনে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষা লাভ করেছে কিনা সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৪.৯ নৈতিক, মানসিক, শারীরিক গুণসম্পন্ন, পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক তৈরির জন্য প্রশিক্ষণে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণীত হওয়া উচিত।

৪.১০ প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক মঞ্জুরি বাড়াতে হবে এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকালে সবেতনে ছুটি মঞ্জুর করতে হবে।

৪.১১ প্রশিক্ষণ হবে সার্বক্ষণিক এবং প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.১২ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, প্রতিবন্ধী, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক) বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের উপযোগী দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়বস্তুর তারতম্য থাকবে।

৪.১৩ প্রশিক্ষণ কলেজ বা ইনস্টিটিউটের সংখ্যা প্রয়োজনানুপাতে আরও বাড়াতে হবে।

৪.১৪ বেসরকারি-সরকারি নির্বিশেষে সকল কলেজের শিক্ষকের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.১৫ কর্মরত শিক্ষকদের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সঞ্জীবনী কোর্সের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। নতুন শিক্ষাক্রম ও পরিবর্তিত পাঠ্যসূচি প্রবর্তনের আগেই নিজ নিজ বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।

১৬ শিক্ষণীয় বিষয় ও পদ্ধতি যথাযথ প্রয়োগের জন্য সরকার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্য ন্যায্য ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, সর্বোচ্চ পিরিয়ডের ন্যায্য সংখ্যা নির্ধারণ ও

শিক্ষা উপকরণ সরবরাহসহ উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রশিক্ষণের জ্ঞান সঠিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য তদারকির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৫. শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব

৫.১ বর্তমানে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত শিক্ষকতা পেশার অবস্থা এতই করুণ যে, সাধারণ যোগ্যতম ব্যক্তিরা এই পেশার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করে না। শিক্ষকতা পেশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সর্বোচ্চ সুযোগ–সুবিধা পেলেও উচ্চতর প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত সমযোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের তুলনায় মর্যাদা ও সুযোগ–সুবিধার দিক থেকে নিচে পড়ে আছেন। বেতন ভাতাসহ বৈষয়িক সুযোগ–সুবিধা ও কাজের শর্তাবলির দিক থেকে সরকারি শিক্ষকরা বেসরকারি শিক্ষকদের তুলনায় উন্নততর অবস্থানে থাকলেও অন্যান্য সমযোগ্যতাসম্পন্ন সরকারি কর্মকর্তার চেয়ে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে নিম্নতর মর্যাদার স্তরে রয়ে গেছেন। বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থার কারণে বেসরকারি শিক্ষকদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। তাঁদের কাজের শর্তাবলি খুবই হতাশাব্যঞ্জক ও শিক্ষাদানের পরিবেশ অনুকূল নয়। চাকরিবিধির ত্রুটি–বিচ্যুতি ও অগণতান্ত্রিক নিয়মনীতির কারণে সাধারণভাবে সকল শিক্ষক ও বিশেষভাবে সরকারি শিক্ষকরা পেশাগত স্বাধীনতাসহ মৌলিক নাগরিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ থেকে অনেকটাই বঞ্চিত। ফলে তাঁদের সৃজনশীলতার বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। মুক্তচিন্তা, বুদ্ধির চর্চা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা তাঁদের অত্যন্ত সীমিত। আকর্ষণহীন এই পেশায় বর্তমানে যাঁরা কর্মরত আছেন পরিবেশগত কারণেই তাঁদের মান ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে।

৫.২ মাধ্যমিক স্তরের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। সরকার বেসরকারি শিক্ষকদের তাঁদের স্কেলের প্রারম্ভিক হারের ৮০% বেতন, ১০০ টাকা বাড়িভাড়া ও ১৫০ টাকা হারে মাসিক চিকিৎসা ভাতা ও একটি মাত্র ইনক্রিমেন্ট দিচ্ছে। অবশিষ্ট সুযোগ–সুবিধা স্কুল কর্তৃপক্ষের বহন করার কথা। কিন্তু কেবলমাত্র ছাত্র বেতনের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে দরিদ্র এলাকায় বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে ছাত্র বেতনের একটি বড় অংশ অনাদায়ী থাকে। এর ফলে শিক্ষকেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকর্তৃক দেয় ২০%, অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল বেতন, অন্যান্য ভাতা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, অবসরকালীন আর্থিক সুবিধা ইত্যাদি থেকে প্রায় বঞ্চিত হন।

৫.৩ শিক্ষকদের বেতন–ভাতার নিম্নমান ও বৈষয়িক অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার অভাবের কারণে তাঁরা জীবিকা নির্বাহের জন্য টিউশনি বা অন্য খণ্ডকালীন কাজ করতে বাধ্য হন। বেঁচে থাকার তাগিদে এক সময়ে টিউশনি বৃত্তি নিলেও বর্তমানে সমাজে শিক্ষকদের একাংশ অর্থ উপার্জনের নেশায় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনের চেয়ে টিউশনি, কোচিং ইত্যাদিতে অধিকতর সময় ও শ্রমশক্তি ব্যয় করছেন।

শিক্ষকরা হচ্ছেন শিক্ষা ব্যবস্থার মূল শক্তি। অতএব শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা, শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত বেতন–ভাতা ও অন্যান্য বৈষয়িক সুযোগ–সুবিধা, কাজের উন্নত শর্তাবলি, মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা, পেশাগত স্বাধীনতা, সুষ্ঠু শিক্ষক–প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব সচেতনতা ও নিষ্ঠা।

৬. সুপারিশ

৬.১ সমযোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিভিন্ন স্তরের ও ধারার শিক্ষকদের মধ্যে বিরাজিত বেতন–ভাতার বৈষম্য দূর করতে হবে এবং সরকারি প্রশাসনসহ অন্যান্য পেশায় একই অথবা সমমানের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রদত্ত বেতনের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

৬.২ বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি–বেসরকারি যে বৈষম্য রয়েছে পর্যায়ক্রমে আগামী দশ বছরের মধ্যে তা সম্পূর্ণ বিলোপ করার পরিকল্পনা নিতে হবে এবং সমযোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন বেসরকারি শিক্ষকদের সরকারি শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন–ভাতা, পেনসনসহ সব ধরনের আর্থিক সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৬.৩ শিক্ষা ও শিক্ষকদের স্বার্থে চাকরির স্থিতিশীলতা এবং কার্যকালীন নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষকদের নিরাপত্তা বীমার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.৪ সততা ও সাহসের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে, পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করতে গিয়ে যে সব শিক্ষক সন্ত্রাসী ও দুষ্কৃতকারীদের হামলায় নিহত, আহত ও লাঞ্ছিত হন তাঁদের নিরাপত্তা বিধান ও অপরাধীদের শাস্তিবিধানের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

৬.৫ শিক্ষকদের পেশাগত স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ থাকতে হবে।

৬.৬ ফলপ্রসূ শিক্ষাদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজের শর্তাবলি (যথা–শ্রেণীকক্ষের আয়তন, ছাত্র–শিক্ষক অনুপাত, শিক্ষা উপকরণ, সহায়ক স্টাফ, কাজের ঘন্টা, বিভিন্ন ধরনের ছুটি ইত্যাদি) সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত।

৬.৭ সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক একই অথবা অনুরূপ সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ভোগ করবেন।

৬.৮ গ্রামাঞ্চলে বা দূরবর্তী এলাকার শিক্ষকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বিনা ভাড়ায় অথবা সরকারি সাহায্যপুষ্ট স্বল্পভাড়ায় বাসস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত। শিক্ষকতা কাজের অতিরিক্ত সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে শিক্ষকদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

৬.৯ সরকারি খরচে বিদেশে পড়াশোনা, গবেষণা, শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলনে অংশগ্রহণ, বিদেশী বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষকদের ও শিক্ষার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬.১০ শিক্ষকদের সংগঠনের কাজকর্মে বিদেশী ও আন্তর্জাতিক সংগঠনকর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, সেমিনারে অংশগ্রহণের সুযোগ দানের জন্য পূর্ণ বেতনে অনুপস্থিতজনিত সাময়িক ছুটি মঞ্জুর করা উচিত।

৬.১১ মহিলা শিক্ষকদের চাকুরিতে নিয়োগ কোন ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে বৈষম্য রাখা চলবে না। সমযোগ্যতা সম্পন্ন মহিলাদের বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬.১২ মহিলা শিক্ষকদের বিশেষ সমস্যাগুলো বিবেচনায় রেখে আইএলও ইউনেস্কোর সুপারিশ মোতাবেক তাঁদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মাতৃমঙ্গল ছুটিসহ বিশেষ ছুটি, শিশু সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারি–বেসরকারি উদ্যোগে নার্সারি, ডে–কেয়ার সেন্টার স্থাপন প্রভৃতি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.১৩ পার্বত্য জেলার শিক্ষকদের পাহাড়ি ভাতা প্রদানের পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক।

৬.১৪ পেশাগত আচরণবিধি লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত। অভিযুক্ত শিক্ষকের আত্মপক্ষ সমর্থনের, সহকর্মী শিক্ষকদের সহযোগিতা লাভের ও ন্যায়বিচার লাভের সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৬.১৫ শিক্ষকদের পেশায় মর্যাদা অনেক পরিমাণে তাঁদের নিজেদের ওপরই নির্ভর করে— এই সত্যটি উপলব্ধি করে শিক্ষকদের উচিত তাঁদের সমস্ত পেশাগত কাজে সম্ভাব্য উচ্চতর মান অর্জনে ও আদর্শ শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণাবলি বিকাশে সচেষ্ট হওয়া।

৬.১৬ শিক্ষা ক্ষেত্রে ও সমাজে বিশেষ অবদান এবং মৌলিক রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য শিক্ষকদের সম্মানিত ও উৎসাহিত করার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৬.১৭ শিক্ষকদের সৃজনশীল ও গবেষণাধর্মী রচনা এবং উন্নতমানের প্রকাশনা তাঁদের পেশাগত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে।

৬.১৮ শিক্ষক সংগঠনগুলোর উচিত শিক্ষকদের নৈতিক বা আচরণ বিধিমালা (Code of Ethics) প্রণয়ন এবং এ নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে একটি Common Code of Ethics প্রণয়নে সকল শিক্ষক সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে সরকার উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে পারে।

অধ্যায়—২৩

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

১ ভূমিকা

১.১ শিক্ষার প্রাণবিন্দু হচ্ছে শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কাঙ্ক্ষিত চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও বাঞ্ছিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠে তাই পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় এগুলোর প্রতিফলন শিক্ষাক্রমে সুনিশ্চিত করতে হয়। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্ক্ষিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাকে এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর সোপান হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা, মাদ্‌রাসা শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি, প্রকৌশল ও চিকিৎসা শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে তাদেরকে এদেশের যথোপযুক্ত নাগরিক ও দক্ষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার যে মূল চাবিকাঠি তা হল শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক।

২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১ শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, জাতীয় দর্শন, আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা শিক্ষাক্রমে প্রতিফলন ঘটানো।

২.২ মানবিকতাবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিকতাবোধের উজ্জীবন।

২.৩ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন।

২.৪ স্বদেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ঐতিহ্যবোধ জাগ্রতকরণ।

২.৫ শ্রম ও আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ।

২.৬ জাতীয়তাবোধ, গণতন্ত্র, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আন্তর্জাতিকতাবোধের জাগরণ।

২.৭ বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তাদান।

২.৮ স্তরভিত্তিক শিখন চাহিদা নিরূপণ।

২.৯ অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ।

২.১০ শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক শিখনফল (Learing Outcome) ও প্রান্তিক যোগ্যতা (Terminal Competency) নির্ধারণ।

২.১১ স্তরভিত্তিক শিক্ষাক্রম কাঠামো ও বিষয়সমূহ নির্ধারণ।

২.১২ শ্রেণীভিত্তিক ভাববস্তু ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ।

২.১৩ শ্রেণীভিত্তিক পাঠ্যসূচি প্রণয়ন।

২.১৪ ভাববস্তু, বিষয়বস্তু ও আবশ্যকীয় শিখনক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন।

২.১৫ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

৩. শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের বর্তমান অবস্থা

৩.১ ১৯৭৪ সালে প্রণীত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের আলোকে ১৯৭৬ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি। এ কমিটি ১. প্রাথমিক, ২. নিম্ন মাধ্যমিক, ৩. মাধ্যমিক, ৪. উচ্চ মাধ্যমিক, ৫. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ৬. শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ৭. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন বিষয়ে ৭ খণ্ডে যে রিপোর্ট প্রণয়ন করে তা পর্যায়ক্রমে ১৯৭৮ সাল থেকে বাস্তবায়ন শুরু হয়। এসব রিপোর্টে প্রতিটি স্তরের জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিষয়ভিত্তিক বিস্তৃত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়। কিন্তু এ রিপোর্টসমূহের সুপারিশ প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হলেও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আংশিকভাবে বাংলা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের সুপারিশ বাস্তবায়িত হয় নি।

৩.২ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি ছিল এডহক ভিত্তিক একটি কমিটি। দেশের শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন, গবেষণা, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাস ও শিখন সামগ্রী প্রস্তুতকরণের জন্য ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র'। জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের মূল্যায়ন ও পরিমার্জনপূর্বক এ স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলোর সংস্কারসাধন ও পুনর্লিখনের কাজ করে। অতঃপর নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের পর্যালোচনাসহ তা বাস্তবায়ন করে। এছাড়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সংস্কারসাধন করে। ১৯৮৪ সালে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র' তৎকালীন বাংলাদেশ স্কুল টেকস্টবুক বোর্ডের সঙ্গে একীভূত হয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নাম ধারণ করে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মপরিধির মধ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার সকল শ্রেণী ও শাখার শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, গবেষণা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণ ন্যস্ত রয়েছে। মাদ্‌রাসা শিক্ষা এ কর্মপরিধির মধ্যে থাকলেও পৃথক বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইবতেদায়ি, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রণয়ন করছে এবং অনুমোদন দানের মাধ্যমে বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থার দ্বারা ঐসব স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ প্রকাশ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করছে।

৪. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

৪.১ দেশের প্রায় ছেচল্লিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় দেড় কোটি শিক্ষার্থীর জন্য প্রাথমিক স্তরে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী লিখিত নতুন পাঠ্যপুস্তকসমূহ ১৯৯২ থেকে পর্যায়ক্রমে শ্রেণীভিত্তিক প্রকাশিত হয়ে ১৯৯৬ সালে শেষ হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী লিখিত পাঠ্যপুস্তক শিক্ষকরা যেন ফলপ্রসূভাবে শ্রেণীতে পাঠদান করতে পারেন সেজন্য দেশব্যাপী শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কর্মসূচির আওতায় প্রায় দু লক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষা-তত্ত্বাবধায়ককে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া শ্রেণীকক্ষে সফল পাঠদানে শিক্ষকদের সহায়তা দানের জন্য শিক্ষক সংস্করণ, প্রশ্নপুস্তিকা, বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা ইত্যাদি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

৪.২ বর্তমানে সাধারণ শিক্ষায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১. বাংলা, ২. ইংরেজি ও ৩. গণিত—তিনটি বিষয় এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে ঐ তিনটি বিষয়সহ ৪. পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, ৫.পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান ও ৬.ধর্ম শিক্ষা (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্ট) বিষয়গুলো আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাদান করা হয়। তাছাড়া আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে সংগীত, চারুকলা ও শরীরচর্চা রয়েছে।

৪.৩ মাদ্রাসা শিক্ষার আওতায় ইবতেদায়ি স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রণয়ন করে এবং সে অনুযায়ী বিষয়–নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে।

৪.৪ এনজিওদের দ্বারা দেশে প্রাক–প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের বিপুলসংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দু একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান ছাড়া প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আওতার বাইরে সম্পূর্ণভাবে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিতে তৈরি পাঠ্যপুস্তক ঐসব বিদ্যালয়ে অনুসরণ করছে। ১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক এক পর্যবেক্ষণ জরিপে দেখা গেছে কোন কোন কিন্ডারগার্টেনে যেমন অতিরিক্ত মাত্রায় ইংরেজির ওপর জোর দেওয়া হয় তেমনি আবার কোন কোন কিন্ডারগার্টেনে আরবি ও ইসলাম শিক্ষার ওপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়। মোটকথা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে বর্তমানে দেশে চলছে চতুর্মাত্রিক ধারা।

৪.৫ দেশের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হচ্ছে অসামঞ্জস্য ও অসংগতি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ও নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক যেমন কোন কোন বিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে, আবার উচ্চবিত্তদের জন্য প্রতিষ্ঠিত কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে প্রাথমিক স্তরে যেসব বিদেশী বই পড়ানো হচ্ছে তাতে আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থী বিষয়ও শিক্ষাদান করা হচ্ছে। তাই বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাধারায় অভিন্ন শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক যে অনুসৃত হচ্ছে না তা স্পষ্ট।

৫. নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

৫.১ নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে যুগোপযোগী, মূল্যবোধসম্পন্ন ও আত্মকর্মসংস্থানে উজ্জীবিত করা ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে ব্যাপকভাবে এ স্তরসমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পরিমার্জন ও নবায়নের কাজ সূচিত হয়। এ কাজে প্রথমে এই তিন স্তরের শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা নিরূপণ করা হয়। অতঃপর দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শ্রেণীশিক্ষক, বিষয়–বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক–প্রশিক্ষক ও শিক্ষাক্রম–বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে ৫১টি বিষয় কমিটি গঠন করে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিমার্জন ও নবায়ন করা হয়।

৫.২ পরিমার্জিত ও নবায়নকৃত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদনা ও মুদ্রণ করে ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ ও নবম–দশম শ্রেণীতে এবং ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষে ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে প্রবর্তন করা হয়। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা — এই তিন উপব্যবস্থার মধ্যে যে ছেদ (Gap) ছিল তা নিরসন করা এবং তিনটি ধারার মধ্যে গমনাগমনের (Mobility) পথকে উন্মুক্ত ও সহজতর করা। কারণ, দেশে বর্তমানে এ তিন ধারার মধ্যে যোগসূত্র ও সমন্বয় না থাকায় শিক্ষার্থীর শিক্ষার ক্ষেত্র যেমন সীমিত হয়ে পড়ে, তেমনি চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। ফলে ইচ্ছা অনুযায়ী আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ শিক্ষার্থী নিতে পারে না। আর এজন্য সৃষ্ট বেকার সমস্যা জাতীয় অগ্রগতিকে মন্থর করে দেয়। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর অভিপ্রায়ে উল্লিখিত তিন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র ও সমন্বয় স্থাপন করে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ বর্ধিত করার জন্য শিক্ষা–কাঠামোরও পরিমার্জন করা হয়।

৫.৩ পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে বর্তমানে মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যাতে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করতে পারে সে উদ্দেশ্যে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইংরেজিতে অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজ এগিয়ে চলছে।

৫.৪ নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম শ্রেণীকক্ষে সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৭টি বিষয়ে দেশের প্রায় দেড় লক্ষ মাধ্যমিক শিক্ষককে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শ্রেণীকক্ষে সফল পাঠদানের সহায়তাকল্পে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন শেষে মুদ্রণের কাজও এগিয়ে চলছে। বস্তুতপক্ষে যে কোন শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের পূর্বে যথার্থ প্রশিক্ষিত শিক্ষক তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ। আমাদের দেশে প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী ব্যাপকভিত্তিক নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের যে বিপুল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৫.৫ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের দিকনির্দেশনা প্রদান, নীতিমালা নির্ধারণ, পাঠ্যপুস্তকের রচনা ও প্রকাশনা এবং বেসরকারিকরণ বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসক সমন্বয়ে সরকার একটি জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি গঠন করেছেন।

৬. উচ্চ শিক্ষা

সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত উচ্চ শিক্ষার যাবতীয় বিষয়, প্রকৌশল শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রণয়ন করছে।

সুপারিশ

৭. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন

৭.১ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে এক ও অভিন্ন।

৭.২ প্রাথমিক স্তরের এ শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক ও আবশ্যকীয় শিখনক্রমের (Essential Learning Continum) ভিত্তিতে রচিত হবে।

৭.৩ প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য, শ্রেণীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে প্রতিফলিত হতে হবে।

৭.৪ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয়, সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে।

৭.৫ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মাতৃভাষা, আপন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটবে।

৭.৬ আত্মকর্মসংস্থান ও শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থী যেন আগ্রহী হয় তার প্রতিফলন ঘটবে।

৭.৭ জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন এবং দৃষ্টিভঙ্গীর যেন ইতিবাচক পরিবর্তন হয় তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮. পাঠ্যপুস্তক

৮.১ ভূমিকা

আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে শিখন–সামগ্রীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই, পাঠসহায়ক সামগ্রীরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে সেখানে পাঠ্যপুস্তকই একমাত্র ও প্রধান শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া, যেহেতু শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রতিফলন ঘটে পাঠ্যপুস্তকে, তাই পাঠ্যপুস্তক অবলম্বন করেই শিক্ষা প্রক্রিয়া চলে। এদিক থেকেও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

৮.২ বর্তমান অবস্থা

আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক এবং আংশিকভাবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওপর ন্যস্ত। বোর্ড প্রাথমিক স্তরের আবশ্যিক ৯টি বিষয়ের প্রায় ৬ কোটি বই প্রতিবছর মুদ্রণ করে। এ বইগুলো দু ধরনের। যেগুলো সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীন বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সেগুলো সাদা অফসেট কাগজে মুদ্রিত এবং যেগুলো মূল্যের বই সেগুলো বুক প্রিন্ট/নিউজ প্রিন্ট কাগজে মুদ্রিত। পাঠ্যবই ছাড়াও বোর্ড পাঠসহায়ক শিক্ষক–নির্দেশিকা, প্রশ্ন–পুস্তিকা, বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রণয়ন করে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিনামূল্যে সহায়ক পাঠ্যবইগুলো প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সরবরাহ করে থাকে।

৮.২.১ নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৭০টি বিষয়ের পাঠ্যবই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করে থাকে। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক

স্তরের সমুদয় বই স্বল্পমূল্যে করার লক্ষ্যে নিউজ প্রিন্ট/বুক প্রিন্ট কাগজে মুদ্রণ করা হয়। কেউ কেউ মনে করেন, যারা অধিকমূল্যে উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ে আগ্রহী তাদের জন্য সীমিত সংখ্যক সাদা কাগজের বই মুদ্রণ করা যায়।

৮.২.২ উচ্চ শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কিছু বই বাংলা একাডেমী, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করে। তবে তা খুবই অপর্যাপ্ত।

সুপারিশ

১. প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠ সহায়ক সামগ্রীর মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যাপারে বর্তমানে অনুসৃত নীতিমালা অব্যাহত থাকতে পারে।

২. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের জন্য শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ, প্রকাশ ও বাজারজাতকরণের বর্তমান অনুসৃত নীতি অব্যাহত থাকতে পারে।

৩. আগ্রহী ও সমর্থ অভিভাবকরা যেন খোলাবাজারে ক্রয় করতে পারেন সেজন্য সাদা কাগজে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এজন্য সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন।

৪. দেশের ধনী–দরিদ্র–নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিশেষত শহরাঞ্চলের সচ্ছল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ন্যূনতম মূল্যে বই প্রাপ্তির ব্যবস্থা বিবেচনা করা যায়।

৫. প্রাথমিক স্তরে এক জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিবছর একটি করে বই একবার মাত্র ব্যবহার করার নীতিমালা আমাদের মতো দরিদ্র দেশের জন্য বিরাট অপচয়। তাই এ স্তরের বই কিভাবে একাধিক শিক্ষাবর্ষে ব্যবহার করা যায় সেজন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তককে আকর্ষণীয়, নির্ভুল ও সুন্দরভাবে মুদ্রণের প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং এ লক্ষ্যে সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন।

৭. নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সীমিত সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক আগ্রহী ও সমর্থ ক্রেতাদের জন্য সাদা কাগজে মুদ্রণ করা যায়। এ জন্যও সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন।

৮. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন ও মুদ্রণের গুণগতমান ও ধারাবাহিক ক্রমোন্নয়ন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য একটি 'পাঠ্যপুস্তক আর্কাইভ' প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এই আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা যায়।

৯. কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পাঠ্যপুস্তক ছাড়া শিক্ষাক্রম, পাঠ পরিকল্পনা, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সম্পাদনা এবং সৃজনশীল পরিপূরক পাঠ–সহায়ক বই প্রকাশ করতে পারে।

১০. প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহের গ্রন্থস্বত্ব ও মালিকানা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডেরই থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যবইয়ের মালিকানা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বোর্ডের থাকবে এবং প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকে রচিত অন্যান্য বই বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে খোলা বাজারে মুদ্রণ ও প্রকাশনার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

১১. বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের লেখকদের এককালীন সম্মানী ও নির্ধারিত হারে রয়ালটি প্রদান করা হবে।

১২. প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য প্রতি বিষয়ের একটি বই প্রচলনের নীতিমালা অব্যাহত থাকতে পারে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের জন্য বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মানসম্মত একাধিক বই প্রচলিত থাকবে।

১৩. নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য বর্তমানে প্রচলিত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সহপাঠ, ব্যাকরণ, রচনা ইত্যাদি বই অনুমোদনের অনুসৃত নীতিমালা অব্যাহত থাকতে পারে।

১৪. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনায় নিয়োজিত অথবা এসব কাজে উৎসাহী ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য অন্যান্য দেশে প্রচলিত ও ব্যবহৃত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, প্রয়োজনীয় অনূদিত পুস্তক, পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত প্রবন্ধ সংবলিত সাময়িকী ও পত্রিকা, শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ, অভিধান ও বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা সংক্রান্ত পুস্তক দ্বারা 'পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার' স্থাপন করা যেতে পারে।

১৫. সরকারি অর্থানুকূল্যে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং উন্নতমানের সৃষ্টিশীল ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

১৬. পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, পরিমার্জন ও সংস্কার সাধনের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হবে।

১৭. দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে নোটবই ও গাইড বই কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে এবং শিক্ষার্থীরা যেভাবে এসব বইয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বপ্রকার নোটবই ও গাইড বই নিষিদ্ধ করতে হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে এবং পাঠ্যপুস্তকে অনুশীলনী, টীকা, নমুনা প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি এমনভাবে বিন্যস্ত ও সমৃদ্ধ করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা নোটবই-নির্ভর না হয়। এ বিষয়ে শ্রেণী শিক্ষকদের ও অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে।

১৮. উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের পর্যাপ্ততা নেই। বিশেষত প্রকৌশল, চিকিৎসা, কারিগরি, বিজ্ঞান ও মানবিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে। এ জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল, এশিয়া ফাউন্ডেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় Book Loan Exchange প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পৃথিবীতে অনেক দেশে আজকাল Intellectual Property Exchange চালু হয়েছে। আমাদের দেশেও এ ব্যবস্থা চালু হতে পারে।

১৯. উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের বাংলা বইয়ের জন্য একমাত্র বাংলা একাডেমীর ওপর নির্ভর না করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সহায়তায় বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা যায়।

৯. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নীতিমালা

৯.১. বর্তমান অবস্থা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড দু রকম পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে থাকে :

১. উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, এবং

২ শিক্ষাবিদ, শ্রেণী-শিক্ষক, বিষয়-বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম-বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক-প্রশিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত ও নিয়োগকৃত কমিটির মাধ্যমে।

প্রাথমিক স্তরের বইগুলো দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রণীত হয়। নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বই প্রথম পদ্ধতিতে প্রণীত ও নির্বাচিত হওয়ার পর বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সম্পাদনার পর চূড়ান্ত করা হয়ে থাকে।

ভাষা ও বানান-নীতি, শব্দভাণ্ডার ও বাক্য কাঠামো

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টের সুপারিশের আলোকে ১৯৭৮ সাল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সমুদয় পাঠ্যপুস্তকে প্রমিত চলিত বাংলা ভাষা রীতি অনুসৃত হচ্ছে। তবে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও সহপাঠ বইগুলোতে বাংলা সাধুভাষার আদর্শ নমুনা হিসেবে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু রচনা সাধুভাষা রীতির লেখা অন্তর্ভুক্ত করার নীতি অনুসৃত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন সহজ করার লক্ষ্যে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বাংলা ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তকে একই শব্দের একই বানান সর্বত্র লেখার যে নীতিমালা পাঠ্যপুস্তকে যেমন অনুসৃত হচ্ছে তেমনি ঐ রিপোর্টের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের বানানে

যুক্তবর্ণের স্পষ্টীকরণের নীতিমালাও অনুসরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড শিশুদের শব্দজ্ঞান ও বাক্য কাঠামো সম্পর্কিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিক স্তরের শ্রেণীভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ও বাক্য কাঠামো শ্রেণী উপযোগী করেছে।

সুপারিশ

১. বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের যে নির্দেশনা বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে রয়েছে তা অনুসরণ করা যায়।

২. পাঠ্যপুস্তককে আকর্ষণীয়, সহজবোধ্য ও সৃজনশীল করার লক্ষ্যে মাতৃভাষা বাংলা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে বাংলায় লিখিত পাঠ্যপুস্তকের সম্পাদনার সঙ্গে এক জন বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞের সম্পৃক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটিরও এরূপ সুপারিশ ছিল।

৩. প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নকালে সৃজনশীল দক্ষ ইলাস্ট্রেটরকেও পাঠ্যবই প্রণয়নের প্যানেল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এতে বইয়ের ভাব ও সৌকর্যের সমৃদ্ধি ঘটবে।

৪. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার নীতিমালা নির্দেশ করা হয়েছে, সে অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

৫. পাঠ্যপুস্তকের অব্যাহত মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা দরকার এবং অনুরূপ মূল্যায়নের আলোকে প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তক যাতে সংস্কার করা যায়, সে সুযোগ রাখা দরকার।

৬. বাংলা পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল ইংরেজি শব্দটিও ব্র্যাকেটে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

১০.০ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

১০.১ প্রাথমিক স্তর থেকে প্রাক–বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষাধারার এক বিশাল শিক্ষার্থী গোষ্ঠীর শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওপর অর্পিত। এটি একটি সেবামূলক, আর্থিকভাবে আত্মনির্ভর ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

সুপারিশ

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থায়ী লোকবল দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে।

২. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষা গবেষণা ও মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ বিষয়ে অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রশিক্ষণ দেশে ও দেশের বাইরে হতে পারে।

৩. পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, মুদ্রণ, প্রকাশনা ও সম্পাদনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. পাঠ্যপুস্তক–সম্পাদনা শাখাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।

৫. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণের মধ্য থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করা যেতে পারে।

অধ্যায়—২৪

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

১. প্রাথমিক শিক্ষা

১.১ ভূমিকা

১.১.১ সমন্বিত ও সুসংগঠিত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। অতীতে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের আলোকে ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে বিশাল প্রশাসনিক কাঠামো।

১.১.২ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচিত হত। পরবর্তীকালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অগ্রাধিকার পাওয়ায় প্রথমে স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বিভাগীয় উপপরিচালক দপ্তর, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়, থানা শিক্ষা কার্যালয় এবং থানা অভ্যন্তরে ক্লাস্টার পর্যায়ে কর্মকর্তা পদ সৃষ্টিসহ জনবল নিয়োগ করা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিশাল ব্যবস্থাপনার কথা বিবেচনা করে একজন সচিবের নেতৃত্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে একজন পূর্ণ মন্ত্রী এবং একজন উপমন্ত্রী এ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ মূলত নীতিনির্ধারণ, অর্থায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় সামগ্রিক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে। সরকার ১৯৮৩ সালে জারিকৃত এক আদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় নীতি, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ, নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর পদমঞ্জুরি ও পদসৃষ্টি, বেতনভাতা, অবসর গ্রহণ, পেনসন, গ্রাচুইটি, শিক্ষকদের আন্তঃথানা বদলি ইত্যাদি সরকারের দায়িত্বরূপে চিহ্নিত করে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কিছু বিষয়াদি উপজেলা পরিষদের ওপর ন্যস্ত করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান, বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন, প্রাথমিক বিদ্যালয় সংরক্ষণ, প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা, শিক্ষকদের কার্যাবলি দেখাশোনা করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং রেজিস্ট্রেশনের বিষয়গুলোকে স্থানীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। থানা শিক্ষা কমিটি ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। তবুও অনস্বীকার্য যে সময়ের ব্যবধানে ঘোষিত নীতিমালার অনেকটাই বাস্তবায়িত হয় নি। যেমন : শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে পুনর্বিন্যাস করা আবশ্যক।

১.২ সুপারিশ

১.২.১ পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে আট বছরে উন্নীত করা প্রয়োজন।

১.২.২ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে বর্তমান ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। প্রশাসন ও তত্ত্বাবধানসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাবতীয় বিষয় স্থানীয় পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিকট অর্পণ করা যায়।

১.২.৩ কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে নীতিনির্ধারণ ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থাৎ উচ্চতর পর্যায়ের বিষয় হিসেবে থাকতে পারে।

১.২.৪ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে মহিলাদের আরও অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

১.২.৫ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ একটি স্বতন্ত্র কমিশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। সরকারি বেসরকারি সকল ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য অভিন্ন নিয়োগবিধি প্রবর্তন করা যায়। যে কোন উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ বিধিমালা পুরোপুরিভাবে প্রযোজ্য হতে পারে।

১.২.৬ প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা, সমীক্ষা, এ্যাকশন রিসার্চ, পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসহ যাবতীয় তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের বিষয়টি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি পরিচালনা করতে পারে। এই লক্ষ্যে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিকে শক্তিশালী করা এবং বিভাগীয় শাখা স্থাপনের মাধ্যমে এই কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ ও বিকেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে।

১.২.৭ স্বতন্ত্র একটি প্রাথমিক শিক্ষা সাব–ক্যাডার প্রবর্তন করতে হবে।

১.২.৮ প্রাত্যহিক পাঠদান, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি, বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ, ছোটখাট মেরামত এবং বিদ্যালয় আকর্ষণীয়করণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে প্রদান করতে হবে।

১.২.৯ বর্তমানে শিক্ষকদের থানার বাইরে বদলির নিয়ম না থাকায় প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। প্রয়োজনে শিক্ষকদের আন্তঃ থানা বদলির নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

১.২.১০ উচ্চ বিদ্যালয়ের নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে সে জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে।

১.২.১১ বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রমের উন্নয়নের ব্যাপারে প্রধান শিক্ষককে বিশেষ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের আওতায় এনে দায়বদ্ধ করতে হবে। ৫০% উচ্চতর যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

১.২.১২ প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের প্রাত্যহিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে অন্যান্য শিক্ষকদের বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন। এ প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের ভাল কাজের জন্য পুরস্কার, পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা এবং মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার, শাস্তি এবং অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে।

১.২.১৩ ক্লাস্টার পর্যায়ে একাডেমিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারদের মাধ্যমে সাব–ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট, কম্যুনিটি, পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে এ ব্যবস্থার প্রচলন করা একান্ত জরুরি।

১.৩. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

১.৩.১ প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রথম–পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রচলন করা হয়েছে। সুতরাং শ্রেণীভিত্তিক এবং পাঁচ বৎসর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা শেষে আবশ্যকীয় শিখনযোগ্যতা শিক্ষার্থীগণ অর্জন করছে কিনা তা যাচাই করাকেই মূল্যায়ন বলা যেতে পারে। সুতরাং বর্তমানে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দু ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয়–পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ধারাবাহিক মুল্যায়ন ও সনাতন পরীক্ষা পদ্ধতির মিশ্র পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে কোন কোন থানায় বার্ষিক পরীক্ষা পরিচালিত হয়ে থাকে। এ ধরনের পরীক্ষা সরকারিভাবে নেওয়া হয় না। থানা প্রশাসন ও শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে এ পরীক্ষা নেওয়া হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে এক ধরনের অসামঞ্জস্য, অসমতা, বিশৃঙ্খলা বিরাজমান রয়েছে। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি শ্রেণীকক্ষে শিশুদের আয়ত্তকরণে শিশুদের অংশগ্রহণমূলক পাঠদান এবং ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি (CPA) পরস্পর নির্ভরশীল।

সুতরাং সনাতন মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে কোনক্রমেই একটি শিশুর মেধা, যোগ্যতা অর্জন মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে ধারবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এমন পরিস্থিতি এখনও নিশ্চিত করা যায় নি।

১.৪ **সুপারিশ**

১.৪.১ প্রথম–দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ধারবাহিক মূল্যায়ন অনুসৃত হবে।

১.৪.২ তৃতীয়–অষ্টম শ্রেণী শিক্ষার্থীদের জন্য ধারবাহিক মূল্যায়ন প্রচলনসহ সাময়িক ও বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

১.৪.৩ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা, পরীক্ষা পরিচালনা ও ফলপ্রকাশ ইত্যাদি কাজগুলো সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণ করবেন।

১.৪.৪ জাতীয় পর্যায়ে বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনার কার্যক্রম পূর্ববৎ বিভাগীয় উপপরিচালকগণ পরিচালনা করবেন।

২. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

২.১ ভূমিকা

দেশের শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের ওপর। আমাদের বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। তাই সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান প্রশাসনিক পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস অত্যন্ত জরুরি।

শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিক্ষানীতিমালা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব মূলত শিক্ষা অধিদপ্তরের। অধিদপ্তরের আওতাধীন আটটি অঞ্চল ও ৬৪টি জেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আঞ্চলিক ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার প্রতিষ্ঠানের ওপর নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সীমিত। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর এ সকল অফিসের কর্তৃত্ব থাকলেও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এ সকল প্রতিষ্ঠানের তেমন কোন প্রশাসনিক ভূমিকা নেই।

দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে। নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প, প্রমোট ফিমেল টিচার্স এডুকেশন প্রকল্প ইত্যাদি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করছে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ওপর। দেশে বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে কাজের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরে একই কাজের পুনরাবৃত্তিসহ একাধিক সংস্থায় একই কাজের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। দ্বৈত ও দ্বিমুখী ব্যবস্থাপনার ফলে কালক্ষেপসহ প্রশাসনে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান প্রশাসনিক পদ্ধতির সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস করা অত্যন্ত জরুরি।

২.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অসুবিধা ও ক্রটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করা ;

খ. চিহ্নিত ক্রটি বিচ্যুতি দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা ;

গ. আধুনিক, যুগোপযোগী, বাস্তবমুখী শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা।

২.৩ শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার সমস্যা

২.৩.১ প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার একটি প্রধান ত্রুটি। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিম্নলিখিত দপ্তর ও অধিদপ্তর এবং স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থা রয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সংগঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

দপ্তর ও অধিদপ্তর	স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থা
⇒ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর	⇒ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন
⇒ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	⇒ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
⇒ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী	⇒ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
⇒ শিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যুরো	⇒ বাংলাদেশ প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট
⇒ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর	⇒ শিক্ষা বোর্ডসমূহ
⇒ ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট	⇒ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
⇒ বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশন	⇒ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

২.৩.২ শিক্ষা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক অফিস ও জেলা শিক্ষা অফিসের জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়ে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন সম্ভব নয়। শিক্ষায় ব্যাপক সংস্কার ও সম্প্রসারণের যে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এই সীমিত জনবল দিয়ে তা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার জন্ম দিচ্ছে। জনগণের ভোগান্তি বাড়ছে এবং ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব শিক্ষা অধিদপ্তরের ওপর বর্তাচ্ছে।

২.৩.৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, বিভিন্ন দপ্তর, শিক্ষা বোর্ডসহ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মধ্যে কাজের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য প্রচলিত পরিদর্শন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। এই পরিদর্শন নানা পর্যায়ে এবং নানামুখী হয়ে থাকে। যেমন আঞ্চলিক ও জেলা শিক্ষা অফিসসমূহ নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তর, বোর্ডসমূহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, মাদ্রাসা বোর্ড মাদ্রাসা শিক্ষা (দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল) এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানসমূহ একাডেমিক স্বীকৃতির জন্য পরিদর্শন করে থাকে। এছাড়া পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর প্রশাসনিক পরিদর্শন করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার পরিপন্থী।

২.৩.৪ শিক্ষানীতি নির্ধারণে এবং শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত নন এমন ব্যক্তিবর্গের প্রাধান্য বেশি এবং তুলনামূলকভাবে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের মতের অপ্রাধান্য বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি। অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের গুরুত্ব না থাকার কারণে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে এবং নীতি নির্ধারণে যুক্তিসংগত পদক্ষেপের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২.৩.৫ কোন প্রকার স্কুল ম্যাপিং কার্যক্রম না থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ কারণে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে—যা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে এবং শিক্ষার ওপর অহেতুক চাপ বাড়ছে। যত্রতত্র বিদ্যালয় গড়ে ওঠায় শিক্ষার গুণগত মান ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি।

২.৩.৬ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় নানাবিধ বিধিবিধান রয়েছে। ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত এক একটি সংস্থা এক এক ভাবে পরিচালিত বলে এদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে যা সুষ্ঠু প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

২.৩.৭ দেশের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। বোর্ডগুলো কর্মচারীদের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় স্বাভাবিক কার্য বিঘ্নিত হচ্ছে। তাছাড়া এরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি, নবায়ন বাতিল, ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি গঠন/বাতিল এসব কাজেই ব্যস্ত থাকে।

২.৩.৮ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে তেমন কোন কর্তৃপক্ষ নেই। একটি চাকরিবিধি ও নীতিমালার আলোকে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান কমিটির মাধ্যমে তাদের ইচ্ছেমাফিক প্রয়োজনীয় শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করে। নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা লক্ষ করা যায় এবং এ নিয়ে প্রচুর মামলা মোকদ্দমা হয়ে থাকে. যা প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি করে। এছাড়া শিক্ষকদের পদোন্নতির কোন ব্যবস্থা নেই।

২.৩.৯ সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের নিমিত্তে শিক্ষক রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি না থাকায় উপযুক্ত মেধা ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

২.৩.১০ সরকারি বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় বৈষম্য বিরাজ করছে। বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্‌রাসার শিক্ষক সরকার কর্তৃক অনুদান পেয়ে থাকলেও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত পেনশন, গ্রাচুইটি ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা পান না। তাছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছাত্র বেতনের ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এ অবস্থার নিরসন হওয়া প্রয়োজন।

২.৩.১১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের কোন সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকায় জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতা, গ্রেডেশন তালিকায় তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্তি, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতা ও মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হচ্ছে। সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার স্বার্থে এ অব্যবস্থার নিরসন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২.৩.১২ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র শিক্ষক অনুপাতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ না থাকায় অধিদপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, জেলা শিক্ষা অফিসসহ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়াও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির কোন ব্যবস্থা না থাকায় তারা দীর্ঘ দিন একই পদে কর্মরত আছে। ফলে তাদের মধ্যে হতাশা ও কাজের প্রতি অনীহার মনোভাব বিরাজ করছে। সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার স্বার্থে এর অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২.৩.১৩ কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা যায় না। কারণ বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতি প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে একই সঙ্গে চাকরিতে যোগদান করে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষকগণ উক্ত বিষয়ে পদ শূন্য থাকার কারণে তাড়াতাড়ি পদোন্নতি পেয়ে যাচ্ছেন। পক্ষান্তরে কিছু কিছু বিষয়ের শিক্ষকগণ পদোন্নতি পাওয়ার জন্য সবদিকে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বিষয়ে পদ শূন্য না থাকায় সঠিক সময়ে পদোন্নতি পাচ্ছেন না। ফলে তিনি জুনিয়র হয়ে থাকছেন। এতে সুষ্ঠু প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

২.৩.১৪ অধিদপ্তরে স্বতন্ত্র পরিদর্শন পরিবীক্ষণ সেল না থাকায় সুষ্ঠু প্রশাসন কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। এছাড়া অধিদপ্তরের EMIS সেল সঠিকভাবে কার্যকর না হওয়ায় প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রদানে বিলম্ব ঘটছে।

২.৩.১৫ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা নানাভাবে বিভক্ত। সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত আধাস্বায়ত্তশাসিত কর্তৃত্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মালিকানাধীন বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন — কিন্ডারগার্টেন, ইংরেজি মাধ্যম ও–লেভেল এবং এ–লেভেল শিক্ষা, প্রি–ক্যাডেট, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি যাদের ওপর সরকারের তেমন কোন কর্তৃত্ব নেই।

২.৪ সুপারিশ

উপরিউক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান প্রশাসনিক পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার প্রধান প্রধান ত্রুটি দূরীকরণার্থে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন :

২৪.১ শিক্ষা প্রশাসনে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে বিভাগীয়, জেলা ও থানা পর্যায় পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। বর্তমানে দেশে আটটি শিক্ষা উপবিভাগ বা অঞ্চল রয়েছে। এই অঞ্চলসমূহের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে আঞ্চলিক উপপরিচালক রয়েছে এবং তাঁর কর্তৃত্ব শুধু মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। আটটি আঞ্চলিক অফিসে উপপরিচালকের পরিবর্তে পরিচালকের পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রতিটি আঞ্চলিক অফিসে নিম্নরূপ পদ সৃষ্টি করতে হবে।

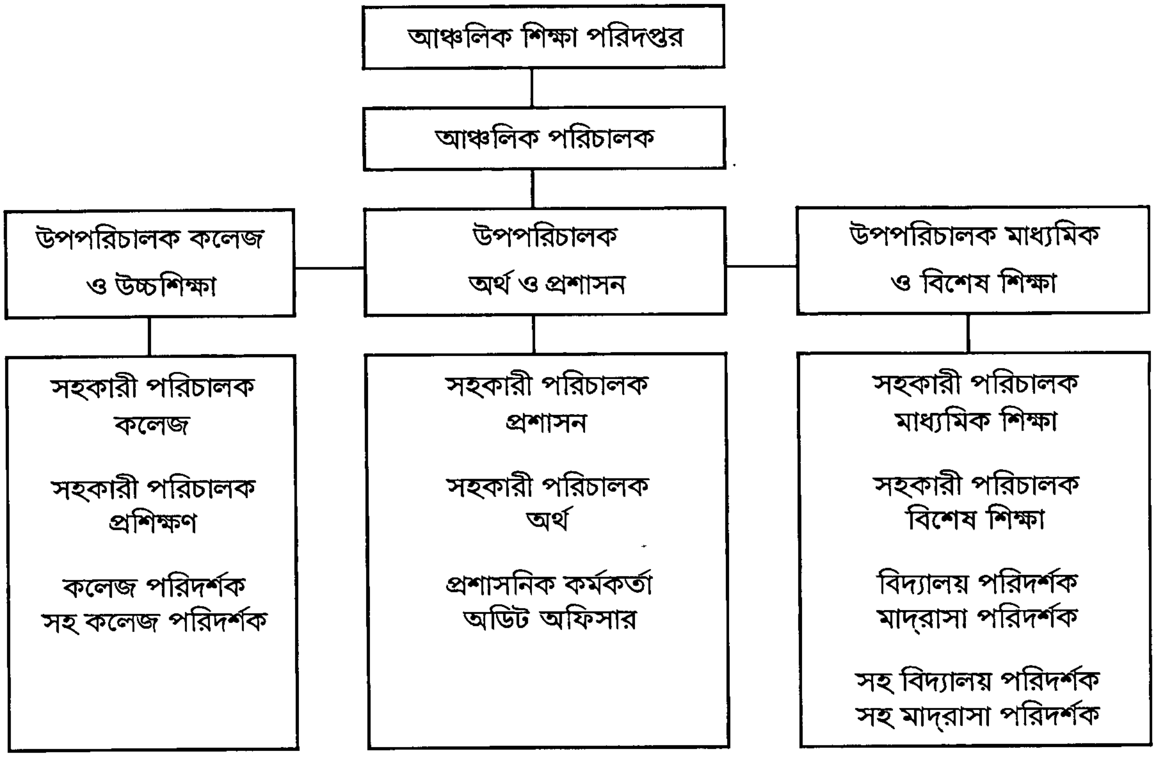

আঞ্চলিক পরিদপ্তরসমূহের তত্ত্বাবধানে স্ব স্ব অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা এবং মাদ্‌রাসা শিক্ষার দায়িত্ব থাকবে। আঞ্চলিক পরিদপ্তরে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি দান, স্বীকৃতি নবায়ন, স্বীকৃতি বাতিল, ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এমপিও ভুক্তিকরণ এবং বেতন ভাতার সরকারি অংশের অর্থ বিলি বণ্টন করা, নিজ নিজ এলাকার মধ্যে সরকারি স্কুল ও কলেজসমূহের শিক্ষক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলীকরণ,পেনশন, গ্রাচুইটি, নথি প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি জাতীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবে। দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থার বিকল্প নেই। জেলা শিক্ষা অফিসার পদটি জেলার অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে উপপরিচালক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যানুসারে বিদ্যালয় পরিদর্শক/পরিদর্শিকার পদ সৃষ্টি করতে হবে, যেন প্রতিটি বিদ্যালয় তিন মাসে অন্তত একবার পরিদর্শন করা সম্ভব হয়। বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ তত্ত্বাবধানের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ও প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও পালন করবেন। জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ তাঁদের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়সমূহের ত্রুটি বিচ্যুতি পর্যালোচনার জন্য প্রতিমাসে একবার আঞ্চলিক পরিচালকের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং বিদ্যালয়ের ত্রুটি দূরীকরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ (সাধারণ মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্‌রাসা ও বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান) তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনার জন্য থানা পর্যায়ে কোন প্রকার ব্যবস্থা নেই। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখাশোনার জন্য থানা পর্যায়ে একটি সহকারী পরিচালক ও একটি বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে। এভাবে শিক্ষা তত্ত্বাবধান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা বর্তমানের রাজধানী থেকে বিকেন্দ্রীকরণ করে থানা পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে।

২৪.২ শিক্ষা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক অফিস ও জেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। বর্তমানে দেশে ২৪৯টি সরকারি কলেজ, ১০টি টিটি কলেজ, ১৬টি গভঃ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট, ৩টি সরকারি মাদ্‌রাসা, ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং প্রায় ২১ হাজার বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা রয়েছে। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ শিক্ষক ও কর্মকর্তা কর্মচারী কর্মরত আছেন। এছাড়া দেশের শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ও বেতন ভাতা খাতে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হয়। এর পুরো কার্যক্রমই মুখ্যত অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। মহাপরিচালক স্বয়ং আয়ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে বেসরকারি শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। এ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যবস্থাপনা, বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব সংরক্ষণের জন্য কোন জনবল নেই। ফলে অর্থ ও প্রশাসনকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অর্থ ও প্রশাসনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার।

বর্তমান জনবল কাঠামোর আওতায় অধিদপ্তর একজন মহাপরিচালক, চার জন পরিচালক, আট জন উপপরিচালক, ১২ জন সহকারী পরিচালক, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীসহ ২২৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী দিয়ে সারা বাংলাদেশে সকল সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও শিক্ষার বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চাহিদার তুলনায় এ জনবল অত্যন্ত অপ্রতুল। এই সীমিত জনবল নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সুষ্ঠু প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কাঠামোগত পরিবর্তন করে এর জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শিক্ষার বর্তমান কর্মপরিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজাতে হবে। বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র অধিদপ্তর গঠন করা যেতে পারে।

দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে তেমন কোন সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা পরিদপ্তর একই কাজের পুনরাবৃত্তিসহ একাধিক সংস্থায় একই কাজের পুনরাবৃত্তি দ্বৈত ও দ্বিমুখী ব্যবস্থাপনার ফলে কালক্ষেপসহ প্রশাসনে স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দায়বদ্ধতা শিথিল হচ্ছে এবং জবাবদিহিতা লোপ পাচ্ছে।

২৪.৩ শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল স্তরের জবাবদিহিতা ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে প্রভাব মুক্ত রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থায়ী কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এই কমিটিকে তিনটি স্তরে বিভাজন করতে হবে :

ক. পরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারণ।

খ. বাস্তবায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গ. স্টিয়ারিং কমিটির চাহিদার নিরিখে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকরণ ও সুপারিশ প্রদান।

শিক্ষার নিশ্চিতায়ন করে অর্থ বিনিয়োগের অপচয় রোধ করে প্রত্যেক বছর এর বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত সংস্কার সাধন করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরকর্তৃক সমন্বয়ের জন্য ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে প্রশাসনিক বিভাগ কিংবা শিক্ষা বিভাগ গঠন করে স্বতন্ত্র বিভাগীয়, আঞ্চলিক ও জেলা প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা যেতে পারে। উপযুক্ত কর্তৃত্বের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষমতা বিভাগীয় পরিদপ্তরসমূহে প্রদান করা যেতে পারে।

পরিদর্শন ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো একটি সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় এনে এক ধারার প্রশাসনিক ও একাডেমিক পরিদর্শন কাঠামো গঠন করে আঞ্চলিক, জেলা ও থানা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা দরকার। এ কাজে সহায়তা দানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের বর্তমান EMIS কম্পিউটার সেলকে সম্প্রসারণ করে আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে নিরীক্ষা ও পরীক্ষণ কাজ সহজতর করা যেতে পারে। এছাড়া স্কুল, কলেজ ও মাদ্‌রাসার শিক্ষা কার্যক্রম ও পরিবীক্ষণ কাজে সহায়তাদানের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

২৪.৪ শিক্ষার সঙ্গে জড়িত (স্কুল ও কলেজে) শিক্ষাবিদদের ব্যবস্থাপনায় অধিক হারে সম্পৃক্ত করতে হবে। মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রশাসনে নিযুক্ত করা যেতে পারে। শিক্ষা ক্যাডারে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সর্বস্তরে পদোন্নয়নের জন্য বিবেচিত হবার সুযোগ থাকতে হবে।

২.৪.৫ স্কুল ম্যাপিং কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে অনুমোদন প্রদান করা যায়।

২.৪.৬ শিক্ষাবোর্ডের কার্যক্রমকে স্বচ্ছতায় এনে প্রয়োজনে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা যেতে পারে। বর্তমান বোর্ডসমূহ (মাদ্রাসা, কারিগরিসহ) কেন্দ্রীয় বোর্ডের শাখা হিসেবে কাজ করবে এবং কর্মচারীদের চাকরি বোর্ডসমূহের মধ্যে বদলিযোগ্য হবে।

২.৪.৭ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি নিয়োগ বিধি ও সুষ্ঠু নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া স্কুল ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি তৈরি ও তাদের ক্ষমতার ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য সুচিন্তিত নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়।

যেহেতু সরকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক/কর্মচারীর বেতনের ৮০% বহন করছে সেহেতু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করতে পারে এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য শিক্ষকদের একটি প্যানেল তৈরি করে প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের নিজ নিজ এলাকার বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতে পারে।

২.৪.৮ দেশে বর্তমানে শিক্ষকদের রেজিস্ট্রেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষক রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি চালু আছে। আমাদের দেশেও এ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে ইচ্ছুক উপযুক্ত মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি সাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ শেষে সনদ লাভ করবেন। প্রাপ্ত সনদের কপিসহ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য বছরের নির্ধারিত সময়ে আঞ্চলিক পরিচালকের বরাবরে আবেদন করবেন। আঞ্চলিক পরিচালক নিজ নিজ অঞ্চলের উপযুক্ত মেধা ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন। এরূপ রেজিস্টার্ড ব্যক্তিবর্গ সরকারি/বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং যোগ্য বলে বিবেচিত হলে নিয়োগ পাবেন।

২.৪.৯ সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। এই লক্ষ্যে ১. বেতনের ১০০% সরকার থেকে প্রদান করা ; ২. কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে চিকিৎসা ব্যয়, অকালমৃত্যুতে পরিবারকে এককালীন সাহায্য করা, পেনশন/অবসর-কালীন, এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২.৪.১০ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই নীতিমালায় জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরি সংক্রান্ত বিধি বিধান থাকতে হবে যাতে কর্মকমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। দুটি স্বতন্ত্র গ্রেডেশন তালিকা রাখা যেতে পারে।

২.৪.১১ নারী শিক্ষার অগ্রগতির স্বার্থে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে নারীদের হার বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারি বেসরকারি নির্বিশেষে যেসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়ে আছে সেখানে শিক্ষকদের মধ্যে মহিলা শিক্ষকের হার অন্তত ২০ শতাংশ থাকা প্রয়োজন।

এনাম কমিটির সুপারিশ মোতাবেক স্কুল/কলেজে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করা হয়েছে। ফলে সারাদেশে সরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জেলা শিক্ষা অফিস, আঞ্চলিক অফিস ও শিক্ষা অধিদপ্তরে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর অভাবে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। একদিকে সরকারি স্কুলে দ্বিতীয় শিফট প্রবর্তন করে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ও শিক্ষকদের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছে। সরকারি কলেজগুলোতে যত্রতত্র সম্মান ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেই সঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান ছাত্র-শিক্ষকের চাহিদা মোতাবেক তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর কোন নতুন পদ সৃষ্টি করা হয় নি বরং এনাম কমিটি রিপোর্ট বাস্তবায়ন করে পদের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে স্কুল কলেজে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এ অবস্থা নিরসনের জন্য ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষকের সংখ্যানুপাতে সরকারি স্কুল, কলেজ, টি টি কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ জেলা শিক্ষা অফিস, আঞ্চলিক অফিস ও অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয়/তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণীর পদ সৃষ্টি করতে হবে।

২৪.১২ দেশের শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি এই দুটি ধারা রয়েছে। সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীর বেতনের বৈষম্য এখনও বিরাজমান। তাছাড়া এসকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছাত্র বেতনেরও ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। এসকল বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীদের অভিন্ন বেতন প্রদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সংস্কারের দায় দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে ছাত্র বেতনাদিসহ অন্যান্য আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে সরকারের ব্যয়ের যেমন সাশ্রয় ঘটবে তেমনি শিক্ষকের বেতনের ১০০% সরকারিভাবে প্রদান করা সম্ভব হবে। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটবে। তবে শিক্ষক/কর্মচারীদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২৪.১৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শিক্ষা ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদের একজন কর্মকর্তা এবং পদমর্যাদার দিক দিয়ে তিনি অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে সমস্ত প্রস্তাব পাঠাবেন, তা মন্ত্রণালয়ে সরাসরি সচিবের নিকট যাওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মহাপরিচালককর্তৃক পেশকৃত প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে নথির মাধ্যমে সিনিয়র সহকারী সচিব থেকে সকল ধাপ পার হয়ে সচিবের নিকট উপস্থাপিত হচ্ছে। এতে একই কাজের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এবং মেধা ও সময় অপচয় হচ্ছে। কাজের পুনরাবৃত্তি রোধ করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য এবং মেধা ও সময়ের অপচয় রোধ করার জন্য মহাপরিচালককর্তৃক প্রেরিত সকল নথি সরাসরি সচিবের নিকট পেশ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২৪.১৪. বর্তমানে প্রচলিত জটিল ও দীর্ঘসূত্রিতাপূর্ণ শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়নপ্রকল্প পর্যায়ক্রমে প্রণয়ন, মূল্যায়ন, প্রাক–একনেক অনুমোদন প্রথা ও পদ্ধতি বিলোপ করে প্রণীত শিক্ষানীতির ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের জন্য অধিদপ্তরকর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দের দায়িত্ব স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২৪.১৫ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কর্মসূচি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। প্রকল্প মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে প্রকল্পভুক্ত জনবলের চাকরিও শেষ হয়ে যায় এবং প্রেষণে আগত কর্মকর্তাগণ তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে ফিরে যায়। ফলে প্রকল্প সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রয়োজন হলে পাওয়া যায় না এবং প্রকল্পের জন্য যে সমস্ত অফিস যন্ত্রপাতি যেমন ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার, টাইপটাইটার ও অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হয় সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। আবার যখন নতুন কোন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় তখন নতুন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য জনবল নিয়োগ করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ বিধায় প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচি নির্ধারিত সময়ে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এতে একদিকে যেমন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হয় অন্যদিকে প্রকল্পের ব্যয়ও বেড়ে যায়।

উপরিউক্ত অসুবিধাগুলো দূরীকরণার্থে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রকল্প বাস্তবায়ন শাখা নামে একটি নতুন সেল সৃষ্টি করা যেতে পারে। উক্ত সেলে একজন সার্বক্ষণিক পরিচালক থাকবেন এবং তাঁকে সহায়তা করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকবেন। এ সেল সরাসরি পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর মাধ্যমে মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সরকারের রাজস্ব খাতে এর পদগুলো সৃষ্টি করতে হবে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মসূচি এ সেলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

২৪.১৬ ব্যক্তি মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় আনা দরকার। প্রয়োজনে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সমতার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হওয়া উচিত।

২৪.১৭ শিক্ষকদের চাকরির বয়সসীমা ষাট বছরে উন্নীত করতে হবে।

২৪.১৮ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি–বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে অনিয়ম ও অসমনীতি চলছে তার নিরসনকল্পে শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজ পর্যন্ত (মাদ্রাসাসহ) শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি পৃথক শিক্ষা কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার করা আবশ্যক।

অধ্যায়—২৫

অর্থায়ন

১. ভূমিকা

শিক্ষায় বিনিয়োগ ও তার সঙ্গে সামাজিক চাহিদায় ইতিবাচক সম্পর্ক নিয়ে এখন আর সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে দ্বিমত নেই। তবে শিক্ষা যেহেতু জীবন ও জীবিকার আশ্রয়স্থল তৈরি করে সেজন্য শিল্পে ব্যয় ও শিক্ষা খাতে ব্যয় একই দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা যায় না। শিক্ষাবাবদ ব্যয় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় শর্ত বলে সকলেই মেনে নিয়েছে।

জাতীয় আয়ের সামান্য পরিমাণই শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়। কুদরাত–এ–খুদা কমিশন জাতীয় আয়ের ৫% শিক্ষাখাতে ব্যয় করার সুপারিশ করেছিল এবং অল্পসময়ের মধ্যে তা ৭%–এ উন্নীত করা উচিত হবে বলে উল্লেখ করেছিল। শিক্ষাখাতে জাতীয় আয় বরাদ্দের ভাগ ১৯৭২–৭৩–এ ছিল ১.৮%, সাম্প্রতিককালে তা ২.৩%–এ দাঁড়িয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় এই পরিমাণ সর্বনিম্ন। ভারতে ৩.৭%, পাকিস্তানে ২.৭%, নেপালে ২.৯% ও শ্রীলংকায় ৩.৩৫%। জাতীয় আয়ের অত্যন্ত কম অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়।

জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে মানবসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন। জাতীয় উন্নয়ন অর্জন করতে হলে উৎপাদকশক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রধান উপাদান। বর্তমানে যে পরিমাণ অর্থ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয় তা অপ্রতুল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে মাথাপিছু বার্ষিক বিনিয়োগের পরিমাণ বাংলাদেশে ৫ ডলার, পাকিস্তানে ১০ ডলার, ভারতে ১৪ ডলার, মালয়েশিয়াতে ১৫০ ডলার ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৬০ ডলার।

২. বর্তমান অর্থায়ন–ব্যবস্থা

বর্তমানে শিক্ষার জন্য অর্থ ও সম্পদ মূলত আসে সরকার থেকে, গৌণত বেসরকারি গোষ্ঠী, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, বেসরকারি ও বিদেশী সংস্থা থেকে।

প্রাথমিক স্তরে সরকারি, বেসরকারি ও বিশেষ ধরনের স্কুল রয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলোর পুরো খরচ সরকার বহন করে থাকে। বেসরকারি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। সবগুলোর খরচ যোগান দেওয়া হয় বেসরকারিভাবে, অর্থাৎ ছাত্রবেতন ও বেসরকারি অনুদান ইত্যাদি থেকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি সীমিত সংখ্যা সরকারের কাছ থেকে মাসিক ৫০০/– হারে অনুদান পেয়ে থাকে। এনজিও–র তত্ত্বাবধানে বেশ কিছু বিশেষ ধরনের স্কুল এই পর্যায়ে পরিচালিত হয়, যার অর্থায়ন হয় মূলত বিদেশী অনুদান থেকে।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ স্তরের মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগই পরিচালিত হয় বেসরকারিভাবে। সরকারিভাবে পরিচালিত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খরচ সরকার বহন করে। তবে ব্যয়ের একটি অংশ মিটিয়ে থাকে ছাত্রদের দেওয়া বেতন ও অন্যান্য ফি, যদিও তার পরিমাণ খুবই নগণ্য।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ভৌত কাঠামো, গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের সুবিধা তেমন নেই বললেই চলে। এ সমস্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই নিয়মিতভাবে ছাত্রছাত্রীদের

নিকট থেকে বেতন ও অন্যান্য ফি আদায় করতে পারে না। ফলে শিক্ষকদেরও নিয়মিত বেতন দেওয়া অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। সীমিতসংখ্যক শিক্ষকের প্রারম্ভিক বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ সরকার অনুদান হিসেবে দিচ্ছে। এছাড়া ভৌত কাঠামো উন্নয়নে সরকার অনুদান দিয়ে থাকে।

আর্থিক সঙ্কট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনেকটা পঙ্গু করে ফেলেছে। সরকারি অনুদানে এগুলো চলে। মোট রাজস্ব খরচের শতকরা ৯০/৯৫ ভাগ ও উন্নয়ন খরচের পুরোটাই সরকার অনুদান হিসেবে দিয়ে থাকে, তবু রাজস্ব ঘাটতির জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার, আধুনিকীকরণ ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সম্ভব হচ্ছে না। সম্প্রতি বেসরকারি পর্যায়ে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয় মূলত নির্ভর করে ছাত্র বেতন ও ফিসের ওপর। তবে তারা আর্থিক ও অন্যান্য ধরনের ব্যক্তিগত ও আন্তর্জাতিক সাহায্য পেয়ে থাকে।

এছাড়া সরকারি ও ব্যাপকভাবে বেসরকারি উদ্যোগে বর্তমানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে।

৩. বর্তমান অর্থায়ন-ব্যবস্থার মূল্যায়ন

প্রাথমিক শিক্ষাখাতে সরকারি খরচ গত কয়েক বছরে বেড়েছে। কিন্তু এই খরচের ইতিবাচক ফল আশঙ্কাজনকভাবে কম এবং অপচয় অত্যন্ত বেশি। এর ফলে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক ছাত্র স্কুলে যাবার সুযোগ পাচ্ছে এবং যতটুকু শেখা দরকার তার চেয়ে কম শিখছে। যেহেতু প্রায় অর্ধেক ছাত্রই প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচ বছর পূর্ণ করে না, যেহেতু ছাত্রপ্রতি লাগে (যারা পাঁচ বছর শিক্ষা কার্যক্রম পূর্ণ করে) ৮.৭ শিক্ষা বছর এবং ছাত্রপ্রতি যতটুকু খরচ হওয়া প্রয়োজন তার চেয়ে ৭৫% বেশি খরচ হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় বিগত ১৫ বছরে (১৯৮১–১৯৯৬) সরকারি খরচ দৃশ্যত বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ গুণ, প্রকৃত অর্থে বৃদ্ধি তিনগুণ। এই বর্ধিত বিনিয়োগ নানা কারণে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি।

মাধ্যমিক পর্যায়ে একজন ছাত্রকে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে লাগে ১২.৬ শিক্ষা বছর। একজন ছাত্রের মাধ্যমিক শিক্ষা (১০ বছরের চক্র) শেষ করতে গড়ে ২১.৩ বছর লাগে এবং সরকারি খরচের প্রয়োজন হয় ১৩২%। অর্থাৎ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রতি এক টাকার খরচে আরও অতিরিক্ত টাকা ১.৩২ খরচ হয়। এটি ঘটে মূলত অপচয় এবং অদক্ষতার জন্য (World Bank Report 1996)।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রায় পুরোটাই সরকারি অনুদানে পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ও ভৌত কাঠামো দুর্বল এবং তা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার জন্য মোটেই পর্যাপ্ত নয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে একদিকে যেমন শিক্ষিতের হার কম, আবার তেমনি অন্যদিকে মুক্ত অর্থনীতি ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশকে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। শিক্ষিতের হারবৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে যেমন শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার প্রয়োজন তেমনি অপরদিকে বিশ্ব বাজারে টিকে থাকার জন্য উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমও বৃদ্ধি করা একান্ত দরকার।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিচালনার জন্য যে বিপুল পরিমাণ শিক্ষকের চাহিদা রয়েছে তা মেটানো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমেই সহজ হবে। এ অবস্থায় বিভিন্ন স্তরে কিভাবে অর্থ বরাদ্দ করা উচিত তা নির্ণয় করার সহজ সমাধান নেই। তবে বর্তমানে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ কম হওয়াতে সব স্তরেই চাহিদানুযায়ী বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং মূল বিষয় হচ্ছে যে, বরাদ্দ বাড়াতে হবে, তারপর বিভিন্ন স্তরের জন্য কি পরিমাণ বরাদ্দ দেওয়া যায় তা বিবেচনা করা সহজ হবে। আমরা কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে মোটামুটিভাবে একই মত পোষণ করি যে, মোট জাতীয় আয়ের ৫% শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করে মোট শিক্ষাখাতের বরাদ্দ থেকে প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য ৬০%, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য ২০%, বিশেষ শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ৫%, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ১৫% বরাদ্দ করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার জন্য অবশ্যই অর্থ বরাদ্দের তারতম্য থাকবে। কারিগরি, কৃষি, চিকিৎসা ও বিশেষ উচ্চতর শিক্ষার জন্য অবশ্যই অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা দরকার।

শিক্ষায় যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা সরকারের একার পক্ষে যোগান দেওয়া সম্ভবপর নয়। মোট শিক্ষা-ব্যয়ের ৭০/৮০ ভাগ সরকারি তহবিল থেকে আসে। বাকি ৩০/২০ ভাগ অর্থ আসে অন্যান্য উৎস থেকে। শিক্ষার প্রসারের ও উন্নত ব্যবস্থায় আরও বিপুল পরিমাণে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে।

শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত সম্পদ-সংগ্রহে দেশ ও জাতির দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশ্ব ব্যাংকের (World Bank Report, 1994) প্রকাশিত একটি দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, There are several main ways in which government can mobilize greater private financing : Cost-sharing with students, raising funds from alumni and external sources and engaging in other income-generating activities. বর্তমান উৎসসমূহের বাইরে এ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

আমাদের মনে হয় ছাত্রদের প্রদেয় বেতনের পরিমাণ সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কম হলেও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তেমন কম নয়। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র বেতন কয়েকগুণ বাড়ালেও বর্তমানে যে আর্থিক সংকট রয়েছে এবং আগামীতে যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে তা মেটানো সম্ভব হবে না বলে আমরা ধারণা করছি।

ছাত্রবেতনের মাধ্যমে শিক্ষা খরচ মেটানোর তেমন উদাহরণ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পাওয়া যায় না। এশিয়ার প্রায় অর্ধেক দেশেই বেতন উচ্চ শিক্ষার মোট খরচের মাত্র ১০% ভাগ যোগান দেয়।

সম্পদের অভাব শিক্ষার সংকটকে ঘনীভূত করেছে। অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে হবে। অনেকে মনে করেন বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় সরকার জাতীয় আয়ের আরও অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে পারে। বর্তমান ব্যবস্থায় অপচয় বন্ধ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করতে পারলেও যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ সাশ্রয় হবে, যা শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ করা যেতে পারে। মোট কথা, শিক্ষাখাতে ক্রমবর্ধমান সম্পদের চাহিদা আসবে অতিরিক্ত জাতীয় আয় বরাদ্দ, অপচয় রোধ, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন, প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব আয় বাড়িয়ে সুশীল সমাজের উদ্যোগ, ব্যক্তিগত অনুদান, বিদেশী সাহায্য এবং স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা-প্রশাসনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

৪. সুপারিশ

৪.১. ২০০০ সাল নাগাদ শিক্ষা খাতে ক্রমান্বয়ে জাতীয় আয়ের বর্তমান বরাদ্দ ৫%-এ উন্নীত করতে হবে। প্রতি বছর ১% হারে বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষাখাতে ইতোমধ্যে সৃষ্ট অনগ্রসরতা দূর করতেই এ পরিমাণ সম্পদ ব্যয় হবে। ২০১০ সাল নাগাদ তা ৭%-এ উন্নীত করা হতে পারে। জাতীয় আয়ের ৭% শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করতে পারলে শিক্ষাকে সর্বজনীন পর্যায়ে নেওয়া সম্ভবপর হবে।

৪.২. বিত্তবানদের আয়ের ওপর শিক্ষা কর প্রবর্তন করে শিক্ষাখাতের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই কর ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে ও পৌর এলাকায় স্থানীয় সরকার আদায় করতে পারে এবং তা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যেতে পারে।

৪.৩. ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইদানীং বিভিন্ন ফোরামে আলোচিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন, প্রায় ৫০ বছর এই বেতনের হারে কোন পরিবর্তন করা হয় নি। এর ফলে বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব একটু স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে অনেকেই দেখছেন। বেতন বৃদ্ধি করতে হলে তা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচিত হওয়া দরকার। বেতন বৃদ্ধি করতে হলে একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবে। বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব গৃহীত হলে, এই বৃদ্ধি কিভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার তার একটি ফর্মুলা তৈরির প্রয়োজন হবে। বেতন বৃদ্ধি করা হলে সেই সঙ্গে শিক্ষাঋণ ও বৃত্তি যুক্তিযুক্ত মাত্রায় প্রবর্তন করার প্রয়োজন হবে।

৪.৪. বেসরকারি উদ্যোগ বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার প্রসার উৎসাহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীর অনুদান কর মুক্ত করার প্রয়োজন হবে। তবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয় এবং শিক্ষার মান রক্ষা করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৪.৫. বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন ব্যাংকে রিজার্ভ হিসেবে গচ্ছিত রয়েছে। এই গচ্ছিত অর্থ একত্র করে প্রারম্ভিক মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে শিক্ষা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। প্রয়োজনে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এ ব্যাংক থেকে বিশেষ করে ভৌত কাঠামো তৈরির জন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—ক

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির গঠন ও কর্মপদ্ধতি

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি বাস্তব, গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে বিগত ১৪.০১.৯৭ ইং তারিখ প্রশাঃ১/বিবিধঃ৫/৯৬/১৫৫—শিক্ষা সংখ্যক এক অফিস আদেশে [পরিশিষ্ট–খ দ্রষ্টব্য] সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর এম. শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৫৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। [পরিশিষ্ট—গ দ্রষ্টব্য]

২. জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির সদস্য–সচিব হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মুহঃ ফজলুর রহমান সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

৩. কমিটি গঠিত হওয়ার পর. কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে দেশের জন্য একটি বাস্তব, গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে উনিশটি উপকমিটি গঠিত হয়। [পরিশিষ্ট—ঘ দ্রষ্টব্য] উপকমিটির সদস্যগণ পৃথকভাবে মিলিত হয়ে স্ব স্ব কমিটির প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন এবং মূল কমিটির সভায় প্রতিবেদনসমূহ উপস্থাপিত হওয়ার পর অনুপুঙ্খ আলোচনা হয়। আলোচনা ও সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে উপকমিটির প্রতিবেদনগুলো পুনর্লিখিত, পুনর্বিন্যস্তও চূড়ান্ত করা হয়।

৪. অতঃপর চূড়ান্ত প্রতিবেদনগুলো কমিটি কর্তৃক মনোনীত 'সম্পাদনা পরিষদ' কর্তৃক সম্পাদিত হয়। [সম্পাদনা পরিষদের গঠন পরিশিষ্ট–ঙ দ্রষ্টব্য]

৫. কমিটি তার মেয়াদকালে সর্বমোট ২৪টি সভায় মিলিত হয় এবং প্রতি সভায় দিনব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা ও মতবিনিময়ের পর সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কমিটির প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

৬. কমিটির চেয়ারম্যান ব্যাপকভিত্তিক মতবিনিময়ের পর জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন মতাদর্শ ও মতাবলম্বী ছাত্র–শিক্ষক সংগঠন, পেশাজীবী সমিতি, এনজিও প্রতিনিধির সঙ্গে দীর্ঘ মতবিনিময় করেন। তাঁদের কাছ থেকে মৌখিক ও লিখিতভাবে সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

৭. কমিটির চেয়ারম্যান জাতীয় দৈনিকসমূহের সম্পাদকদের সঙ্গে দু বার মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এ দুটি মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক ও কমিটির কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

৮. শিক্ষানীতি বিষয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষক, অভিভাবক, বিভিন্ন পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ, সংগঠন ও সমিতির সদস্যদের মতামত জানবার জন্য কমিটির চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম শহর, যশোর, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, বগুড়া ও কুমিল্লায় মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

৯. এ ছাড়া কমিটি কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলের নানা পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষের পত্রের মাধ্যমে প্রেরিত মতামত লাভ করে। এ সব পত্র কমিটি বাছাই ও বিন্যস্ত করে জনগণের মতামতের প্রতিফলনও পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ লাভ করে।

১০. এতদ্ব্যতীত দেশের বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ কমিটির চেয়্যারম্যানের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব প্রকাশ করেন।

১১. উপরিবর্ণিত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হবে যে, কমিটি সর্বাত্মকভাবে একটা বাস্তব, গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের যেমন প্রচেষ্টা চালিয়েছে তেমনি দেশের বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যেও এ বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ, কৌতূহল ও গঠনমূলক মনোভাব লক্ষ করা গেছে।

পরিশিষ্ট—খ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ঢাকা

নং প্রশাঃ ১/বিবিধ–৫/৯৬/ ১৫৫–শিক্ষা, তারিখ : ১৪–০১–৯৭ইং

অফিস আদেশ

বাংলাদেশে বর্তমানে কোন পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু শিক্ষানীতি নাই। শিক্ষাকে জাতীয় কল্যাণের চাবিকাঠি এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি। সুপরিকল্পিত, সময়োপযোগী, পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু শিক্ষানীতি ছাড়া শিক্ষার অগ্রগতি তথা জাতীয় অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়। শিক্ষানীতি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাসে সহায়তা করে এবং জাতীয় জীবনে নিয়ে আসে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ক্ষমতা গ্রহণের উষালগ্নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয় এবং একটি সুস্পষ্ট শিক্ষানীতি ব্যতিরেকে জাতি লক্ষ্যহীনভাবে শিক্ষায় বিনিয়োগ করবে যাতে জাতির উন্নতি বাধাগ্রস্ত হবে এবং সম্পদের অপচয় হবে। এর প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার নানাবিধ অভাব ও ত্রুটি বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ দান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথ নির্দেশের জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ কুদরাত–এ–খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। পরবর্তীতে তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর এ বিষয়ে আর কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। বর্তমান সরকার ১৯৭৪ সালে প্রস্তুতকৃত কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশনের উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটি বাস্তব, গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

২. এ উদ্দেশ্যে সরকার নিম্নলিখিতভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করলেন :
[পরিশিষ্ট গ দ্রষ্টব্য]

৩. **শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) কুদরাত–এ–খুদা কমিশনের প্রতিবেদনকে গভীর এবং নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে সেই প্রতিবেদনের বিভিন্ন প্রস্তাবসমূহকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে দেশের সর্বপ্রকার ও সর্বস্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাদি পরীক্ষা করে একটি বাস্তবভিত্তিক সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা এবং সরকারের অনুমোদনের জন্য তা পেশ করা ;

(খ) জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য যাবতীয় কার্যাদি যথা : বিভিন্ন মহলের মতামত গ্রহণ করা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা ;

(গ) প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন ; এবং

(ঘ) নীতিমালা প্রণয়নের জন্য অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কর্মকাণ্ড ও কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪. **সময়সীমা :**

জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি আগামী ৩০শে এপ্রিল, ১৯৯৭ তারিখের মধ্যে তাদের কার্য সম্পাদন করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি সরকারের নিকট পেশ করবেন।

স্বাক্ষরিত
(আব্দুল্লাহ হারুন পাশা)
সচিব

উপ–নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা

পরিশিষ্ট—গ

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি

১.	প্রফেসর এম শামসুল হক সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মুহঃ ফজলুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব
৩.	ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া মাননীয় সংসদ সদস্য	সদস্য
৪.	মিসেস রাজিয়া মতিন চৌধুরী মাননীয় সংসদ সদস্য	"
৫.	প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	"
৬.	প্রফেসর আবদুল খালেক ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	"
৭.	প্রফেসর আবদুল মান্নান উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	"
৮.	প্রফেসর আমিরুল ইসলাম চৌধুরী উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	"
৯.	প্রফেসর মুহাম্মদ হোসেন উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	"
১০.	প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	"
১১.	প্রফেসর আমিনুল ইসলাম উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	"
১২.	প্রফেসর গোলাম আলী ফকির উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	"
১৩.	প্রফেসর সৈয়দ মহিবুদ্দিন আহমদ উপাচার্য, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	"
১৪.	প্রফেসর মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	"
১৫.	প্রফেসর এম আমিনুল ইসলাম উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	"
১৬.	প্রফেসর হারুন-অর-রশিদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	"

১৭.	প্রফেসর আবুল কালাম মুহাম্মদ আমীনুল হক প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৮.	ড. আবদুল্লাহ আল–মুতী শরফুদ্দীন প্রাক্তন সচিব	"
১৯.	ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন উপাচার্য, ইস্ট–ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি	"
২০.	প্রফেসর রশীদ উদ্দিন আহমদ নিউরো সার্জারি বিভাগ, আই পি জি এম আর	"
২১.	প্রফেসর রশীদুল হক প্রাক্তন অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	"
২২.	প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	"
২৩.	প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী	"
২৪.	প্রফেসর এস জেড হায়দার রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	"
২৫.	প্রফেসর আলমগীর মোঃ সিরাজউদ্দীন ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	"
২৬.	প্রফেসর মোশার্রফ হোসেন খান উপাচার্য, আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	"
২৭.	প্রফেসর আনিসুজ্জামান বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	"
২৮.	প্রফেসর এম আলী আসগর পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	"
২৯.	প্রফেসর এ টি এম জহুরুল হক অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	"
৩০.	প্রফেসর মযহারুল ইসলাম প্রাক্তন উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	"
*৩১.	কাজী ফজলুর রহমান প্রাক্তন সচিব	"
৩২.	জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী সাংবাদিক	"
৩৩.	প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকী সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	"
৩৪.	প্রফেসর দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	"
*৩৫.	জনাব ইউসুফ আবদুল্লাহ্ হারুন সভাপতি, এফ বি সি সি আই, ঢাকা	"
৩৬.	ড. কাজী ফারুক আহমেদ নির্বাহী পরিচালক, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	"

---

* কোন সভায় উপস্থিত ছিলেন না।

৩৭.	প্রফেসর এম এ কাদেরী বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ	সদস্য
৩৮.	প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ্ চৌধুরী সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	"
৩৯.	প্রফেসর হামিদা বানু মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	"
৪০.	প্রফেসর আবদুর রফিক মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	"
৪১.	প্রফেসর আজিজ আহমদ চৌধুরী মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	"
৪২.	প্রফেসর মোঃ খুরশীদ আলম মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী	"
৪৩.	প্রফেসর মুহম্মদ সায়ীদুল হক চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	"
৪৪ক.	প্রফেসর এম.আমান উল্লাহ্ ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (১৯/০৩/৯৭ পর্যন্ত)	"
৪৪খ.	প্রফেসর মুঃ তোজাম্মেল হোসেন চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	"
৪৫.	প্রফেসর শের মোহাম্মদ চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী	"
৪৬ক.	প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা (১৯/০৩/৯৭ পর্যন্ত)	"
৪৬খ.	প্রফেসর আজিজুর রহমান চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা	"
৪৭ক.	প্রফেসর মোঃ নাজিম উদ্দিন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর (১৯/০৩/৯৭ পর্যন্ত)	"
৪৭খ.	প্রফেসর মোঃ আফসার উদ্দিন শেখ চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর	"
৪৮.	প্রফেসর এ এম এম আহসান উল্লাহ চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম	"
৪৯ক.	প্রফেসর মোঃ সা'দুল্লাহ্ ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড (১৯/০৩/৯৭ পর্যন্ত)	"
৪৯খ.	প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস শিকদার চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড	"
৫০.	জনাব মোঃ শাহ্ আলম ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	"

৫১.	প্রফেসর রফিকুল হক প্রাক্তন মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৫২.	জনাব মুহম্মদ তমীযুদ্দীন রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড	”
৫৩.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান অধ্যক্ষ, জুবিলী স্কুল ও কলেজ, ঢাকা	”
৫৪.	মিসেস হেনা দাস প্রাক্তন মহাসচিব, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি	”
৫৫.	জনাব শুদ্ধানন্দ মহাথের অধ্যক্ষ, কমলাপুর বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ	”
৫৬.	প্রফেসর আহাম্মদ উল্লাহ্ সরকার এগ্রোনমী বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	”

পরিশিষ্ট—ঘ

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি

উপকমিটিসমূহ

১। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

১. ড. আবদুল্লাহ আল–মুতী শরফুদ্দীন, প্রাক্তন সচিব (আহ্বায়ক)
২ মিসেস রাজিয়া মতিন চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য
৩. প্রফেসর আজিজ আহমদ চৌধুরী, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৪. ড. কাজী ফারুক আহমদ, নির্বাহী পরিচালক, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
৫. প্রফেসর খোন্দকার শহীদুল ইসলাম, মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৬. ড. মোঃ আনোয়ারুল আজিজ, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, ময়মনসিংহ
৭. জনাব ম হাবিবুর রহমান, জাতীয় পরামর্শক, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি.
৮. জনাব আ ন স হাবীবুর রহমান, সনম্বয়কারী (উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ), প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

২। মাধ্যমিক শিক্ষা

১. মিসেস রাজিয়া মতিন চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য (আহ্বায়ক)

৩. মিসেস হেনা দাস, প্রাক্তন মহাসচিব, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
৪. জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, অধ্যক্ষ, জুবিলী স্কুল ও কলেজ, ঢাকা
৫. সৈয়দ আবদুর রব, যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক শিক্ষা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৬. জনাব হাফিজউদ্দিন আহমদ, প্রধান শিক্ষক, কানসাট হাই স্কুল, শিবগঞ্জ, রাজশাহী

৩। পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা

১. প্রফেসর আবদুর রফিক, মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (আহ্বায়ক)
২ প্রফেসর রফিকুল হক, প্রাক্তন মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৩. জনাব মোঃ শাহ আলম, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
৪. জনাব মোঃ মতিউর রহমান, উপ–পরিচালক (প্রশিক্ষণ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৫. জনাব মুহম্মদ নুরুজ্জামান, উপ–পরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরো
৬. জনাব এ কে এম আখতারুজ্জামান, পরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর
৭. জনাব শহীদুল আলম চৌধুরী, যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন
৮. মিসেস মালেকা খান, সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ, ঢাকা মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাসট্রিজ

৯. ড. আহাম্মদ উল্লাহ মিয়া, পরিচালক, ইউসেপ
১০. জনাব এ কে এম এ হামিদ, সাধারণ সম্পাদক, ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইনজিনিয়ার্স

৪। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রকৌশল শিক্ষা ও গবেষণা

১. প্রফেসর মোশার্রফ হোসেন খান, উপাচার্য, আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (আহ্বায়ক)
২. প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ, উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
৩. প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
৪. প্রফেসর রফিকুল হক, প্রাক্তন মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৫. প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম, আইপিই বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
৬. ড. গোলাম মহিউদ্দিন, আইপিই বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
৭. প্রফেসর আবদুল হান্নান, পরিচালক, বিআইটি, ঢাকা

৫। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা

১. প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (আহ্বায়ক)
২. প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩. প্রফেসর মযহারুল ইসলাম, প্রাক্তন উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৪. প্রফেসর আবদুল মান্নান, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৫. প্রফেসর ইনাম-উল-হক, উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
৬. প্রফেসর সৈয়দ মহিবউদ্দিন আহম্মদ, উপাচার্য, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
৭. প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
৮. প্রফেসর এম আলী আসগর, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
৯. প্রফেসর এম আমিনুল ইসলাম, উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
১০. ড. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন, উপাচার্য, ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়
১১. প্রফেসর হাসান আজিজুল হক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৬। বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা

১. প্রফেসর এম আলী আসগর, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (আহ্বায়ক)
২. প্রফেসর আবুল কালাম মুহাম্মদ আমীনুল হক, প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৩. প্রফেসর এস জেড হায়দার, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
৫. প্রফেসর রশিদুল হক, প্রাক্তন অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৬. প্রফেসর সুলতানা শফি, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭। কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা

১. প্রফেসর মুহাম্মদ হোসেন, উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (আহ্বায়ক)
২. প্রফেসর গোলাম আলী ফকির, উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
৩. প্রফেসর আবুল কালাম মুহাম্মদ আমীনুল হক, প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

৪. জনাব সুলতান মহিউদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, পশু সম্পদ অধিদপ্তর

৫. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

৬. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

৮। মেডিকেল ও প্যারামেডিকেল

১. প্রফেসর রশীদ উদ্দিন আহমদ, নিউরোসার্জারি বিভাগ, আইপিজিএমআর (আহ্বায়ক)

২. প্রফেসর এম এ কাদেরী, বিভাগীয় প্রধান, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ

৩. প্রফেসর মোহাম্মদ তাহির, পরিচালক, আইপিজিএমআর

৪. প্রফেসর আবু আহম্মদ চৌধুরী, সভাপতি, মেডিকেল এ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল

৫. প্রফেসর এ কে এম নুরুল আনোয়ার, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৬. সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন

৭. অধ্যক্ষ, নার্সিং কলেজ, মহাখালী, ঢাকা

৮. প্রকল্প পরিচালক, নার্সিং শিক্ষা ও চাকুরি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

৯। কারবার (বিজনেস) শিক্ষা

১. প্রফেসর দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (আহ্বায়ক)

২. প্রফেসর এ এইচ এম হাবিবুর রহমান, ফিনান্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩. প্রফেসর মোঃ খুরশীদ আলম, মহাপরিচালক, নায়েম

৪. প্রফেসর আবদুল মান্নান, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫. প্রফেসর আবদুর রব, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১০ ললিতকলা, চারুকলা, নাট্যকলা ও সংগীত

১. প্রফেসর হাশেম খান, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (আহ্বায়ক)

২. প্রফেসর সন্‌জীদা খাতুন, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩. জনাব শামসুজ্জামান খান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

৪. প্রফেসর রফিকুন্নবী, পরিচালক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫. প্রফেসর জিয়া হায়দার, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১১। আইন শিক্ষা

১. ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া, মাননীয় সংসদ সদস্য (আহ্বায়ক)

২. প্রফেসর আলমগীর মোঃ সিরাজউদ্দীন, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩. প্রফেসর আহমদ হোসেন, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪. ড. এরশাদুল বারী, ডীন, আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫. ড. মিজানুর রহমান

৬. ড. কাজী আখতার হোসেন

৭. ব্যারিস্টার শফিকুর রহমান

৮. এডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান

১২। নারী শিক্ষা

১. ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া, মাননীয় সংসদ সদস্য (আহ্বায়ক)
২. মিসেস হেনা দাস, প্রাক্তন মহাসচিব, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
৩. [illegible]
৪. মিসেস শিরিন হক
৫. ড. ফেরদৌস আজিম
৬. প্রফেসর হামিদা বানু
৭. মিসেস মল্লিকা বেগম
৮. প্রফেসর লতিফা হক
৯. প্রফেসর জাহানারা হক
১০. প্রফেসর খালেদা সালাহউদ্দিন
১১. প্রফেসর হোসনে আরা কামাল
১২ প্রফেসর নাজমা সিদ্দিকী
১৩. প্রফেসর রওশন জাহান
১৪. প্রফেসর শওকত আরা হোসেন
১৫. ড. হামিদা আখতার বেগম

১৩। শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা

১. জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, অধ্যক্ষ, জুবিলী স্কুল ও কলেজ (আহ্বায়ক)
২ মিসেস হেনা দাস, প্রাক্তন মহাসচিব, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
৩. প্রফেসর শরিফা খাতুন, আই ই আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. জনাব শাহাজাহান, অধ্যক্ষ, ইস্পাহানি হাই স্কুল ও কলেজ, ঢাকা
৫. জনাব মতিউর রহমান, প্রধান শিক্ষক, কলেজিয়েট হাই স্কুল, ঢাকা
৬. মিসেস সুফিয়া খাতুন, শিক্ষিকা, সেনপাড়া পর্বতা হাই স্কুল, ঢাকা

১৪। পরীক্ষা, মূল্যায়ন, ছাত্র কল্যাণ ও নির্দেশনা, ছাত্র ভর্তি ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

১. প্রফেসর মোঃ খুরশীদ আলম, মহাপরিচালক, নায়েম (আহ্বায়ক)
২ প্রফেসর শরীফা খাতুন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩. প্রফেসর মুহম্মদ সায়ীদুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
৪. প্রফেসর মুঃ তোজাম্মেল হোসেন, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
৫. প্রফেসর মোঃ আজিজুর রহমান, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা
৬. প্রফেসর শের মোহাম্মদ, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী
৭. প্রফেসর আফসার উদ্দিন শেখ, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
৮. প্রফেসর এ এম এম আহসানউল্লা, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম
৯. প্রফেসর মুহাম্মদ আলী, সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
১০. জনাব মুহম্মদ মতিউর রহমান, প্রধান শিক্ষক, এইচ এম মুসলিম একাডেমী, যশোর

১৫। বিশেষ শিক্ষা, সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষা

১. প্রফেসর শাহাদাত আলী, প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (আহ্বায়ক)
২. প্রফেসর ইকবাল আজিজ মোত্তাকী, আই ই আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩. প্রফেসর সুলতানা এস জামান, আই ই আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. লে: ক: এ জেড শিকদার, অধিনায়ক ১, রমনা ব্যাটাঃ, বিএনসিসি
৫. প্রফেসর আজিজুর রহমান, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬. জনাব এ কে এম মুজিবুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
৭. জনাব আ ক ম মোফাজ্জল হোসেন, পরিচালক, শারীরিক শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা
৮. ড. দিবা হোসেন, প্রভাষক, আই ই আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৯. ড. শারমিন হক, প্রভাষক, আই ই আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৬। মাদ্‌রাসা শিক্ষা

১. প্রফেসর মোঃ ইউনুস শিকদার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড (আহ্বায়ক)
২. প্রফেসর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩. প্রফেসর আবদুর রফিক, মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৪. প্রফেসর মোঃ রফিকুল হক, প্রাক্তন মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৫. ড. আবুল কালাম মুহাম্মদ আমীনুল হক, প্রাক্তন উপচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৬. প্রফেসর মোঃ আব্দুল মান্নান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড
৭. জনাব মুহাম্মদ মনসুর–উর রহমান, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৮. প্রফেসর মোঃ আবদুল খালেক, কারিকুলাম স্পেশালিস্ট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
৯. জনাব মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন, রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড
১০. জনাব মোঃ ইলিয়াস আলী, চীফ, পরিসংখ্যান, ব্যানবেইস, ঢাকা
১১. মাওলানা মুফাজ্জল হোসাইন খান, পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
১২. জনাব মোঃ গিয়াসুদ্দিন, প্রভাষক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
১৩. মাওলানা মোঃ আবদুল জব্বার, মহাসচিব, কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড

১৭। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

১. জনাব শুদ্ধানন্দ মহাথের, অধ্যক্ষ, কমলাপুর বৌদ্ধ কৃষ্টি ও প্রচার সংঘ (আহ্বায়ক)
২. প্রফেসর মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩. জনাব মুহাম্মদ তমীযুদ্দিন, রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড
৪. ফাদার বেনজামিন ডি কোস্টা, উপাধ্যক্ষ, নটরডেম কলেজ
৫. ড. কাজী ফারুক আহমদ, নির্বাহী পরিচালক, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
৬. জনাব নিরঞ্জন অধিকারী, সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৮। শিক্ষা প্রশাসন ও অর্থায়ন

১. প্রফেসর আমীরুল ইসলাম চৌধুরী, উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (আহ্বায়ক)
২. প্রফেসর এ টি এম জহিরুল হক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩. প্রফেসর হামিদা বানু, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

৪. প্রফেসর আজিজ আহমদ চৌধুরী, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১৯। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

১. প্রফেসর মুহম্মদ সায়ীদুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (আহ্বায়ক)

২. প্রফেসর মুহাম্মদ আলী, সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৩. প্রফেসর শফিউল আলম, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৪. জনাব মোঃ তাবারেক আলী, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ; জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পরিশিষ্ট – ঙ

প্রতিবেদন সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর আনিসুজ্জামান
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর মযহারুল ইসলাম
প্রাক্তন উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. আবদুল্লাহ আল–মুতী শরফুদ্দীন
প্রাক্তন সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট – চ

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সচিবালয়

প্রফেসর এম শামসুল হক সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা	চেয়ারম্যান
জনাব মুহঃ ফজলুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য–সচিব
জনাব এ কে এম মুজিবুল হক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	সমন্বয়কারী/প্রতিবেদক
প্রফেসর শফিউল আলম উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	প্রতিবেদক
প্রফেসর মাহবুবুল আলম অধ্যক্ষ, শহীদ জিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, ঢাকা	প্রতিবেদক
প্রফেসর দুরাখশা বেগম প্রাক্তন অধ্যক্ষ, কবি নজরুল সরকারী কলেজ, ঢাকা	প্রতিবেদক
জনাব জাহাঙ্গীর আলম	কনিষ্ঠ প্রতিবেদক

82287

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা